বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে

পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

নীহার রঞ্জন মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২২

Certified that the Thesis entitled

বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sujit Kumar Mandal, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata- 700032. And that neither this thesis not any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: **Candidate:**

Dated: **Dated:**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিভাগীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ। বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগ। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, কলকাতা।

অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া। অধ্যাপক স্যমন্তক দাস। অধ্যাপক ইপ্সিতা হালদার। অধ্যাপক কুনাল চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক কবিতা পাঞ্জাবি। অধ্যাপক সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক ইপ্সিতা চন্দ। অধ্যাপক সুচেতা ভট্টাচার্য। অধ্যাপক সায়ন্তন দাশগুপ্ত। অধ্যাপক পার্থসারথী ভৌমিক। অধ্যাপক দেবশ্রী দত্ত রায়। প্রয়াত অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল। অধ্যাপক আব্দুল কাফি। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস। অধ্যাপক সত্যবতী গিরি। অধ্যাপক শম্পা চৌধুরী। অধ্যাপক মহুয়া মুখোপাধ্যায়।

তুলিকা সেন বঙ্গাল। গৌরী রায় পণ্ডিত। সিদ্ধার্থ সেখর দাস। মিতালী দাস। কৃষ্ণা বিশ্বাস। মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। নিমাই মিত্র। প্রবোধ সরকার। রূপশ্রী শী। মানস দাস। অরুণ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতি নস্কর। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। তাপসী দাসী। সুপ্রিয়া রায়। অশোক কুমার দাস।

অমিত মণ্ডল। উত্তম রায়। সুশান্ত খাঁড়া। অমিত কুমার নন্দী। সুমন চন্দ্র দাস। সৌমেন নন্দী। আইভি আদক। হরিশ মণ্ডল। সুদীপ বৈদ্য। নিতাই চন্দ্র মণ্ডল। কেনারাম নস্কর। তারাপদ সরদার। অনুপ সরদার। বেলা মণ্ডল।

ছোটো কাকা। বাবা-মা। ভাই। দিদি। শিউলি। অনঘ।

বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ৪-১৪

প্রথম অধ্যায়

কীর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলায় কীর্তনের বিবর্তন ১৫-৮৩

১:০ ভূমিকা

১:১ কীর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১:২ ভক্তিআন্দোলনের তাৎপর্য ও কীর্তন

ভক্তিআন্দোলন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরণ,

দাক্ষিণাত্যে ভক্তিআন্দোলনের স্বরূপ

১:৩ সর্বভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের আসর

১:৪ বঙ্গে ভক্তিআন্দোলন ও ভক্তিসাহিত্য

ক। প্রাক্-চৈতন্য যুগ

খ। চৈতন্য-সমসাময়িক

গ। চৈতন্য-পরবর্তী কৃষ্ণ-চৈতন্যকথা

১:৫ বঙ্গে কীর্তনের প্রচলন

ক। নবদ্বীপে কাজিদলনে নগরকীর্তন

খ। নীলাচলে রথযাত্রায় কীর্তন প্রসঙ্গ

নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস

স্বরূপ দামোদর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত

গ। খেতুরী মহোৎসবে কীর্তন প্রসঙ্গ

১:৬ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটকের ইতিহাস: উপেক্ষিত অধ্যায় ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক ৮৪-১৪৯

২:০ ভূমিকা

২:১ বাংলা নাটকের উদ্ভব সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা ও মত

থিয়েটার থেকে বাংলা নাটকের সূচনা সম্পর্কিত ধারণা

যাত্রা থেকে বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা

‘লোকনাট্য এক ধরনের কৌম-সমাজের নাটক’

২:২ বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত নাট্যসংরূপ

চর্যাপদ ও 'বুদ্ধ নাটক', জয়দেবের *গীতগোবিন্দ,*

বড়ুকবির *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* মঙ্গলকাব্য,

অনুবাদকাব্য *শ্রীরাম পাঁচালি-মহাভারত-শ্রীকৃষ্ণবিজয়,*

চৈতন্যজীবনী ও লীলানাট্য, প্রণয়মূলক আখ্যান, নাথসাহিত্য

সপ্তদশ-উনবিংশ শতকে উদ্ভুত নাট্য-আঙ্গিক

২:৩ উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায়

কীর্তনের আঙ্গিকবিচার ও নাট্য-আঙ্গিক ১৫০-২১১

৩:০ ভূমিকা

৩:১ নাটগীত ও মধ্যযুগের বাংলা অভিনয় পাঠের ধারা

৩:২ কীর্তনের আঙ্গিক

৩:৩ কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ

নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন,

পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন বা পালা কীর্তন

৩:৪ কীর্তনের গঠন

ক। কীর্তনের বন্দনা

খ। গৌরচন্দ্রিকা

গ। কীর্তনের অঙ্গ

কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর

গ। কীর্তনের ঘরানা

গরাণহাটী বা গড়েরহাটী, মনোহরসাহী,

রেণেটী, মন্দারিণী, ঝাড়খণ্ডী

ঘ। কীর্তনে তাল

ঙ। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বা অষ্টকালী

৩:৫ লীলাকীর্তন ও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতিগ্রহণ

ক। কীর্তনের আঙ্গিক গঠনে *নাট্যশাস্ত্র* -এর ভূমিকা

বৈষ্ণব রসবিভাজন, নায়িকাভেদ, নায়কভেদ

রঙ্গালয়, পূর্বরঙ্গ, অভিনয়, বৃত্তি

খ। দৃশ্যকাব্যের উত্তরাধিকার রূপে লীলাকীর্তন

শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, সংগস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্ম,

দৃশ্যকাব্যের শ্রেণিবিভাগ, রূপক, উপরূপক

৩:৬ উপসংহার

চতুর্থ অধ্যায়

কীর্তন ও নাট্য-উপস্থাপনা ২১২-২৫৪

৪:০ ভূমিকা

৪:১ মধ্যযুগ এবং সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত কীর্তনের পরিবেশন-রীতি

কীর্তনে কৃত্যানুষ্ঠান, কীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজক,

মূল গায়েন, ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক, নৃত্য, আসর পরিকল্পনা,

আলো, বাদ্য ও শব্দ-যন্ত্রাংশ, সাজসজ্জা, প্যারডি গান,

স্থান-কালের গুরুত্ব, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব

হাস্যরসের সঞ্চার, কাহিনির বিকাশ

৪:২ উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিকাশে
পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা ২৫৫-৩১৯

৫:০ ভূমিকা

৫:১ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে নবরূপে উদ্ভূত ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপ ও নাটকীয় সঙ্গীত

খেউড় ও কবিগান, ঢপ-কীর্তন, আখড়াই ও টপ্পা গান, যাত্রা,

গীতাভিনয়, পৌরাণিক নাটক, মণিপুরি নাট্য, অঙ্কীয়া নাট

৫:২ বাংলা নাটকের বিবর্তন ও প্রতিনিধিস্থানীয় তিন জন আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্বের অবস্থান

বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

দেশীয় নাট্য-আঙ্গিক ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী,

বাংলার প্রচলিত নাট্যধারা ও বাদল সরকার

৫:৩ উপসংহার

উপসংহার ৩২০-৩৩০

গ্রন্থপঞ্জি ৩৩১-৩৪৭

পরিশিষ্ট ৩৪৮

বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা

ভূমিকা

তুর্কি আক্রমণোত্তর ঘুণধরা সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়ে, অন্ধকার অচলায়তন ভেঙে নবজাগরণের আলো ও বাঙালি জীবনে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁর আবির্ভাবে সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীত-নৃত্য-নাটকে এবং সর্বোপরি ধর্মীয় বিশ্বাসে বাঙালির এক নতুন বোধ জন্ম নেয়। বাংলায় অভিনবত্ব ও উৎকর্ষের অভিঘাত সৃষ্টিতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব বিরল। বাংলার দীর্ঘ দিনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্তেই যেন কণ্ঠে সম্মেলক কীর্তনের সুর নিয়ে নদের নিমাই ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কীর্তনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রচারে তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তি। এমন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষের ছোঁয়ায় কীর্তন হয়ে ওঠে বাংলার একান্ত প্রাণের সামগ্রী। তাই বৈষ্ণব পদাবলী তথা পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস তাঁকে অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ হতে পারে না। কীর্তনের অনুষ্ঠান যেমন তাঁকে আহ্বান করে শুরু হয়, তেমনি পদাবলী কীর্তনের আলোচনাও তাঁকে দিয়েই সূচিত হল।

পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার করার সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রচলিত কতগুলি প্রতিষ্ঠিত অভিমত। পদাবলী কীর্তন সংরূপটি সাহিত্য সমালোচকদের চোখে সংগীত ব্যতীত অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। নাটক তো অবশ্যই নয়। হোক না এর উপস্থাপন অসম্ভব নাট্যগুণান্বিত। চিরাচরিতের বিপ্রতীপে যে চলতে মানা। এদেশে নাটকের ধারণা পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বের দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত। ইংরেজ শাসিত ভারতবাসী কখনোই নির্মোহ দৃষ্টিতে নাটক সংরূপের বিচার করতে পারেনি। আর সে আগ্রহও তেমন একটা ছিল না। দেশজ বিষয় অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী ছিল। হাজার বছরের নাট্যঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার মধ্যে একধরনের আত্মগরিমা বোধ ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। ইংরেজদের প্রতি পরাজিত ভারতবাসীর অহেতুক ভক্তি এক আত্মবিস্মৃত ও

আত্মবিশ্বাসহীন প্রজন্ম তৈরি করেছিল। এই উপেক্ষার পরিণাম যে ভালো হয়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাটকের ইতিহাসকারেরা বাংলা নাটকের সূচনাকাল ঊনবিংশ শতক অথবা খুব জোর অষ্টাদশ শতক নির্ধারণ করেছেন। বাঙালি বিস্মৃত হয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা— যা কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে আসরে আসরে উপস্থাপিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের নাট্যধারা থেকে নৃত্য-গীত-বাদ্যময় নাট্যধারাটি অনেকটাই আলাদা, নিজস্ব ভঙ্গিমায় স্বতন্ত্র। এহেন বাংলা নাটকের ধারায় পদাবলী কীর্তনের এক বিশেষ স্থান ছিল। নাটকের ইতিহাস বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের নাট্য ইতিহাস অবহেলায় ধুলামলিন ও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পদাবলী কীর্তনকে নাটক রূপে ভাবা এবং তা প্রতিষ্ঠা করার পথ কন্টকপূর্ণ। তবে আশার কথা এ বিষয়ে সম্প্রতি গবেষকমহলে গুঞ্জন উঠেছে। এক বিরোধী স্বরের অস্তিত্ব কায়েম হয়েছে, যা পুরাতনকে নতুনভাবে দেখার সাহস জুগিয়েছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন সেই কণ্ঠকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নব নব পাঠের নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষভাবে বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজির হয়েছে নতুন যৌক্তিকতায়। নতুন নাট্যচিন্তনের আলোকে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনকে দেখা এবং একটি শক্তিশালী নাট্যমাধ্যম রূপে তা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ইতিবৃত্ত খোঁজার চেষ্টা এই গবেষণাকর্মের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলী এমনভাবে পাঠ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে যে পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে এর নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বাঙালি ভুলতে বসেছে। বিশিষ্ট পদকর্তাদের পদ *নাট্যশাস্ত্র*-এর রসপর্যায় অনুসারে বিচার করা হলেও এর উপস্থাপন অর্থাৎ পদাবলী কীর্তনের নাট্যমূলক দিকটি আজও উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। এই দুয়ের মিলিত পাঠ আবশ্যক। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় এই আংশিক পাঠের (বৈষ্ণব পদাবলীকে পদাবলী কীর্তনের থেকে আলাদা করে পাঠের পদ্ধতি) প্রচলন থাকায় পদাবলী কীর্তনকে অনেকসময় লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু পদাবলী কীর্তন কখনোই লোকসাহিত্যের অংশ বা পুরোপুরি সংগীতের আঙ্গিক হতে পারে না। এর উপস্থাপনে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য এতটাই বেশি যে, কেবলমাত্র সংগীত বলে পদাবলী কীর্তনকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এর শাস্ত্রীয় দিক যেমন রয়েছে তেমনি পদাবলী কীর্তন কখনোই গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমজীবনের অংশ হয়ে থাকেনি। সমাজের উচ্চ-নিম্ন সকল স্তরকে স্পর্শ করেছে এর আবেদন। পদাবলী কীর্তন সমগ্র ভারতবাসীর মনে স্থায়ী আসন পেতেছে।

তবে বাংলায় এর মহিমা যতটা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে, তা হয়তো অন্য কোথাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর জনপ্রিয়তা ও প্রসারের পেছনে যে সব কারণ কাজ করেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সূচক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬ খ্রি.)। সব মিলিয়ে পদাবলী কীর্তনের একটি সামগ্রিক পাঠ প্রয়োজন।

কীর্তনকে সচরাচর ভক্তিভাবের বাইরে গিয়ে কেবলমাত্র উপস্থাপন বা পারফরম্যান্স রূপে ভাবতে দেখা যায় না। পদাবলী ও লীলাকীর্তনকে কাব্য-নৃত্য-গীত সম্বলিত নাটক রূপে মেনে নিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহিত্যসমালোচক। বৈষ্ণব পদাবলী যে আসরে আসরে অভিনয় সহযোগে উপস্থাপিত হত, সেই সত্য প্রায় বিস্মৃত। এর ক্রমবিবর্তনের ধারায় লীলাকীর্তন এক সজল নাট্যবৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও আসর মাতিয়ে চলেছে। বাংলার নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে কীর্তনের সম্পর্ক একরকম বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে শাখার। বাংলা নাটকের সেই শাখার ফুল-ফল-পাতা যেন নামকীর্তন, পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন। কেবলমাত্র একটি সামাজিক-রাজনৈতিক অথবা নিছক ধর্মীয় বিধি রূপে কীর্তনকে স্বীকৃতি দিলেই একজন সাহিত্যসমালোচকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের ধারায় কীর্তনকে মর্যাদার সঙ্গে সম্ভাষণ করা প্রয়োজন।

কৃষ্ণভক্তি লাভের একটি অন্যতম উপায় হল কীর্তন। ভক্তির আধার হলেও ভুলে গেলে চলবে না কীর্তন আসরের সামগ্রী। ধর্মীয় ভাবাবেগ এতে থাকে ঠিকই কিন্তু তার বাইরে এর উপস্থাপনের দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কৃত্যানুষ্ঠান সহযোগে কীর্তন উপস্থাপিত হলেও এর নাটকীয় গুণাবলী অবহেলা করলে চলে না। বাংলা নাট্যকলার ক্রমবিবর্তনে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কখনোই নাটক থেকে আলাদা করা যায়নি। পাশ্চাত্যের নাটক যেভাবে ধর্মীয় আবহ থেকে উৎপন্ন হয়ে কালক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল, হুবহু সেই প্রক্রিয়া বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়নি। পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচারে এই দিকটির কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে নাটক এসেছিল কৃত্যের ছদ্মবেশে। ধর্মীয় উপস্থাপন বলে কীর্তনকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাই নাট্যধর্মের আলোকে পদাবলী কীর্তনকে বিচার করা ন্যায়সঙ্গত এবং যৌক্তিকও বটে।

পদাবলী কীর্তন সম্পর্কিত গবেষণামূলক কাজ এই প্রথম নয়। বরং গবেষণার জগতে পদাবলী কীর্তন বহু চর্চিত বিষয়। শ্রদ্ধেয় ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, কৃষ্ণা বক্সী ও আরও অনেকেই কীর্তন নিয়ে গবেষণামূলক

কাজ করেছেন। তাঁদের গবেষণাকর্মের বহু তথ্যই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তাতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য এতটাই অধিক যে কীর্তনের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য অধরাই থেকে গেছে। কীর্তনের মতো এমন একটি শক্তিশালী নাট্যসংরূপ অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর নাট্যধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল এবং এখনও গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ তুচ্ছ করে কীভাবে একটি নাট্য আঙ্গিক রূপে পদাবলী ও লীলাকীর্তন স্বমহিমায় বিরাজিত রয়েছে তার হদিশ সেভাবে লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। এই দিকগুলির উপর আলোকপাত করার জন্যই এইধরনের গবেষণাকর্মের আয়োজন।

দশম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী –এক বৃহৎ কালপর্বের কীর্তন সম্বন্ধীয় তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে। আলোচনার সুবিধার্থে গবেষণাকর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায় হল—

প্রথম অধ্যায়- *কীর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলা কীর্তনের বিবর্তন*

দ্বিতীয় অধ্যায়- *বাংলা নাটকের ইতিহাস: উপেক্ষিত অধ্যায় ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক*

তৃতীয় অধ্যায়- *কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও নাট্য-আঙ্গিক*

চতুর্থ অধ্যায়- *কীর্তন ও নাট্য-উপস্থাপনা*

পঞ্চম অধ্যায়- *অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিকাশে পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা*

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কীর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কীর্তনের আক্ষরিক অর্থ নিরূপণের পাশাপাশি এর আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। কীর্তনের অভ্যুত্থানে ভক্তির তাৎপর্য উঠে আসে। কীর্তন সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভক্তির প্রসঙ্গ আসবে না এমন হতে পারে না। কীর্তনের সঙ্গে ভক্তির যোগ সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। ভক্তির পথ ধরে কীর্তনে প্রধান হয়ে উঠেছে কৃষ্ণভক্তি। সর্বভারতীয় পটভূমিতে কীর্তনের একটি বিশেষ স্থান ছিল। সারা ভারত জুড়ে যে ভক্তিসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তা কাব্য, কবিতা ও পদাবলীর আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক পদাবলী ও কবিতাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে বা লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়নি। তবে এই কবিতা ও পদাবলী যে গীত হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংগীতের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের সংযোগ ঘটেছিল। কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত কীর্তনের সর্বভারতীয় প্ররেক্ষাপট আলোচনা করার পর দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের দিকে। প্রাচীন বঙ্গের বাঙালির কাছে ভক্তির স্বরূপ কেমন ছিল তা আলোচনায় উঠে এসেছে। বঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলে কৃষ্ণভক্তি কীভাবে তাঁর শেকড় দৃঢ়বদ্ধ করেছিল তার একটি রূপরেখা প্রদান করা গেছে। লিপিলিখনে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এবং সর্বোপরি রয়েছে সাহিত্যে (প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য) কৃষ্ণভক্তি তথা কীর্তনের স্বরূপ সন্ধান।

প্রাচীন বঙ্গে প্রধান চরিত্রের বীরত্ব যতটা প্রাধান্য পেয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল প্রেম। কৃষ্ণের বীর, কূটনীতিজ্ঞ, রণনিপুণ ব্যক্তিত্বের থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রেমিক ও গোপবালক সত্ত্বা। বাংলা সাহিত্যে রয়েছে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ। কৃষ্ণের প্রেমিক সত্ত্বার আত্তিকরণে সাহায্য করেছিল শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে কীর্তনে জোয়ার এসেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বকে কাটিয়ে ওঠা তখনও সম্ভব ছিল না এবং এখনও সম্ভবপর হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে ভক্তিসাহিত্য তথা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন ও কীর্তনীয়াদের তিনটি কালপর্ব (চৈতন্য-পূর্ব, চৈতন্যসমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী) ভেদে বিচার করা হয়েছে। এই পদকর্তারা অনেকেই একাধারে কবি, অন্যদিকে ছিলেন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া (মূলগায়েন, খোলবাদক ও নৃত্যকলায় নিপুন)।

বাংলায় ভক্তিসাহিত্য বা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সিংহভাগই যে কীর্তন করার নিমিত্তে রচিত হয়েছিল, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই ধারায় *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, বিভিন্ন চৈতন্যচরিত গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট পদকর্তা ও তাঁদের বৈষ্ণব পদ আলোচনায় উঠে এসেছে। বঙ্গে কীর্তনের প্রচলন এবং কীর্তনকে মানবমুখী আন্দোলন করে তুলতে চৈতন্যদেব এবং তাঁর অনুচরবৃন্দের ভূমিকা কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম যেমন পরবর্তী গোস্বামীদের হাতে শাস্ত্রের রূপ নিয়েছিল, তাঁর গানের দলেও তেমনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দক্ষ ব্যক্তিবর্গ যুক্ত হন। কীর্তন গানের এক সাংগঠনিক রূপ এই আলোচনাপর্বে উঠে এসেছে। পদাবলী কীর্তনে সংগীতের পাশাপাশি নৃত্য ও বাদ্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছিল।

প্রাচীন কাল থেকেই কীর্তনে দলগত উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। দলে একজন প্রধান গায়ক থাকতেন। কীর্তনের দলে দোহার, বাদ্যকর ও নৃত্যপটু ব্যক্তিও থাকতেন। সেকারণে পদাবলী কীর্তনকে কেবলমাত্র সংগীত রূপে বিচার করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে তিনটি ঘটনাকে গুরুত্ব

সহকারে দেখানো হয়েছে। এক, নবদ্বীপে কাজীদলনে নগরকীর্তন। দুই, নীলাচলে রথযাত্রায় কীর্তন। তিন, খেতুরী মহোৎসবে কীর্তন প্রসঙ্গ। তিনটি ঘটনা কীর্তনকে দৃঢ়মূল করতে সাহায্য করেছিল। এখনকার কীর্তনীয়া তথা কীর্তনের গবেষকমহলে বারে বারেই উঠে এসেছে এর (তিনটি ঘটনার) অভিঘাত। এতে তখনকার কীর্তনের স্বরূপ যেমন উঠে আসে তেমনি কীর্তনের উপস্থাপন কৌশলও স্পষ্ট হয়।

গবেষণাকর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে বাংলা নাটকের অনাদৃত এবং স্বল্প চর্চিত ইতিহাস। বাংলা নাটকের ইতিহাস কেন পাওয়া যায় না তার বহুমাত্রিক যুক্তি এখানে উঠে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী কেন নাট্য সাহিত্যের সূচনালগ্ন রূপে নিরূপিত হয়েছে? কেন এর আগের নাট্যমাধ্যমগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে? কেনই বা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে সরিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা যায়? 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল না' –এমন ধারণা পোষণের কী কারণ ছিল? যাত্রাকে প্রাচীন এবং একমাত্র নাট্য সংরূপ ভাবার পেছনে অভিপ্রায় কী ছিল? —ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে পদাবলী কীর্তনের নিজস্ব নাট্যঐতিহ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে।

নাটকের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রাচীন বঙ্গে প্রচলিত ছিল। গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে তা উপস্থাপিত হত। তা যেমন রাজসভা বা মন্দিরপ্রাঙ্গণে মান্যগণ্য দর্শক-শ্রোতার সামনে উপস্থাপিত হত তেমনি কোনো গাছের তলায় কিংবা কারও বাড়ির উঠোনেও সাধারণ ভক্তের সামনেও পরিবেশিত হত। তবে পরাধীন বাঙালি পাশ্চাত্যের মোহে এতটাই মজেছিল যে দেশীয় সংস্কৃতি বিচার বিশ্লেষণের সময় পশ্চিমের নাট্যতত্ত্ব দিয়ে তা বিচার করা হয়েছিল। প্রায় গীতবর্জিত, সংলাপপ্রধান, অ্যাকশন ও ক্লাইম্যাক্স প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে গিয়ে নাটকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়েছিল। কাব্য, সংগীত, নৃত্য, বাদ্যের পৃথক পৃথক ইতিহাসচর্চার পরিবর্তে এই আলোচনায় উঠে এসেছে একটি সামগ্রিক উপস্থাপিত রূপ। এর উপস্থাপিত রূপটিকে নাটক বলা কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে তা এই আলোচনাপর্বে বিচার করা হয়েছে। বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন *চর্যাপদ*-এর কাল (অষ্টম-দ্বাদশ শতক) থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল (অষ্টাদশ শতক) পর্যন্ত সময়ের অর্থাৎ, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যিক নিদর্শনে নাট্য-উপস্থাপনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে এখানে। বিশেষত পদাবলী কীর্তন ক্রমে লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন বা রসকীর্তন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নাটগীত এবং লীলানাট্যের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

চৈতন্যদেবের নির্দেশনায় নাট্য-উপস্থাপন এক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। চৈতন্যদেব নির্দেশিত লীলানাটক অভিনীত হওয়ার পর পদাবলী কীর্তনের নাট্যধর্মীতা পূর্বের তুলনার বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে লীলাকীর্তনের বিকাশে তা কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। আলোচনাপর্বের এই অংশে লীলাকীর্তনের উপস্থাপন সেই সময় কেমন ছিল তার একটি সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

নাটকের ইতিহাস অনুসন্ধানের সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের যোগ নিবিড়। মধ্যযুগে অন্যান্য নাট্যসংরূপের মধ্যে পদাবলী কীর্তন অন্যতম উপস্থাপন পদ্ধতি রূপে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পদাবলী কীর্তনের ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। আদিম আলোয়ার জাতির মধ্যেও দেখা গেছে পদাবলী রচনা করে কীর্তন করার রীতি। অন্যদিকে *চর্যাপদ* সংগীতের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হত। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে *চর্যাপদ*-এর উপস্থাপন পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে এক সূত্রে মিলিয়ে দেখা যায়। পরবর্তীকালে *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বৈষ্ণব পদাবলী একই ধারায় অর্থাৎ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হত। এই আলোচনাপর্বে ড. সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, আহমদ শরীফ, নাট্যকার সেলিম আল দীন, সাইমন জাকারিয়া প্রমুখের বাংলা নাটক সম্পর্কিত যুক্তিপূর্ণ মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

লীলা এবং কীর্তন একীভূত হয়ে উপস্থাপিত হত ঠিকই তবে তা যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল; এমন নয়। এর পাশাপাশি কথকতাধর্মী উপস্থাপনপদ্ধতি ছিল বেশ জনপ্রিয়। পাঁচালি শ্রেণির রচনা পদ্ধতি ও উপস্থাপন জনগণের মনে স্থায়ী আসন পেতেছিল। অনুবাদকাব্য রামায়ণ, মহাভারত অন্যদিকে প্রধান ও অপ্রধান মঙ্গলকাব্য এবং সব শেষে প্রণয়োপাখ্যানের নাটকীয় উপস্থাপন গবেষণাধর্মী আলোচনায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। সকল উপস্থাপনের মধ্যেই গীত-নৃত্য-বাদ্যের সম্মিলিত উপস্থাপন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই আশ্চর্য মিল থাকার দরুন বাংলার নিজস্ব নাট্যবৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। পদাবলী কীর্তনের মধ্যে নাটকের ঐতিহ্যবাহী রূপটি কেমনভাবে বিরাজ করেছে, তা বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন সাহিত্যিক নিদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় কীর্তনের আঙ্গিক বিচার। পদাবলি কীর্তন ও লীলাকীর্তনের সংরূপ গঠনে নাটগীত, ধামালী, ঝুমুর, লীলানাট্যের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি নাট্যাঙ্গিক হিসেবে কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ বিশদে আলোচিত হয়েছে। কীর্তন ও সংকীর্তনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের পাশাপাশি এই শ্রেণির নামকীর্তন যে কেবলমাত্র সংগীত রূপেই বিবেচিত হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পদাবলী-

লীলা-পালা-রস কীর্তনে নাটকের সমস্ত গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের ধারাকে সজল রেখে। তাই এই শ্রেণির কীর্তন কেবলমাত্র সংগীত হয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। লীলাকীর্তন উপস্থাপনে এর গঠনগত দিক বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কীর্তনের বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা, অঙ্গ, ঘরানা, অষ্টকালীয় নিত্যলীলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে এর উপস্থাপনের গঠনগত কাঠামো পরিস্ফুট হয়েছে।

লীলাকীর্তন শাস্ত্রানুযায়ী নাটকের আঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে কী না তা ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোকে দেখানো হয়েছে। কীর্তনের আঙ্গিক গঠনে *নাট্যশাস্ত্র*-এর মতো প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষত বৈষ্ণবদের রসশাস্ত্র, নায়ক-নায়িকা বিভাজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের অনুসরণ করা হয়েছে। সেই অনুসারে চৌষট্টি রসের কীর্তন বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত রয়েছে। একজন কীর্তনীয়া আসরে কীর্তন উপস্থাপনকালে রসপর্যায়ের অবস্থান অনুসারে নায়ক-নায়িকার ভাব অভিনয়ের (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। কখনো সেই পর্যায়ের রসের অবস্থান ভক্তদের সম্মুখে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত রঙ্গালয়, পূর্বরঙ্গ বিধি, অভিনয়, বৃত্তি ইত্যাদি লীলাকীর্তনের উপস্থাপনে পাওয়া যায় কী না অথবা তার আংশিক বা পূর্ণ অনুসরণ করা হয় কী না তা খোঁজার চেষ্টা চলেছে এখানে।

এই অধ্যায়ের শেষ অংশে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অনুসারে পদাবলী ও লীলাকীর্তনের আঙ্গিকগত সাযুজ্য খোঁজ করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের যে ব্যাপ্তি ছিল, তা আজকের চিন্তা-চেতনায় ধরা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। নাটক ছিল কাব্যের অন্তর্গত। দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। দৃশ্যকাব্য রূপক এবং উপরূপকে বিভক্ত। দশটি রূপকের মধ্যে একাঙ্কিক রূপকগুলির সঙ্গে লীলাকীর্তনের মিল রয়েছে। দৃশ্যকাব্যের উত্তরাধিকার সূত্রে লীলাকীর্তনকে ভাবা যায় কী না তা এই অংশে নিরূপণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নাটক রূপে লীলাকীর্তনের উপস্থাপনভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমানে একটি কীর্তনের দলে সদস্য সংখ্যা সাধারণত পাঁচ থেকে দশ জন হয়। মূলগায়েন সংগীত, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। একজনের বহু ভূমিকায় যুক্ত থাকা স্পেশালাইজেশনের যুগে অবাস্তব মনে হতে পারে। বর্তমানে বহুচরিত্রের সংলাপময় থিয়েটার উপস্থাপনের সঙ্গে এক দাঁড়িপাল্লায়

মাপলে কীর্তনের সঙ্গে সঠিক বিচার করা হবে না। বর্তমানে বহুচরিত্রের সংলাপময় থিয়েটার উপস্থাপনের সঙ্গে এক দাঁড়িপাল্লায় মাপলে কীর্তনের সঙ্গে সঠিক বিচার করা হবে না। থিয়েটারের উদ্ভব কৃত্যানুষ্ঠানমূলক গীত-নৃত্য-বাদ্যর দ্বারা সূচিত হয়েছিল। কালের প্রবাহে এতে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান বাদ গেছে। গীত-নৃত্য-বাদ্যের পরিবর্তে গদ্যসংলাপনির্ভর উপস্থাপনভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছে। রূপান্তরের এই সকল ধাপ বাংলা তথা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় সম্পন্ন হয়নি। অন্ততপক্ষে ইংরেজরা যখন ভারতে আসে তখন ধর্মীয়কৃত্যকে বাদ দিয়ে নাট্য-উপস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। গান, নাচ ও বাদ্যযুক্ত অভিনয় পদ্ধতি তখনও বেশ জনপ্রিয় ছিল। থিয়েটার দেখে নাট্যসংরূপের ধারণা ক্রমাগত পালটে চলেছিল শহুরে শিক্ষিত মানুষের। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপ অবহেলায় ক্রমেই স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এই সমস্ত কারণে বাংলা নাটকের ইতিহাস পাঠে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ আবশ্যক।

কীর্তন একধরনের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানমূলক নাট্য উপস্থাপন। কৃত্যানুষ্ঠান সহযোগে নাটকের উপস্থাপনকে বুঝতে অভিনয় বিদ্যার (Performance Studies) তত্ত্ব দিয়ে কীর্তন উপস্থাপনের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে। অভিনেতা রূপে মূলগায়েন এবং দর্শকের আসনে ভক্তবৃন্দকে রেখে তাঁদের অবস্থানগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করা গেছে। একটি উপস্থাপনের উপাদান হিসেবে স্থান ও কাল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। একই কীর্তন দলের দুই ভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত রাসলীলার পালা ভিন্ন স্বাদের আস্বদ দিতে পারে। এক্ষেত্রে তা দুটি পৃথক পালার মতো আস্বাদ্যমান হয়ে ওঠে। আলোচনার এই অংশে কীর্তনের বিভিন্ন কৃত্যানুষ্ঠান উপস্থাপনবৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিচার করা হয়েছে। তবে ধর্মের সঙ্গে সংঘাত না করেই তা সম্পন্ন হয়েছে।

কীর্তনানুষ্ঠানকে নাট্যানুষ্ঠান রূপে দেখা এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে নাটকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য কীর্তনানুষ্ঠানের মাধ্যমে খোঁজ করা হয়েছে। মূল গায়েন, ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক, নৃত্য, আসর পরিকল্পনা, আলো, বাদ্য ও শব্দ-যন্ত্রাংশ, সাজসজ্জা, প্যারডি গান, স্থান-কালের গুরুত্ব, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব, কাহিনির বিকাশ, হাস্যরসের সঞ্চার ইত্যাদির সাহায্যে উপস্থাপনের বিচারে কীর্তন যে কতটা নাট্যাঙ্গিক সেই প্রসঙ্গই এখানে উঠে এসেছে। মধ্যযুগ এবং সমসাময়িক কীর্তন সংরূপের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যে সব পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের আসর বসছে তার একটি রূপরেখা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করা হয়েছে। পেশাজীবী কীর্তনীয়াদের

হাতে কীর্তনের স্বরূপ কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে তা এই আলোচনায় উঠে এসেছে। দূরদর্শন, মুঠোফোন ও আন্তর্জালিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কীসের টানে আজও মানুষ পালাকীর্তনের আয়োজন করে চলেছে তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

অন্তিম অধ্যায়ের আলোচনাপর্বে ইংরেজশাসিত বাংলার নব্যগঠিত সমাজব্যবস্থায় বিনোদনমূলক নাট্যসংরূপের বিকাশে পদাবলী ও লীলাকীর্তনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের ক্রমবিবর্তনে কীর্তনের ভূমিকা কেমন ছিল তার একটি কালানুক্রমিক রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনব্যবস্থা কায়েম হলে তা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্তরে প্রভাব ফেলেনি। বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট এই রাজনৈতিক পালাবদলে যথেষ্ট আন্দোলিত হয়েছিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা এই পালাবদলের আবর্ত থেকে দূরে থাকেনি। এই সময় নাট্যসাহিত্য বিচার এবং নাটকের উপস্থাপনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সামন্ততন্ত্রের পতন ও নয়া পুঁজিবাদের আগমনে এক গলিত সমাজব্যবস্থায় লালিত হয় বাবুসংস্কৃতি। নব্য গঠিত ‘ক্যালকাটা’ শহরের নতুন ব্যবস্থা, শিল্পের চাহিদা, বিনোদনের মাপকাঠি ইত্যাদি হঠাৎ করে পালটে যায়। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উদ্ভূত হয় ইংরেজদের থিয়েটার। প্রথাগত নাটকের উপস্থাপনে পরিবর্তন আসে। কখনোবা নতুন নতুন নাট্যসংরূপের জন্ম হয়। তবে নতুন নাট্যসংরূপগুলি পুরাতনকে একেবারে অগ্রাহ্য করে জন্ম নেয়নি। পাঁচালি, পদাবলী ইত্যাদির উপস্থাপন তখনও চলছিল। সেই উপস্থাপন ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে নব্যগঠিত নাট্যসংরূপগুলিকে। এই পর্বের আলোচনায় পদাবলী কীর্তনের ধারা যে সকল নাট্যসংরূপগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছিল তা নির্দিষ্ট কালপর্বের ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে। খেউড়, কবিগান, ঢপ-কীর্তন, আখড়াই, টপ্পা, যাত্রা, গীতাভিনয়, পৌরাণিক নাটক, মণিপুরি নাট্য, অঙ্কিয়া নাট ইত্যাদির উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে কীর্তন কীভাবে ও কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এই পর্বের আলোচনায় দু'জন দিক্‌পাল নাট্যব্যাক্তিত্বের কথা উত্থাপন করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের নাট্য উপস্থাপনে দেশীয় ঐতিহ্যকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাদল সরকার। তাঁদেরা নাট্যভাবনার সঙ্গে কীর্তনের উপস্থাপনকে মেলানো যায় কী না, তা নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে। এই অংশের আলোচনায় হয়তো সরাসরি কীর্তনের অনুসরণ দেখানো হয়নি। তবে

তাঁদের নাট্য উপস্থাপনের মূল ধারণা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা তথা পদাবলী কীর্তনের উপস্থাপনকেই সমর্থন করে। সমস্ত ক্ষেত্রেই নাট্যঙ্গিক রূপে কীর্তন কতটা কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে, তা গবেষণাকর্মের আলোচনায় ভরকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে।

কীর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলায় কীর্তনের বিবর্তন

১:০ ভূমিকা

পদাবলী কীর্তন উচ্চমার্গের সংগীত বিশেষ, যা উপস্থাপনে ভীষণভাবে নাট্যগুণান্বিত। উৎকৃষ্ট পদাবলী এর অবয়ব প্রদান করেছে। সুর-তাল-রাগরাগিণীর সঞ্জীবনী শক্তি পেয়ে কীর্তনগান আস্বাদ্যমানতার পরাকাষ্ঠা স্পর্শ করেছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবকে বলা হয় কীর্তনের জনক, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় কীর্তনের প্রচলন ছিল। সেই আদি কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কীর্তনের জনপ্রিয়তায় কখনো ভাঁটা পড়েনি। কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণে ব্যাপৃত থেকেই মানুষ তৃপ্ত থাকতে পারেনি। বেঁচে থাকার জন্য অন্নের সঙ্গে বিনোদনের সহাবস্থান থাকার কথাও ভেবেছে মানুষ। দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করার জন্য বিনোদনের বিভিন্ন উপায়ের সন্ধানে মনুষ্যজাতি ব্যাপৃত থেকেছে। কৃষিজীবী প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় কাজের সঙ্গে অবসরের মাত্রাও ছিল অধিক। অবসর উজ্জাপন করতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিনোদন ও ঈশ্বরের নামগান এবং জীবনকাহিনি শ্রবণ এক বিশেষ উৎসাহ প্রদান করত। বিনোদন-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে গল্প-কাহিনির আশ্রয় নেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে উঠেছিল। মানুষ যা শুনতে পছন্দ করে ও বলতে চায় তা নিয়েই নানা গল্প তৈরি করে। গল্পের মধ্যেই নিহিত মানব জাতির স্মৃতি-সত্ত্বা-ভবিষ্যৎ। গুহাচিত্রে যে শিকারের ছবি পাওয়া যায় তাতেও একধরনের গল্প বলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। কে শুনবে এই গল্প? তার পরবর্তী প্রজন্ম হবে সেই গল্পের শ্রোতা। তার অস্তিত্ব সঞ্চারিত হবে বহু প্রজন্মের বহু শ্রোতার মধ্যে। মানুষ তার আহরিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মকে হস্তান্তরিত করে তার মধ্যেই বেঁচে থাকে। গল্পের মাধ্যমে আহরিত জ্ঞানের প্রজন্মান্তর সহজেই করা সম্ভব। তাতে যদি ধর্মের মোড়ক থাকে তবে তার আয়ু বাড়ে বই কমে না। বিনোদনের কৌশল যুক্ত হয়ে তা সর্ববরেণ্য হয়ে ওঠে। সেহেতু প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতা কাহিনি, বিনোদন, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম একই সূত্রে গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে উপস্থাপনের কৌশল আয়ত্ত্ব করে চলেছিল।

সাহিত্যের মধ্যেও গল্প বলার এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপের মধ্যে লুকায়িত আছে গল্প বলার মাধ্যমে সংযোগস্থাপনের প্রবল ইচ্ছা। কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, নৃত্য, সংগীত, যাত্রা, পালাগান, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির মধ্যে সন্তর্পণে সংযুক্ত করা হয় সময়োপযোগী কথা ও কাহিনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য অজস্র গল্প-কাহিনির দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। তবে তা ছিল একান্ত ধর্মনির্ভর। কীর্তনও তার ব্যতিক্রম নয়। পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তনে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের দিব্য উপাখ্যান। কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান বললে ভুল হবে, তাতে জাতির ঐতিহ্য বিধৃত রয়েছে। দেবতার জন্ম, তাঁকে ঘিরে থাকা প্রবল বিশ্বাস ও গড়ে তোলা বৈচিত্র্যময় কাহিনি রচনা, সবটাই সম্ভব হয়েছিল বোধ হয় মানবের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্তে। কবি কালিদাস রায় *চাঁদ সদাগর* কবিতায় যথার্থই লিখেছেন— মানুষই দেবতা গড়ে/ তাহারই কৃপার পরে/ করে দেব মহিমা নির্ভর। ভক্তিধর্মের প্রসার এবং কীর্তনের সম্প্রচারে একজন মান্য দেবতা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিধর্মের সম্প্রচার-অঙ্গ রূপে কীর্তনকে প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর মধ্যে বৃহৎবঙ্গ এবং ভারতের ধর্মীয় সামাজিক ঐতিহ্যের কাহিনি বর্ণনা নিহিত রয়েছে। কীর্তন সম্পর্কে জানতে হলে এর অন্তরালে থাকা ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করলে চলে না। বর্তমানে প্রচলিত কীর্তনকে নিপুণভাবে বুঝতে ও জানতে এর ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়াটা আবশ্যক।

১:১ কীর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চারুকলা ও হৃদয়াবেগের সঙ্গবদ্ধ লালিত্যপূর্ণ ভাব-মথিত রূপ কীর্তন। বিনোদন, ভক্তি, জাতির ইতিহাস, জীবনযাপন, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায় ইত্যাদির এক মিশ্র সুসংবদ্ধ রূপ কীর্তন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *আমরা* কবিতায় বাঙালির আত্মবন্দনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> কীর্তনে আর বাউল গানে আমরা দিয়েছি খুলি,
> মনের কোনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।[১]

কীর্তনের আসরে বসে বোঝা যায় কথাটা কতখানি সত্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। কীর্তন বাঙালির প্রাণের ফসল হলেও একে বাঙালির একেবারে নিজস্ব সম্পদ বলাটা ঠিক হবে না। বরং বলা যায় কীর্তন বাংলার

সরস মাটি ও জলহাওয়ার স্পর্শে সিক্ত হয়ে প্রস্ফুটিত লাবণ্যমণ্ডিত কুসুমে পরিণত হয়েছে। ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষার মিষ্টতায় পরিপূর্ণ রূপ বাংলার কীর্তন।

কীর্তন সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে 'কীর্তন' শব্দের অর্থগত দিকটি আলোকিত করা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংস্কৃত কীর্ত্তি+অনট্ (ল্যুট্)-ভাববাচ্যে> কীর্ত্তন> কীর্তন। মতান্তরে কৃ+অন্= কীর্তন। এর আভিধানিক অর্থ হল— ঘোষণা, প্রচার, সংশব্দন; কথন, বচন; গুণকথন, স্তবন; বর্ণন, বিবরণ। আভিধানিক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কীর্তন' শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন— (বাঙ্‌লায়) কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সঙ্গীতবিশেষ; সংকীর্তন।[২] 'বাঙ্‌লায়' কথাটি বন্ধনীর মধ্যে রাখার অভিপ্রায় হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে উক্ত অর্থ কেবলমাত্র বাঙালির কাছে বিশেষভাবে অর্থবহ। কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগীতকেই কীর্তন বললে শব্দার্থের সংকোচন ঘটতে পারে। কীর্তনের পরিসর বৃহৎ, সুতরাং শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। অভিধানকারের প্রদত্ত অন্যান্য অর্থগুলি উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সংশব্দন, ঘোষণা, গুণকথন, বচন, দোষকীর্তন-কথা, বিবরণ, স্তবন; ইষ্টদেবতার গুণকথনরূপ বা নামগানরূপ ভক্তির লক্ষণ-বিশেষ। গুণকীর্তন রূপটি ব্যবহার করলে দুর্গাকীর্তন, কালীকীর্তন, রামকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, রাধাকীর্তন, গৌরকীর্তন —সকলই কীর্তনের অন্তর্গত। কেবলমাত্র গুণকীর্তনই নয়, দোষের বর্ণনাকেও (দোষকীর্তন-কথা) কীর্তন বলা যেতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, বাংলায় 'কীর্তন' শব্দটির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের অনুষঙ্গ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির সম্পর্কের পরিচায়ক 'কানু বিনা গীত নাই' প্রবাদটি। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বোঝা যায় প্রবাদের তাৎপর্য কতখানি। ধর্মীয় ভক্তিভাবে আপ্লুত মানুষের মননশীলতার রূপ প্রকাশিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীসহ অন্যান্য ভক্তিসাহিত্যে। বহিরাঙ্গে রাধা ও অন্তরঙ্গে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত (বৈষ্ণব মতানুসারে) হন। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাঁর নামসংকীর্তনের ছত্রছায়ায় ডেকে এনেছিলেন। এক অভিনব ভক্তিভাবকে ধারণ করে বাংলার সমাজসংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হলে সুর-তালে, ভাবের মূর্ছনায় পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।

কীর্তন নিয়ে যাঁরা গবেষণায় নিয়োজিতপ্রাণ তাঁদের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী ও হিতেশরঞ্জন সান্যাল প্রমুখেরা কীর্তনের অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনায় ভক্তিধর্মের আকর গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর উল্লেখ নানা প্রসঙ্গে এনেছেন। এই গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের আকর গ্রন্থ রূপে ধরা হয়। *গীতা*-য় কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। কিন্তু *গীতা*-য় ভক্তির সঙ্গে ভাগবতের ভক্তির তফাৎ রয়েছে। সেখানে ভক্তির মাধ্যমে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভাগবত আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভক্তির মাধ্যমে মোক্ষের কামনা করে না। বৈষ্ণবদের কাছে মুক্তির বাসনা 'কৈতবপ্রধান' বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মনে করেন। চৈতন্যদেব এই অহেতুক ভক্তির সম্প্রচার করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ কীর্তন সম্বন্ধীয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক হল—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেনোরধরসুধায়া পূরয়ণ্ গপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারন্যং স্বপদরমনং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ।।[৩]

এর অর্থ সুন্দর দেহ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের ভূষণ, কানে কর্নিকার ফুল, পরনে সোনার মতো উজ্জ্বল পীতবাস, গলায় বৈজয়ন্তী মালা, ঠোঁটে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ লীলাভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। এখানে ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপের প্রশংসা যে গানের মাধ্যমে করলেন তাকেই ভাগবতকার বলেছেন 'কীর্তি'। 'কীর্তি' এবং 'কীর্তন' একই ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই গ্রন্থে ২৩ তম শ্লোকে বিষ্ণুভক্তি লাভের নয়টি উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এর সঙ্গে ২৪ তম শ্লোকটিও সম্পর্কযুক্ত। শ্লোক দু'টি এইরূপ—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।২৩।।
ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমম্।।২৪।।[৪]

দু'টি শ্লোক মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বিষ্ণুর পদসেবা, পূজার্চনা, স্তবন, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন —এই নয় প্রকার লক্ষণযুক্ত ভক্তি যে অধ্যয়ন দিয়ে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করা হয়, তাকেই শ্রেষ্ঠ বা উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করা হয়।

কীর্তন করার পূর্বে তা শ্রবণ করা বিশেষভাবে কর্তব্য। শ্রবণ না হলে কীর্তনীয় বস্তু অজ্ঞাতই থেকে যায়। ভগবানের নাম শ্রবণ করার জন্য এক বা একাধিক কীর্তনকারী আবশ্যক। *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থের রচয়িতা জীব গোস্বামীর মতে, কেউ কীর্তন করলেই শ্রবণ সম্ভব হয় কিন্তু মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক নাম-গুণ-রূপ ও লীলা কীর্তিত হলে তা শ্রবণ করাই শ্রেয়।[৫] তবে মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক কীর্তন শোনার সৌভাগ্য না হলে পৃথক কীর্তন করার নির্দেশ রয়েছে। *ভক্তিসন্দর্ভ*-এ এর উল্লেখ আছে—

> বিশেষতশ্চ যদি সাক্ষাদেব মহকৃতস্য কীর্ত্তনস্য শ্রবণভাগ্যংঙ সম্পদ্যতে, তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তনীয়মিতি তৎপ্রাধান্যাৎ।[৬]

কীর্তন গানের সঙ্গে শৃজনশীলতার যোগ রয়েছে। একজন দক্ষ ও মহৎ ব্যক্তির কীর্তন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম। কীর্তন যদি বহুজন মিলিত হয়ে করা হয় তাহলে তা হয় 'সংকীর্তন'। *ভক্তিসন্দর্ভ*-এ জীব গোস্বামী বলেছেন— বহুভির্মিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্তনমিত্যুচ্যতে।[৭] এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থের শ্লোক উল্লেখ্য—

> কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
> যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রবৈষজন্তিহি সুমের সঃ।।[৮]

অর্থাৎ যা মনের মালিন্য দূর করে, যা সংসাররূপ দাবাগ্নি শান্ত করে, যা মঙ্গলময় পথরূপ শ্বেত পদ্মে শুভ্রজ্যোৎস্নার মতো, যার পদে পদে অমৃতের আস্বাদ পূর্ণরূপে বিরাজমান, যা শুনলে সুখসাগর উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, যা আত্মাকে অভুতপূর্ব আনন্দ প্রদান করে সেই হরি সংকীর্তন জয়যুক্ত হচ্ছে।

বহুজন অর্থাৎ একা নয়। একসঙ্গে অনেকে মিলিত হয়ে সংকীর্তন করার মাধ্যমে কীর্তন আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রসারিত হতে পারে। একই কারণে কীর্তন উচ্চস্বরে করার বিধান রয়েছে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে— নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম।।[৯] *ভক্তিসন্দর্ভ*-এ জীব গোস্বামীর টীকায় উল্লেখ পাওয়া যায়— নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম।[১০] মনে মনে নাম জপ করলে লজ্জার অবকাশ থেকে যায়। তাই উচ্চস্বরে নিজে ও সকলকে কীর্তনের আস্বাদ করানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে নামের পাশাপাশি ধর্মের প্রচার করা সহজ হয়। কীর্তনকে জীবনযাপনের অঙ্গ করে তুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থের একটি শ্লোকে এর নির্দেশ রয়েছে। শ্লোকটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল—

উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুৎতৃট্ প্রজ্বলিতা দিষু।। ইতি।।[১১]

অর্থাৎ জেগে থাকা অবস্থায়, ঘুমের সময়, খিদে পেলে, পিপাসা পেলে, চলতে চলতে কোথাও যেতে হলে, পতনের সময় সর্বদা 'গোবিন্দ গোবিন্দ' —এই কীর্তন করতে হবে। বৈষ্ণব সন্ত ও সাধকদের বিশ্বাস সংসারজীবনে কৃত পাপের অবসান ঘটে কীর্তনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নিশান।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম।।
কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমাবৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রমজ্জন।।
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক।।[১২]

ভক্তির ভাব অত্যন্ত সংক্রমক, কীর্তন তার বাহনস্বরূপ। অর্থাৎ একজনের ভক্তি অপর জনের মনে ভক্তিরস সঞ্চারিত করে। এই দিক দিয়ে কীর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় বিধি রূপে বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলেই কীর্তন করতে পারেন। এমনভাবে কীর্তন করতে হবে যাতে শ্রোতার মন ভক্তিভাবে বিগলিত হয়। আন্তরিকতার সঙ্গে গাওয়া গান শ্রোতার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ভক্তি কেবলমাত্র ভক্তের মনে থাকলেই চলবে না, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

মানুষের হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্দীপনা প্রকাশ করার সর্বোত্তম পন্থা কীর্তন। গান হবে মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে এবং নানাবিধ রাগরাগিণী ও নির্দিষ্ট তাল অনুসারে। গানের মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করা হয়। অতএব নিয়ম মেনে গান করাটা ধর্মীয় আচারের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সংকীর্তন ও নামপ্রচার যে সর্বোত্তম সাধনা তার উল্লেখ পাওয়া যায় *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে। সেখানে চৈতন্যদেব বলেছেন—

নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই তসুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।[১৩]

কীর্তন মধ্যযুগীয় জনমানসে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষত বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে কীর্তন স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র মৌখিকভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়নি। এইজন্য কীর্তন ও কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য *ভাগবত, পদ্মপুরাণ* ইত্যাদি গ্রন্থের সমালোচনা গ্রন্থ রূপে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তি-সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ভক্তির স্বরূপ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের থেকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পুরাণের উপর বৈষ্ণবধর্ম ছিল ভীষণভাবে নির্ভরশীল। পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থগুলিতে দিব্যরূপে চৈতন্যের দেবত্ব প্রতিষ্ঠা করার বলিষ্ঠ অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। ভক্তির জোয়ারে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়েছে তখন বাংলার মানুষও তা থেকে বিমুখ থাকেনি। ভক্তিধর্মের সংগঠক ও প্রচারক রূপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। গৌরাঙ্গের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠায় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ভক্তিধর্মের আবহে মুসলমান শাসনের প্রকোপ থেকে নিস্তার পেতে একজন অবতার কামনা করেছিল। চৈতন্যদেব কলিযুগে সেই অবতারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর উত্থান ও বৈষ্ণবধর্মের সম্প্রচার এবং কীর্তন উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে নিহিত রয়েছে ভক্তিধর্মের ইতিহাস। এক্ষেত্রে ভক্তি তথা ভক্তি ধর্মান্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আবশ্যক।

১:২ ভক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য ও কীর্তন

আরাধ্য দেবতার প্রতি গভীর প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলে হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। কীর্তনের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক নিবিড়। মনে ভক্তিভাব না থাকলে কখনোই কীর্তনের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। ‘ভক্তি’ শব্দটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে ‘ভক্তি’ শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। পরবর্তী পৌরাণিক ও উপনিষদীয় যুগে এসে ভক্তি শব্দটির অর্থ বিস্তারিত হয়। উপনিষদের ভক্তি বিশেষ কোনো নামধারী দেবতা বা দেবোপম মানুষকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়নি। তা ছিল কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলভাব। ভক্তি ও আরাধ্য দেবতার বিশেষ কোনো সম্পর্ক সেই সময় প্রাধান্য পায়নি। উপনিষদীয় ভক্তিকে অদ্বৈত ভক্তি বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে এই অদ্বৈত মতবাদের বিকল্প ধর্মাচরণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। এই বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উপনিষদের ভক্তিমূলক উপাসনার

কথাগুলোকে সংকলিত ও বিশিষ্ট রূপবদ্ধ করাটা জরুরি হয়ে উঠেছিল বলেই রচিত হয় *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভাগবদ্‌গীতা*-র মতো গ্রন্থগুলি। এতে শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বশক্তিমান দেবতা; ভক্তির উৎস্রোত। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতে—

> বস্তুত ভাগবদ্‌গীতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনার মধ্যেই ভক্তিধর্ম সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।[১৪]

ভক্তিধর্মের প্রাণপুরুষ রূপে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব কীভাবে একীভূত হলেন তা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ কাল দ্বন্দ্ব, সহাবস্থান ও সমন্বয়ে অতিবাহিত হয়। সেক্ষেত্রে দৈবসত্ত্বার একীভূত হওয়ার সময়কাল নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন।

ভক্তি আন্দোলন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরণ

বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে নানান প্রসঙ্গ ও পুরাণে, বেদোত্তর কালে কিংবা প্রাচীন লিপিলিখনে ও ভাস্কর্যে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ* (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১২০০)-এ যেখানে তিনি অন্যতম বৈদিক ঋষি রূপে পরিচিত ছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এর ৮ম মণ্ডলের ৮৫-৮৬ সুক্ত এবং ১০ম মণ্ডলের ৪২-৪৪ সূক্ত তাঁর রচনা বলে কথিত আছে। অন্যত্র দেবকীপুত্র রূপে কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ। এখানে তাঁর পরিচয় ঘোর আঙ্গিরস ঋষির শিষ্য রূপে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মত উল্লেখ্য—

> দেবকীপুত্র রূপে কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে যেখানে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কাছে তিনি শিষ্যরূপে উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতা কৃষ্ণ এবং ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একই ব্যক্তি কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণই যে ভগবদ্‌গীতার মূল প্রবক্তা সে বিষয়ে অনেকে একমত।[১৫]

আজ আমরা যে কৃষ্ণকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত দেখি তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছেন বিষ্ণু, নারায়ণ, হরি, বাসুদেব প্রভৃতি বিচিত্র অলৌকিক দেবসত্ত্বা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে এঁরা ছিলেন পৃথক অস্তিত্বের। ভক্তি আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবতারা একক সত্ত্বায় পরিণত হন।

বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার রূপে পরিচিত কৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ড. সত্যবতী গিরির মত এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু', এবং 'কৃষ্ণ' আজ অভিন্ন হলেও এঁদের মধ্যে রয়েছেন বৈদিক 'আদিত্য বিষ্ণু', উপনিষদের 'বাসুদেব-কৃষ্ণ' এবং ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের 'নারায়ণ'।[১৬]

বিষ্ণু একজন প্রধান বৈদিক দেবতা। অন্যদিকে কৃষ্ণ বৈদিক ঋষি এবং ঘোর আঙ্গিরস ঋষির শিষ্য। এঁদের একক সত্ত্বায় পরিণত হওয়া ভক্তি আন্দোলন তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খুব সহজেই এঁরা একে অপরের অঙ্গীভূত হননি। কারণ উপাসক সম্প্রদায়ের কেউই চান না তাঁদের আরাধ্য ঈশ্বর অন্য দেবতার আড়ালে থাকুক। তাই আরাধ্য দেবতার সম্মেলনেও সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করে নিতে দেখা যায় না। প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস সর্বকালে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার জন্য সুযোগ খুঁজেছে সর্বত্র। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে—

বৈদিক পরিবেশে বর্ধিত হইয়াও কৃষ্ণ কিন্তু বৈদিক ধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না।[১৭]

বৈদিক বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী মনোভাব থেকে কৃষ্ণ অস্তিত্ব ধারণ করেন। আর্য-অনার্যের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব কৃষ্ণের মাধ্যমে ক্রমেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ক্ষয়িষ্ণু (শৈব, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের প্রভাবে) ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে কৃষ্ণের প্রবল ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি ও যুক্তি কোনোটাই ছিল না।

কৃষ্ণ ও তাঁর ভাগবতধর্ম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে আনুমানিক চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে মৌর্যযুগে বেদবিরোধী নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এমতবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আপসের পথ খুঁজতে লাগলেন। তাঁদের কাছে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ভাগবতপন্থীদের সঙ্গে আপোস করাটাই শ্রেয় মনে হয়। এই সময় থেকেই নারায়ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব কৃষ্ণের অভিন্নতা-স্থাপনের প্রচেষ্টা সূচিত হয়। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয়পক্ষকেই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে দেখা যায়। রক্ষণশীল বৈদিক সম্প্রদায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়ায় ভাগবত ধর্মের জয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে তাঁদের পরমপুরুষ বিষ্ণুর অবতার রূপেই গ্রহণ করেন। ফলে কৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম মূল বিষ্ণুর ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এতে ব্রাহ্মণেরা একধরণের নৈতিক জয়ের আস্বাদ পেয়েছিলেন।

বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে বিষ্ণুর কতগুলি গুণ আরোপিত হয় কৃষ্ণে। *গীতা*-র পার্থসারথি কৃষ্ণের সঙ্গে গোকুলের গোপ বালক গোপাল কৃষ্ণের সংযোগসাধন এরই প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করাটা ভুল হবে না। দীর্ঘ সময় জুড়ে সংমিশ্রণের কাহিনি নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। *মহাভারত*-এ এই অবতার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়েছে। *মহাভারত*-এ যে কৃষ্ণের পরিচয় পাই তিনি একজন কূটনীতিজ্ঞ, যুদ্ধে পারদর্শী, ভক্তবৎসল ও পরমতত্ত্বজ্ঞানী চরিত্র। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* গ্রন্থে এই বীর কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার সাহিত্য ও স্থাপত্যে কৃষ্ণের যে রূপটির একাধিপত্য তা *হরিবংশ* এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত গোপালকৃষ্ণের রূপ।

ভক্তি আন্দোলন কালক্রমে পুরাণাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় মঞ্জরীভাবের অধীষ্ঠাতা হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণ। মোক্ষ নয় বরং সমর্পিত প্রাণের অধিকারী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার মাটি পাথুরে শক্ত নয়। তা সরস ও কোমল। জলবায়ু ও মৃত্তিকার কোমলতা বাঙালির হৃদয়কেও প্রভাবিত করেছে। এমন কোমল ভক্তহৃদয়ে প্রখর তেজস্বী কৃষ্ণ কখনোই অধিষ্ঠান করতে পারেন না। ভগবান রূপে তিনি প্রেমিক, গোপীজনবল্লভ, ভক্তসখা ও স্নেহভাজন সন্তান। এক্ষেত্রে ড. সত্যবতী গিরির মতটি উল্লেখ্য—

> কিন্তু ভাগবতে ঐশ্বর্যের পাশাপাশি ব্রজলীলার স্নিগ্ধ মাধুর্য, পিতা মাতা ও বন্ধু-পরিজনের পারস্পরিক সম্পর্কের অকৃত্রিমতা ভক্তিরসার্দ্র হয়ে মধুরভাবে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ এই একই পথে যাত্রা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। রাধাকৃষ্ণ ও গোপীলীলার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে এই পুরাণগুলির মধ্যে। আর তারই ধারাপথ বেয়ে বাংলা সাহিত্যে এসেছে বৈষ্ণবধর্মাভিষিক্ত কৃষ্ণকথার রসপ্লাবন।[১৮]

সুতরাং ভগবান কৃষ্ণকে গোপীজনবল্লভ রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। ভক্তের কাছে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে দেবতাকেও। এখানে একজন দেবতার চারিত্রিক দৃঢ়তার থেকেও অনেক বেশি ভক্তবাৎসল্য গুণ প্রয়োজন। ভক্তের আকুতিতে দেবতা কখনো বন্ধু কখনো প্রেমিক কখনো বা ননিচোরা নিষ্পাপ সন্তানের ভূমিকা পালন করেছেন। এত কাণ্ড করে তবেই একজন দেবতা জায়গা পেয়েছেন ভক্তের হৃদয়ে।

দাক্ষিণাত্যে ভক্তি আন্দোলনের স্বরূপ

পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ততদিনে দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণবধর্ম তথা ভক্তি আন্দোলন

নতুনরূপে বিকশিত হতে শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ নতুন রূপে কেন? মনে রাখতে হবে, দাক্ষিণাত্য ছিল দ্রাবিড়দের দেশ, ভক্তিধর্মের দেশ। শিব ছিলেন এঁদের প্রধান দেবতা। কৃষ্ণ যেমন নতুন করে দেবত্বের দাবি করে তেমন পরিস্থিতি এখানে শিবের নেই। দাক্ষিণাত্যে শিব পূর্বেই দেবতা রূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার করে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করাটা তুলনামূলক সহজ কাজ ছিল। শিবের ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটানো সহজ নয়। তিনি পৃথক বৈশিষ্ট্যের দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে তার ফারাক যথেষ্ট। অন্যদিকে ঈশ্বর-ভক্তির পাঠ নতুন করে দ্রাবিড়দের শেখানোটা ছিল মূর্খামির কাজ। ভক্তির মূল ধারণা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতটি উল্লেখ্য—

> ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে আর্য-দ্রাবিড়ের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখিলে ভক্তি-ধর্মকে দ্রাবিড়সভ্যতার সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেবল ভক্তি-ধর্মই নয়, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপনিষদে যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তাহা বৈদিক আর্য-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।[১৯]

দ্রাবিড়দের প্রধান ও প্রাচীন দেবতা শিব বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠেন। এমতবস্থায় বিজাতীয় দেবতার প্রতিস্পর্ধী দেবতা রূপে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠা করতে বৈষ্ণবদের বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়।

খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যদের ভারত আগমনের পরে দ্রাবিড়জাতি উত্তর-ভারত থেকে অপসারিত হয়ে দক্ষিণ-ভারতে বসতি স্থাপন করেন। দ্রাবিড়সভ্যতা আর্যসভ্যতার তুলনায় প্রাচীনতর এবং দুই জাতির মধ্যে আচার-আচরণের থেকেও বড় বিভেদ ছিল মানসিকতা ও বিশ্বাসে। দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রতিমার পূজারী, অন্যদিকে আর্যেরা একান্তভাবে প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। দ্রাবিড়দের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর-ভক্তিতে, আর্যরা বিশ্বাস করতেন অগ্নি উপাসনায় ও যাগযজ্ঞে। এ কারণেই বোধহয় বৈদিক সাহিত্যে দ্রাবিড়দের প্রভাব এত কম দেখা যায়।

সামরিক শক্তিতে বলীয়ান আর্যদের কারণে দ্রাবিড়গোষ্ঠী দক্ষিণে সরতে শুরু করলেও উত্তর-ভারত থেকে দ্রাবিড়জাতি একেবারে লোপাট হয়ে যান না। যাঁরা থেকে যান তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আর্যদের মেলবন্ধন শুরু হয়। সহাবস্থানের কারণেই হোক বা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার কারণেই হোক, দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে যাগ-যজ্ঞ-হোমাগ্নিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য সাধ্য-সাধন পদ্ধতি। দ্রাবিড়দের ভক্তি পূজা-উপাসনার মাধ্যমে স্থায়ী আসন পেতেছে আর্য সমাজে। তবে যতটা সহজভাবে

সংমিশ্রণের কথা বলা হচ্ছে ঠিক ততটা সহজে কেউই ধর্মীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান মেনে নেননি। *বামনপুরাণ*-এর একটি গল্পে এর আভাস পাওয়া যায়। সেখানে আছে, তপঃক্লিষ্ট মুনিদের আশ্রমে সুন্দর যুবক শিব নগ্নাবস্থায় প্রবেশ করলে মুনিপত্নীরা তাঁকে দেখে মোহিত হয়ে সভ্যতার সকল সীমা লঙ্ঘন করেন। পত্নীদের এই চাপল্য দেখে ক্রুদ্ধ মুনিরা শিবকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তবে শিবের প্রাণহানি করতে না পারলেও তাঁর (শিব) অঙ্গচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু হার হয় মুনিদেরই। কারণ পত্নীদের তাড়নায় শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্তিত হয়। বিরোধীতার পর সামঞ্জস্যের এই ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় যে, দ্রাবিড় জনজাতির যাঁরা উত্তর-ভারতে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে বৈবাহিক সূত্রে শিবকে অর্যজাতির অভেদ্য দুর্গে চোরাপথের সন্ধান দেন। দ্রাবিড় নারীদের হাত ধরে তাঁদের আরাধ্য দেবতা শিব আর্যসংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা পান।

দ্রাবিড় দুর্গে আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল খুবই ধীর গতিতে। আনুমানিক এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে দলে-দলে আর্যরা গঙ্গার তীর থেকে এসে কাবেরী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। আর্য-দ্রাবিড়দের সহাবস্থানজনিত সান্নিধ্য এবং বৈবাহিক-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে সমন্বয়ের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়। শিব এতটাই প্রভাবশালী দেবতা ছিলেন যে আর্যদের পক্ষে তাঁকে অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর হয়নি। ফল স্বরূপ আর্যদের দেবতা রুদ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিব আর্য সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন করে নেন। পরবর্তীকালে শিব বা রুদ্রের হাত ধরে অন্যান্য অনার্য দেবদেবীরা স্বীকৃতি পান। বাংলা মঙ্গলকাব্যের কথা চিন্তা করলেই এর সত্যতা যাচাই করা যাবে। মনসা, চণ্ডী, অন্নদা, কালী ইত্যাদি দেবীরা শিবের আত্মীয়তা-সূত্রে আর্যসমাজে নিজের নিজের জায়গা করে নেন।

দাক্ষিণাত্যে শিব ও বিষ্ণু ভেদে ভক্তিধর্মের দুই সম্প্রদায় নিজ নিজ দেবতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমন্বয়ের পথ খোঁজেন। যদিও অন্তর্দ্বন্দ্ব যে একেবারেই ছিল না তা বলা যাবে না। যজ্ঞসম্পাদক এবং একই সঙ্গে যজ্ঞভঙ্গকারী (দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ) শিবকে দেখা যায়। অর্থাৎ বৈপরীত্যের সমাবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি। আর্যরা প্রধান দেবতা রূপে শিবকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেননি ঠিকই, কিন্তু অগ্রাহ্যও করতে পারেননি। ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের এই নবভক্তি আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ

পরিগ্রহ করে এবং ভারতবর্ষের নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মতের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা বহন করে আনে। ভুললে চলবে না বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সম্প্রসারের কথা। আর্য-দ্রাবিড় জনজাতির ঐক্যবদ্ধ হবার যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তার একটি বড় কারণ রূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে।

মানুষের মন জয় করতে হলে সমাজের উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণির সহযোগিতাই আবশ্যক। সেই কারণে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জাতিভেদ মোচনের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। হিন্দুধর্মের মন্দিরকেন্দ্রিক ভক্তিসাধনার নিপাত ঘটিয়ে তাকে জনসমাজে ছড়িয়ে এবং শাস্ত্রের অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যমে প্রবল আত্মরক্ষার তাগিদ পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি আন্দোলন এই হৃদয়েবেগকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসের জোরে বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ভক্তিধর্মের প্রচার কখনোই সম্ভবপর ছিল না। আপামর জনসাধারণের মধ্যে সহজভাবে এবং দ্রুত ভক্তির আস্বাদ বিতরণ করতে জনপ্রিয় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এই বিশেষ কারণে তাঁরা কূটনীতি, রাজনীতি ও ছলনার আশ্রয়ে আকর্ষণ করার পরিবর্তে জনসাধারনের মধ্যে তাঁদের আবেগমূলক ভক্তি প্রচারের প্রধান বাহন রূপে সংগীতসাধনাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ড. হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

> ভক্তিধর্মের প্রভাবে সাঙ্গীতিক ভজন তথা কীর্তনের খুব বিকাশ হয়। ভক্তিধর্ম জনমুখী। সাধারণ লোকের মনে ইহার প্রতি আকর্ষণ প্রবল। সাধারণ্যে ভক্তি প্রচার ও সর্বসাধারণের ভক্তি সাধনার পক্ষে ভজন কীর্তন খুবই উপযোগী। ভজন একক সঙ্গীত, কিন্তু বহুলোকে এক জায়গায় বসিয়া গান শোনে। সম্মেলক কীর্তনে উপস্থিত সকলেই যোগ দিতে পারে। ফলে ভজন কীর্তনে এককালে অনেক লোকের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। এজন্যই ভক্তিধর্মের প্রচারকগণ সকলেই সাঙ্গীতিক সাধনার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।[২০]

সংগীত সহজবোধ্য, সর্ববরেণ্য প্রচারমাধ্যম। কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তমনকে সহজেই জয় করা যায়। কোনো বিশিষ্ট সিদ্ধ পুরুষকে পুরোভাগে রেখে, দলে দলে ভক্তেরা নৃত্যগীত সহযোগে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে দেশ পরিক্রমা আরম্ভ করে। মেঠো পথে, মন্দির-প্রাঙ্গণে দেবতার সামনে তারা মনের কথাকে গানের আকারে ব্যক্ত করে। পথে পথেই রচিত হয় সহস্র সংগীত।

সামগ্রিক বিশ্বাসে তৈরি হয় নতুন নতুন মন্দির। প্রাচীন কাল থেকেই মন্দিরগাত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্যের বহু চিত্র শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত হত। সেখানে নিয়মিতভাবে ভজন-কীর্তনের আসর বসত। এভাবে ভক্তি আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। ভক্তি এমন আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল যে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে দেবতার কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্তির সহজ পন্থা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

> ঈশ্বর বা দেবতার নামগান বা স্তুতিগান করার প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুব প্রাচীন। তবে নির্দিষ্ট নিয়মিত সাধন পদ্ধতি হিসাবে কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে হইয়াছিল।[২১]

কীর্তন সংরূপের বিকাশের সঙ্গে ভক্তিধর্মের যোগ সুনিবিড়। কীর্তন কথাটির পরিসর বৃহিৎ। তবে ভক্তির সঙ্গে কীর্তনের সংযোগ ঘটায় কীর্তনের স্বরূপ অনেকটাই সুনির্দিষ্ট হয়। পাশাপাশি নব নবতর মানদণ্ড কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়। সর্বভারতীয় স্তরে ভক্তি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করতে কেবল ভজন-কীর্তনই যথেষ্ট ছিল না। তাঁদের মতাদর্শকে তত্ত্বায়িত করে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন মতবাদের তত্ত্বগ্রন্থ এবং বিশেষ করে পদ্যসাহিত্যের দ্বারা এর স্থায়িত্বকরণ সম্ভব হয়েছিল। ভক্তি আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিসাহিত্যের চর্চা সহজ গতিতে এগিয়ে চলছিল। সর্বভারতীয় স্তরে ভক্তিসাহিত্যের বিপুল সম্ভার এই প্রচেষ্টার ফসল বললে অত্যুক্তি হবে না।

১:৩ সর্বভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের আসর

ভক্তি আন্দোলনের নিকষে ভক্তিসাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রবণতা ও বিষয়ানুসারে ভক্তিসাহিত্যে দু'টি প্রধান দিক দেখা যায়। একটি ধর্মীয় নিগূঢ় তত্ত্ব ও অপরটি পদ্যসাহিত্যের দিক, তবে তা একে অপরের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তত্ত্বের কাঠিন্য দূর করে সহজতর, ললিত ও সর্বজনগ্রাহ্য অস্তিত্ব প্রদানে পদসাহিত্যের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিবিধ সম্প্রদায়, যাঁরা নিজেদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে বৈষ্ণব ধর্মকে মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত করেছিলেন। ড. সুশীলকুমার দে প্রাচীন ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের চারটি প্রধান সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন—

> ...about the 12th century AD. We have four sampradayas or schools of thought, into which the Vaishnava movement divided itself. These are the well-known Sri Brahma, Rudra, and

Sanakadi sampradayas, associated respectively with the names of Ramanuja, Madhva, Visnusvamin (Vallacacarya) and Nimbarka.[২২]

এই চার ধরনের সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা লক্ষিত হয়। তবে ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে এই সম্প্রদায় এবং তাঁদের অধিকর্তাদের বড় ভূমিকা ছিল। ভক্তি আন্দোলন প্রচারে অসাম্যেরর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামানুযাচার্য, যমুনাচার্যের সময় থেকেই পুরাণগুলিকে প্রায় বেদের মর্যাদা দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। রামানুজের লেখার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে অস্বীকার করে রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য, মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদী, সবিশেষ, নির্মল-গুণযুক্ত, অশেষ শক্তিমানরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে দ্বৈতবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলেও এঁরা ভক্তিকে মুক্তির উপায় রূপেই বেছে নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

> এমনকি শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে রামানুজ-নিম্বার্ক-মাধ্বাচার্যেরা যে দ্বৈতবাদী মত প্রচার করলেন, তাঁরা বিষ্ণু-নারায়নের মতো ভাবধারী ভগবানের প্রতিষ্ঠা জাগিয়ে তুললেন বটে, কিন্তু মুক্তির ভাবনাটা তাঁদের মন থেকে গেল না। ভগবত-সাধনের পরম উপায় হিসেবে ভক্তিকেও তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তিকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে, ভক্তি তাঁদের কাছে সেবাবৃত্তির ভাবনায় রসায়িত হয়ে উঠল না কোনওদিন।[২৩]

ভক্তিকে মুক্তিলাভের উপায় রূপে দেখতে চৈতন্যদেবের আপত্তি ছিল। 'ভক্তি' শব্দটি প্রাচীন হলেও তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে চিরাচরিত মুক্তিলাভের ভাবপ্রসূত ঔপনিষদিক ভক্তিধর্মের মৌলিক পার্থক্য ঘটে। *ভাগবতপুরাণ* আসৃত ভাবধারা এই ভক্তিধর্মের প্রধান আশ্রয়। স্বার্থসিদ্ধি, যশ, শক্তি, অথবা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির সহায়ক হবে ভক্তি। তবে এই ভক্তির নাম সুগুণাভক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সুগুণাভক্তি শুদ্ধভক্তি রূপে জায়গা পায়নি। ভক্তি নিজে ভগবানের স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে তা সবসময়েই হবে শুদ্ধ বা গুণাতীত। তবে শুদ্ধভক্তি জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি মায়িক গুণের সংস্পর্শে এসে সুগুণাভক্তিতে আপাত সময়ের জন্য রূপান্তরিত হয়। সুতরাং গৌড়ীয় স্মার্ত পণ্ডিতেরা মুক্তি ও মোক্ষ লাভের প্রক্রিয়াকে ভক্তিধর্মের আলোকে স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করেছিলেন। সেক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ভক্তিধর্মের নির্যাস বঙ্গে খুঁজলে সম্পূর্ণ ভক্তির আস্বাদ মিলবে না।

তামিল ভক্তিসাহিত্যকে বাদ দিলে ষোড়শ শতাব্দী হল সমগ্র ভারতবর্ষের ভক্তিসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। মনে হয় যেন হিন্দী, বাঙালি, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কন্নড়ী, মলয়ালী কবিরা একসঙ্গে একই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র দেশকে ভক্তিরসে মজিয়ে রেখেছিলেন। সুরদাস-তুলসীদাস-বল্লভাচার্য, চৈতন্য-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস, পঞ্চসখা, শঙ্করদেব, ব্যাসরায়-পুরন্দর-কনকদাস, পোতানা-ক্ষেত্রয্য-নারায়ণতীর্থ, একনাথ-তুকারাম, এড়ুত্তচ্ছন্-পুন্তানম্, মীরা-নরসিংহ, ফরীদ-নানক-হুসৈন ইত্যাদি আচার্য-কবি-সাধকজনের বাণী-মাধুর্য ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীকে ভক্তির প্রাণ-রসে উজ্জ্বল করে রেখেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন রাধা। ভক্তিধর্মে রাধার উত্তরণ ঘটে লৌকিক নায়িকা থেকে শাস্ত্রীয় নায়িকায়। সুশীলকুমার দে'র মতে—

> The Radha legend, in all probability first originated in folk literature and slowly was it taken up in the fold of sophisticated literature.[২৪]

কৃষ্ণের আগে রাধার নাম উচ্চারিত হয় বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মে। তাই বৈষ্ণবদের 'কৃষ্ণ-রাধা' না বলে 'রাধে-কৃষ্ণ' বলতে শোনা যায়। যুগল মিলনের ধারণা একেশ্বরবাদী ধর্মের থেকে আলাদা। এতে মানব-মানবীর প্রেমবাঞ্ছা প্রতিষ্ঠা পায়। রাধা বিনে ভক্তি তথা বৈষ্ণবীয় সাহিত্য এমন রূপ-রসাবিষ্ট হয়ে উঠতে পারত কী না সন্দেহ। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষও বটে। সে যাই হোক ভক্তিসাহিত্যের সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা উদ্ঘাটনে আলোচ্য বিষয়কে সীমাবদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। তামিল, কন্নড়, তেলেগু, মালয়ালম, মারাঠী, গুজরাটী ও সর্বশেষে বাংলাভাষায় রচিত ভক্তিসাহিত্য সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে। ভক্তিসূত্রে কীর্তনকে উপলব্ধি করা যায় কী না তা পরখ করে নেওয়া জরুরি হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ভক্তি আন্দোলন ও সাহিত্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো কেবলমাত্র আলতোভাবে ছুঁয়ে যাওয়া হবে। কারণ এতে তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে বঙ্গে ভক্তিসাহিত্যের নিটোল বিবরণে এই কার্পণ্য করা হবে না বলে আশা করা যায়। সেই কারণে ভক্তিসাহিত্যের সর্বভারতীয় আসর আলোকিত হলে বাংলা কীর্তনের প্রেক্ষাপট বুঝতে সুবিধে হবে।

তামিল ভক্তিসাহিত্য (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

দাক্ষিণাত্যে ভক্তির সূচনা হয়েছিল। বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত, ভজনসাধন, অনুভব ও আচার অনুষ্ঠানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়। একটি রামানুজ রচিত *শ্রীভাষ্য* এবং অন্যটি আড়্বারদের (আলোয়ার) রচিত *নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম*। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আড়্বারদের সম্পর্কে বলেছেন— এঁরাও গোপীপ্রেম অবলম্বনে কৃষ্ণভক্তি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।[২৫] তামিলনাড়ু ও কেরলের আড়্বার সন্তগণ (আবির্ভাবকাল আনু মানিক ষষ্ঠ থেকে নবম শতক) মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থানে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নামগুণলীলা বিষয়ক গান গেয়ে উপাসনা করতেন। এই ছিল তাঁদের ভক্তি-সাধনা। চিন্ময় চ্যাটার্জী আলোয়ার বা আড়্বার সন্তদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

> Their attitude to God is intensely personal. They lay stress on love and pity of God for the sinful beings who adore Him, and they maintain the God grants man and abode of eternal bliss in conscious communion with Himself.[২৬]

পরপর বারোজন আড়্বার (শব্দের অর্থে ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন মহাপ্রেমী ভক্ত বোঝায়) আবির্ভূত হন। এঁরা *নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম*-এ তামিল ভাষায় চার হাজার চমৎকার ভাবশুদ্ধিময় ভজনসংগীত রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির সংকলক নাথমুনি বা রঙ্গনাথমুনি। যুগল মিলনের প্রাচীন ধারা এতে বিরাজমান। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে—

> ভক্তিতত্ত্বের প্রাচীনতা-সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখি যে, প্রাচীন পঞ্চ বা পঞ্চরাত্রসংহিতা ও পুরাণাদিতে উল্লিখিত ভক্তিতত্ত্ব এবং দক্ষিণ-ভারতের আড়্বার ও তামিলীয় সাধকগণের ভক্তিসঙ্গীতগুলি ভারতের পরবর্তী ভক্তিসাহিত্য ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমসাধনারীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত ও প্রেরণাদীপ্ত করেছিল।[২৭]

শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করতে যান তখন তিনি আড়্বারদের ভক্তিভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে আড়্বারদের ভাবনার ব্যাপক সাযুজ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অহেতুক ভক্তির উৎসরূপে তাঁদের রচনার প্রভাব যথেষ্ট বলেই মনে করা যায়। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রেয়সীর ভাবে মথিত ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় রচিত আড়্বার ভজনসংগীতগুলি ভক্তিবাদী সাধকদের মনোহরণ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে এঁদের প্রভাবে ভজন-সংগীতের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতায় অন্তরের ভক্তিভাব প্রদর্শনের ব্যাপক প্রসার হয়।

কন্নড় ভক্তিসাহিত্য (দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কর্ণাটকে ভক্তি আন্দোলনের প্রণেতা ছিলেন দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগুরু মাধ্বাচার্য। তাঁর শিষ্য নরহরিতীর্থ কন্নড় ভাষায় পদ রচনা করেছেন। তাঁর সমসাময়িক রুদ্রভট্ট *বিষ্ণুপুরাণ*-এর অনুবাদকল্পে *জগন্নাথ-বিজয়* নামক বৃহৎ কাব্য রচনা করেন। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কন্নড় ভাষায় যে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা প্রবাহিত হয় তার মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় দু'শো সাধক কবির। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীপাদরায়, পুরন্দরদাস, কনকদাস, শ্রীব্যাসরায়, বিজয়দাস, গোপালদাস এবং জগন্নাথদাস। এঁদের মধ্যে শ্রীপাদদাস ও পুরন্দরদাস কীর্তনের বিকাশসাধনে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন। বস্তুত, পুরন্দর দাসের আগে কর্ণাটকী ভজন-কীর্তনের বিকাশসাধনে শ্রীপাদ রায়ের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না বলেই মনে করা হয়।

তেলুগু ভক্তিসাহিত্য (দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের ইতিহাসে দ্বৈতবাদী নিম্বার্ক আচার্য (১১১৪-১১৬২ খ্রি.) এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যের (১৪৭৮-১৫৩০ খ্রি.) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। নিম্বার্কের সব রচনাই সংস্কৃতে রচিত। তেলেগু সাহিত্যের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাগবতকার বম্মের পোতন এবং পদকর্তা তাল্লপাক অন্নমাচার্য। পতনার *ভাগবত* তেলুগু জনসমাজে তুলসীদাসের *রামায়ণ*-এর মতই শ্রদ্ধেয়। অন্নমাচার্যের শৃঙ্গার রস বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ পদগ্রন্থ *শৃঙ্গার সংকীর্তনলু*-তে *ভ্রমরগীতি*-র (কালো ভ্রমরকে উপলক্ষ করে দূর প্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি বিরহিণী গোপীদের উক্তি) নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে এরূপ ভাবের পদ দুর্লক্ষ নয়। রাজসভার আনুকূল্যে রচিত বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল— কৃষ্ণদেব রায়ের *আমুক্তমাল্যদ*, নন্দি তিম্ময় রচিত *পারিজাতাপহরণম* এবং তেনালি রামকৃষ্ণের *পান্ডুরঙ্গ মাহাত্ম্যমু* । তেলুগু সাহিত্য রচনায় নারায়ণতীর্থের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে *গীতগোবিন্দম্*-এর আদর্শে পরিকল্পিত *কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী* (১৭শ শতাব্দী) গ্রন্থটি। তেলেগু ভক্তিসাহিত্যের বিদ্যাপতি রূপে পরিচিত ক্ষেত্রয্য। তাঁর শৃঙ্গার-রসাত্মক পদসংকলন গ্রন্থ *ক্ষেত্রয্য পদমুলু* নামে প্রসিদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঞ্জোর জেলার তিরুবারূর্ গ্রামে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন তিনজন ভক্তকবি। এঁরা হলেন— শ্যামাশাস্ত্রী (১৭৬২-১৮২৭ খ্রি.), মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর্ (১৭৭৬-১৮৩৫

খ্রি.) এবং ত্যাগরাজ। এঁরা একাধারে কবি ও সুরকার। তাঁদের 'ত্রিমূর্তির কীর্তন' (শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব) শ্রবণে দক্ষিণী ভক্তচিত্ত হয়ে উঠত রসাপ্লুত। ত্যাগরাজ ছিলেন এঁদের মধ্যমণি। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গেয়নাট্য *নৌকাচরিতম্,* যা বাংলাদেশের *নৌকাবিলাস* পালাকীর্তনের সমগোত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ পদসমূহ *কৃতি* নামে দাক্ষিণাত্যে পরিচিত।

কেরলীয় ভক্তিসাহিত্য (দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী)

তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর বিচিত্রকর্মা দুই কবির নাম পাওয়া যায়। একজন *চিলপ্পধিকারম্* (নূপুর কাব্য)-এর স্রষ্টা ইলঙ্গো অডিগল। অপরজন অগ্রণী বৈষ্ণব কবি কুলশেখর। তাঁর রচনা *মুকুন্দমাল্য* পরবর্তীকালের অন্যতম ভক্তিসাহিত্যের উৎস হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এই কবি সম্পর্কে বলেছেন—

> ৩১ টি স্তবক-বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানিতে মুকুন্দ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, কেশব, নারায়ণ, হরি প্রভৃতি নানা অভিধানে ভক্ত-কবি তঁহার আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করিয়াছেন।[২৮]

কেরলীয় ভক্তিসাহিত্যের মধ্যে কেরলের বাইরে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ভক্তিকাব্য লীলাশুক বিল্বমঙ্গল রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃতম্*। কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বইটির উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়। সেখানে আরও বলা হয়েছে স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে এই গ্রন্থ শ্রবণ করে চৈতন্যদেব আপ্লুত হতেন। *কৃষ্ণকর্ণামৃতম্*-এর সঙ্গে সমসাময়িক *গীতগোবিন্দ* এর মিল গভীর। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এই সাদৃশ্য দেখে বলেছেন— গীতসৌন্দর্য চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ও ছন্দের মনহারিতা উভয়-এ এক।[২৯] অর্থাৎ স্থানগত দূরত্বে ভাবনার একতা বিঘ্নিত হয়নি। পঞ্চদশ শতকের প্রসিদ্ধ কবি চিরুশ্‌শরির *কৃষ্ণপ্পাট্টু* বা *কৃষ্ণগাথা* (১৪৫৪ খ্রি.) গ্রন্থে সংস্কৃত, তামিল ও মলয়ালী— ত্রিধারার আদর্শ ও লোকরুচির সমন্বয় ঘটেছে। এছাড়া এডুত্তচ্ছেনের *এডুত্তচ্ছণ্ডে রত্নঙ্গল্*-এ ভক্তিসাহিত্যের ক্রমোন্নতি দেখা যায়। এডুত্তচ্ছেনের সমসাময়িক অপর এক শক্তিশালী ভক্ত কবি পূন্তনাম নম্বুতিরি (জন্ম ১৫৫৫ খ্রি.)। এঁদের প্রত্যেকের মিলিত প্রচেষ্টায় কেরলীয় ভক্তিসাহিত্য ফুলে ফলে ভরে উঠেছে।

মারাঠী ভক্তিসাহিত্য (ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী)

আলোয়ার প্রবর্তিত নামকীর্তনের জোয়ার মহারাষ্ট্রে এসে উপনীত হলে সেখানকার নাথপন্থী ধর্মসাধক জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব তাতে (নামসংকীর্তনের দ্বারা) প্রভাবিত হন। তিনি পঁঢরপুরের বিট্‌ঠল বা বিঠোবার মধ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ করেন। উচ্চ-নীচ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মারাঠী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 'বারকারী' সম্প্রদায়। জ্ঞানেশ্বর খ্যাতিলাভ করেন বৈষ্ণব অদ্বৈতভক্তির গ্রন্থ *অমৃতানুভব*-এর রচয়িতারূপে। জ্ঞানেশ্বর থেকে আরম্ভ করে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এই ভক্তি-আন্দোলন। সন্ত-পরম্পরায় সপ্তদশ শতকের তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০ খ্রি.) ও রামদাস (১৬০৮-১৬৮১ খ্রি.) পর্যন্ত তা সচল থাকে।

নামদেবের রচনায় চতুর্দশ শতকে নাথধর্ম ও ভক্তি যুগ্মভাবে হিন্দী-ভক্তিসাহিত্যে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কবীরদাস, সুন্দরদাস, রজ্জব, দাদু, বৈদাস প্রমুখ সন্ত-কবিরা সকলেই যেভাবে শ্রদ্ধাভরে নামদেবকে স্মরণ করেছেন তা থেকেও হিন্দী সন্তসাহিত্য তথা ভক্তিসাহিত্যে নামদেবের প্রভাব বোঝা যায়। নামদেবের পর মারাঠী সাহিত্যের নামজাদা কবি হলেন একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯ খ্রি.)। তাঁর *অভঙ্গ-গাথা* এবং *ভাগবত-পুরাণের* একাদশ স্কন্ধের পদ্যাত্মক টীকা রচনার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মহারাষ্ট্রের ছোটো-বড় অনেক কবিই *অভঙ্গ* রচনা করলেও *অভঙ্গ* বলতে সাধারণত তুকারামের *অভঙ্গ*-ই বোঝায়। তুকারাম রচিত পাঁচহাজার পদাবলী তাঁর কাব্যোৎকর্ষের পরিচায়ক। তুকারামের পরে শক্তিশালী কবি হিসেবে পাওয়া যায় ভক্তকবি রামদাসকে। রামদাসের ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে *করুনাষ্টকেঁ, মনাচে শ্লোক* এবং *জনস্বভাবগোসাঁবী* –এই তিনটি গ্রন্থ বিশেষ পরিচিতি পায়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা *দাসবোধ*।

গুজরাতি ভক্তিসাহিত্য (পঞ্চশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

জৈন ধর্ম প্রভাবিত গুজরাটে ভক্তিধর্মের জোয়ার এসে অনেকটাই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থেকে ভক্তিসাহিত্যের মুক্তি ঘটাতে পেরেছিলেন গুজরাতি সাহিত্যের আদিকবি নরসিংহ মহেতা (১৫০০-১৫৮০ খ্রি.)। কবির রচিত পদের সংখ্যা প্রায় ১৩৫৫টি। দানলীলার বিভিন্ন পদ এবং *সুরতসংগ্রাম, রাসসহস্রপদী, বসন্তনাঁ পদো, হিন্ডেলনা পদো* প্রভৃতি পদসংকলিত গ্রন্থের

বিভিন্ন পদে তিনি যে গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

গুজরাতি ভক্তিসাহিত্যের প্রথম যুগে নরসিংহ মহেতার সঙ্গে অপর যে ভক্তকবির নাম সমসুরে উচ্চারিত হয়, যাঁর জীবনকাহিনি সমগ্র ভারতে ভক্তির নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে, তিনি আর কেউ নন; সকলের পরিচিত মীরাবাঈ (আনুমানিক ১৫০০-১৫৪৭ খ্রি.)। মীরা শুদ্ধ ব্রজভাষা, রাজস্থানী মিশ্র ব্রজভাষা, গুজরাতি এবং হিন্দী —এই চার ভাষাতেই পদ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভজনের সঙ্গে মীরাবাঈ নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গুজরাতি সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যকাল 'নরসী-মীরা'র যুগ বলে অভিহিত। নরসিংহ মহেতা ও মীরাবাঈয়ের পর দু'জন বিশিষ্ট পদকর্তার নাম পাওয়া যায়— প্রেমানন্দ (১৬৩৬-১৭৩৪ খ্রি.) ও দয়ারাম (১৭৬৭-১৮৬২ খ্রি.)। প্রেমানন্দ *ওখাহরণ, অভিমন্যু আখ্যান, নলাখ্যান* প্রভৃতি ছোটো-বড় কাব্যকাহিনির মধ্য দিয়ে ভক্তিরসের যোগান দিয়েছিলেন। গুজরাতি ছাড়াও হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, উর্দু এমনকি সংস্কৃতেও দয়ারামের রচনা আছে। ভক্তিসাহিত্যের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর *গরবী সংগ্রহ*। গরবা-নৃত্যের সহযোগী এই গীতধারা লোকসংগীত রূপে বহুকাল থেকে গুজরাটে প্রচলিত রয়েছে এবং আজও এর জনপ্রিয়তায় সামান্যতম ভাঁটা পরেনি।

পাঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য (পঞ্চশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী)

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট শিখধর্মের মূলে রয়েছে সুফি ধর্মের প্রভাব। সুফি ধর্মের প্রধান উপায় ছিল গান ও কবিতা। কবিরদাস, ইব্রাহিম ফরিদের (সুফি সাধক) মতো বিশুদ্ধ সুফি সাধক না হলেও কবিরপন্থী রচনায় দক্ষিনের বৈষ্ণবধর্ম ও পূর্বাঞ্চলের নাথ ধর্মের সঙ্গে পশ্চিমের সুফি ধর্মেরও সমাবেশ ঘটেছিল। শিখদের *গ্রন্থসাহেব*-এর বিভিন্ন পদ ভক্তিধর্মের উৎকৃষ্ট পদ রূপে পরিচিত। বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় এই সব পদগুলি রচিত না হলেও ভাবের দিক দিয়ে তা বৈষ্ণব দর্শনেরই সমকক্ষ। কবীর, গুরুনানক ও অন্যান্য গুরুদের বিভিন্ন পদসঞ্চয়নের পদগুলি আজও বিভিন্ন ধর্মীয় বিধিতে গীত হয়।

উক্ত সকল অঞ্চলে ভক্তিসাহিত্যের সম্ভার দেখে বিশেষ কতগুলি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের ভক্তি আন্দোলন ও ভক্তিসাহিত্যের সম্প্রসারণে সর্বভারতীয় উন্মাদনা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। ভক্তিআন্দোলনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল ভজন-কীর্তন। কোথাও কোথাও সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের প্রচলনও দেখা গেছে। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ ভক্তিরস আকণ্ঠ পান করেছিল ভজন-কীর্তনের মতো একটি সহজ ও সাবলীল মাধ্যমের দ্বারা। এই মাধ্যমটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে সেই সময়ের শক্তিশালী কবি প্রতিভারা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তিসাহিত্য যে শুধুমাত্র পাঠের জন্য রচিত হত না তা পরবর্তী অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে আপাতত এটুকু বলে নাওয়া যেতে পারে যে ভক্তিসাহিত্য উপস্থাপন করার মধ্যেই নিহিত ছিল এর সার্থকতা এবং তা ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে করা হত।

১:৪ বঙ্গে ভক্তিআন্দোলন ও ভক্তিসাহিত্য

বঙ্গদেশে ভক্তিআন্দোলনের প্রবর্তক রূপে শ্রীচৈতন্যকে ধরা হয়। তবে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা চৈতন্যপূর্ব ঘটনা। ভক্তিধর্মের প্রচারও চৈতন্যদেবের জন্ম পর্যন্ত থেমে থাকেনি। বরং বলা যায়, তাঁর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে ভক্তি আন্দোলন তথা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের বেগ তরান্বিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বৈষ্ণব-ভক্তির নবপর্যায় শুরু হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ভক্তিভাব তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। প্রচলিত ভক্তির ধারণা ও স্বরূপের আমূল পরিবর্তন সাধনে তাঁর অবদান অসামান্য। মহাপ্রভু ছাড়াও তাঁকে পরিবেষ্টন করে থাকা ব্যক্তিত্বের ভূমিকাও কম ছিল না। অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> চৈতন্য মহাপ্রভুর সরসা ভক্তির মূলে আছেন এই মাধবেন্দ্র পুরী— যাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেদগ্রন্থ বলেছে— তিনি চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি সূত্রধার—ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর। চার সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনের সম্পর্কহীন এই রসময়ী ভক্তি মাধবেন্দ্রপুরীই বা কোথা থেকে পেলেন? পণ্ডিতেরা বলেছেন—দক্ষিণ ভারতের আলবার-সাধকেরা এই ভাবের ভাবুক। তাঁদের রসময়ী ভক্তির পরম্পরার সঙ্গে ভাগবত পুরাণ এবং লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত-এর মধুর ভক্তিরস মাধবেন্দ্র পুরী বয়ে এনেছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে।[৩০]

রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্বাচার্য এবং বল্লভাচার্য শঙ্করাচার্যের দার্শনিক দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। তবে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা এঁদের সঙ্গে মেলে না তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন ঈশ্বর পুরী এবং অদ্বৈত আচার্যের গুরুদেব। পরবর্তীকালে ঈশ্বর

পুরীর কাছে চৈতন্যদেব দীক্ষা নিয়েছিলেন। অদ্বৈত আচার্য সর্বদা চৈতন্যের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তির ধারণা গুরুপরম্পরায় পেয়েছেন চৈতন্যদেব। তাঁর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণাভিলাসের অন্তরালে ছিল ভক্তির উৎস সন্ধানের প্রবল ইচ্ছা। আড়্বারদের ভক্তির স্বরূপ চৈতন্যদেবকে ভীষণভাবে আকর্ষিত করেছিল। বাংলায় প্রচারিত সরস অহেতুক ভক্তিধর্মের অন্তরালে দাক্ষিণাত্যের ভক্তির প্রভাব ছিল অসামান্য। চৈতন্যদেব স্বয়ং 'অহৈতুকী ভক্তি' সম্পর্কে তাঁর *শিক্ষাষ্টক*-এ লিখে গেছেন। *শিক্ষাষ্টক*-এর চতুর্থ শ্লোক এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশঃ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।[৩১]

অর্থাৎ প্রভু আমি ধনসম্পদ, অনুগামী লোকজন, সুন্দরী নারী, মুক্তি —এসব কিছুই চাই না। জন্মে জন্মে তোমার অহৈতুকী প্রেম-সেবা আমার একমাত্র প্রার্থনা। ভক্তিধর্মের এই উদ্দেশ্য একেবারে নতুন না হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী যাগ-যজ্ঞে আত্মতুষ্টির সংকীর্ণতা থেকে বৈষ্ণবধর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছিল।

আজকের পরিচিত বাংলার আয়তন প্রাচীন বঙ্গের তুলোনায় ক্ষুদ্র দেখায়। একসময় বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ), বিহার, উড়িষ্যা, আসামের অনেকাংশ বৃহৎ বঙ্গের অংশ ছিল। বঙ্গে শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজ-রাজরাদের বিশ্বাসে কখনো ভক্তি আন্দোলন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং প্রখর জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সরস ভক্তিভাবের পরস বঙ্গবাসীর মানসপটে অভিনব স্পন্দন সঞ্চার করেছিল। সর্বভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গের অবস্থান যে কতটা স্বতন্ত্র ছিল তা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়—

> আচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব, বল্লভাচার্য কিংবা দক্ষিণ-ভারতে আল্‌বার বা আলোয়ার-সম্প্রদায়-প্রচারিত ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম বাঙলার জনগণের মনে ততো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হলেও শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদীয়ভক্তিসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন পঞ্চরাত্রসংহিতা ও পুরাণসাহিত্য-প্রতিপাদিত ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তিধর্ম বাঙালীর সচল ও রসসিক্ত মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।[৩২]

গুপ্তরাজারা শৈবভক্তিতে নিয়োজিত ছিলেন ঠিকই কিন্তু সাধারণ সমাজে বিষ্ণু-উপাসনার অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠাই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছিল। শৈব-ভক্তির তুলনায় বৈষ্ণব-ভক্তি বেশি

সমৃদ্ধশালী হয়। কীর্তন ছিল ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম। সেক্ষেত্রে কীর্তনের ঐতিহ্য ভক্তির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ভক্তি প্রকাশের সঙ্গে ভজন-কীর্তনের নিবিড় যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রাচীনবঙ্গে বৈষ্ণব-ভক্তি বিশেষত কৃষ্ণকথার আলোকে কীর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে আলোচনা ব্যাপৃত থাকবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কীর্তন ছিল ধর্মীয় যাপনের অঙ্গ। ঈশ্বরের কীর্তন কেবলমাত্র বিশেষ তিথিনক্ষত্র দেখে করা হত না। পালা বা অনুষ্ঠান করে আজকে যেভাবে আমরা আসরে কীর্তন উপস্থাপিত হতে দেখি ঠিক সেইভাবে কীর্তনের বিচার করলে চলবে না। আদিকালে এর স্বরূপ ভিন্ন ছিল। আদিকাল বা মধ্যযুগের পদ, কবিতা, কাব্যগ্রন্থ প্রায় সকলই গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হত। বৈষ্ণব পদাবলীর সমৃদ্ধ পদসমূহের সার্থকতা শুধুমাত্র পাঠে নয়, কীর্তনের দ্বারা নিরূপিত হত। এই বক্তব্যের সমর্থনে ড. সত্য গিরির মত হল—

> আধুনিক কালে মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে আমরা প্রায় কেবল পাঠ্য-সাহিত্যের পর্যায়েই গণ্য করে থাকি। কিন্তু কীর্তনের এই আলোচনাই প্রমাণ করে যে, এতে বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। কীর্তন গানে একদিকে অবধারিত ভাবে গড়ে তোলা হত ভক্তির আবহ, অন্যদিকে এতে যুক্ত হত সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্চতর কলাকৌশল। এই বহুমাত্রিকতা কীর্তন গানের আসরে নিছক সাহিত্য-পিপাসু ব্যক্তির মনেও বৈষ্ণব পদাবলী যে বিশেষ রসাবেদন সৃষ্টি করতে পারে, কেবলমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠে তা ঘটা সম্ভব নয়।[৩৩]

কেবলমাত্র গানই নয়, পদাবলীতে যে নৃত্যের ভূমিকা অসামান্য ছিল তা স্পষ্ট। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধুয়ার ব্যবহার পদাবলীর গীত হওয়াকেই সমর্থন করে। পদাবলী ও কাব্যের গীত হওয়ার সমর্থন অনেক সাহিত্য সমালোচকই সমর্থন করেছেন।

সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-এ গীতিকবিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র ও পূর্ব-ভারতের জয়দেবের কথা বলেছেন। এখানে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ্য—

> ক্ষেমেন্দ্রের লেখা একটিমাত্র গান পাওয়া গিয়াছে। জয়দেব একটি গোটা গীতিনাট্যই লিখিয়াছিলেন। দুজনেরই রচনার বিষয় কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা। ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে অপভ্রংশে (এবং সংস্কৃতেও) কৃষ্ণলীলা-গান লোক-ব্যবহারে দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত ছিল।[৩৪]

ছাপাখানার সুবাদে আজ খুব সহজেই কবিতা পাঠ করে রসাস্বাদন করা যায়। পাঠকগোষ্ঠীর অভাব নেই। পড়তে জানা মনোজ্ঞ পাঠকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কিন্তু এমন একটা সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে যেখানে নিরক্ষর মানুষের কাছে ভক্তিভাব ছড়িয়ে দিতে স্মৃতিই ভরসা, গানই যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম। তাই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজের বাইরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ভক্তিধর্মের

প্রসার একেবারেই সম্ভব ছিল না। একারণে গীত-নৃত্য-বাদ্য সহযোগে ধর্মগ্রন্থ, পদাবলী, কাব্য (দৃশ্যকাব্য) ইত্যাদির উপস্থাপন প্রচলিত ছিল। মনে রাখতে হবে সর্বজনবোধ্য উপায় রূপে ভক্তিতত্ত্বের কাঠিন্য দূর হয় কীর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়ার মতটি উল্লেখ্য—

> খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লেখায় পাওয়া যায়— মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নূপুরের সঙ্গে চামর দুলিয়ে একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে সমস্ত কাব্য-কবিতা গীত হত।[৩৫]

কেবল গানই নয় তার সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যের প্রচলন যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মূর্তিতে, মন্দিরগাত্রে অথবা মাটির ফলকে খোদাই করা লাস্যময় নৃত্য-বাদ্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে এবং সর্বোপরি প্রমাণ রয়েছে সাহিত্যে। বাংলায় চৈতন্যদেবই প্রথম ঘর থেকে কীর্তনকে পথে-প্রান্তরে নিয়ে এসেছিলেন। মহাপ্রভুকে বাদ দিয়ে কীর্তনের আলোচনা হতেই পারে না। তাঁর আবির্ভাব কালকে বিভাজিকা রূপে ধরে কৃষ্ণকথার বিবরণ অনেকটাই সুবিধাজনক হবে। প্রাক্-চৈতন্য, চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-পরবর্তী কালের কৃষ্ণভক্তি তথা কীর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে কীর্তনের ইতিহাসের এক অভিনব পাঠের চেষ্টা করা হবে।

ক। প্রাক্-চৈতন্য যুগ

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় স্থাপত্য-ভাস্কর্যে, লিপিলিখনে ও সাহিত্যে। এক্ষেত্রে ড. সুকুমার সেনের মতটি উল্লেখ্য—

> খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর দিকে এদেশে বৈষ্ণবভাবনা চলিত ছিল কি না তা জানবার কোনো উপায় নেই। তবে মনে হয় বিষ্ণুর উপাসনা উচ্চতর সমাজে অজানা ছিল না।[৩৬]

মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণের তুলনায় বিষ্ণুর প্রসঙ্গ প্রাচীনতর। এক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভালো নামে বৈষ্ণবধর্ম হলেও তা আদতে কৃষ্ণের উপাসনা, কৃষ্ণকথার রূপভেদ মাত্র। এতে তিনটি কাল্পনিক স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশাবতার বলে পরিগণিত হন। তৃতীয় স্তরে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগন। অন্যেরা তাঁর অংশমাত্র। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তা একপ্রকার প্রতিষ্ঠিত মত।

স্থাপত্যে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ

আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলার কাহিনি বঙ্গদেশে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। শিল্প ও কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার পাহাড়পুড় (অষ্টম শতকীয়) মন্দিরে ২২নং স্থাপত্যে যে মিথুনমূর্তি অঙ্কিত রয়েছে, তাতে কৃষ্ণের পাশে নারীমূর্তি খোদিত রয়েছে। নারীমূর্তিটি যে গোপীর তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে তা যে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারই মূর্তি তা নিয়ে গবেষকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও ড. সত্যবতী গিরি *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে মূর্তিটি রাধার বলেই চিহ্নিত করেছেন।[৩৭] অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

> কৃষ্ণ ও গোপীর যুগলমূর্তি পাওয়া গিয়াছে অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুড় মন্দিরের (রাজসাহী জেলা, বাংলাদেশ) গাত্রালঙ্কারে। ডিহরের ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের (১০-১১ শতক) দেওয়ালে বংশীবাদনরত কৃষ্ণের মূর্তি খোদাই করা আছে।[৩৮]

ভক্তিধর্মের ইতিহাস উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্প কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। মনে রাখতে হবে, যুগলমূর্তি আরাধনা এবং এককভাবে কৃষ্ণভক্তির মধ্যে পার্থক্য ছিল। একক ও যুগলমূর্তি আরাধনার ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। বিশ্বাস এবং সাধনার পথ অতিক্রম করে তবেই স্থাপত্যরূপে স্থান পেয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি।

গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় কমবেশি বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয়। নৃত্যগীতের প্রতি সব রাজবংশেরই বিশেষ সমাদর ছিল। এমনকি দেশি গান ও আঞ্চলিক নৃত্যের প্রচলনের কথাও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মত হল—

> তাছাড়া বাঙলার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের আমলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট গান ও নৃত্যের পাশাপাশি দেশিগান এবং আঞ্চলিক নৃত্যেরও প্রচলন ছিল এবং গুপ্ত, পাল ও সেন রাজারা সে-সকল গান ও নৃত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩৯]

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন বাংলার বুকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির মহাপ্লাবনে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমেই ক্ষীণকায় হয়ে উঠছিল। একারণেই হয়তো এই সময় কৃষ্ণকথাকে সমাজের মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়রূপে বিকাশলাভ করতে দেখা যায় না। তবে একথাও সত্য পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একেবারে বিমুখ ছিলেন না। অন্তত পরবর্তী তুর্কি আক্রমণের (১২০২ খ্রি.) ফলে বাংলার ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল সেই তুলনায় পালযুগে

বৈষ্ণবধর্মকে সেভাবে কোণঠাসা হতে দেখা যায় না। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচিত হবে। পাল যুগের খলিমপুর লিপিতে ধর্মপালদেবের নন্দদুলাল মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] এযুগে যত দেবমূর্তি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি। বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণুর আরাধনায় কখনোই অনুৎসাহী ছিল না বাংলার মানুষ। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মূর্তিগুলি সংরক্ষণ করার মানসিকতা পরবর্তী প্রজন্ম হারায়নি। সুতরাং বিষ্ণুভক্তির জনপ্রিয়তা পরবর্তীকালে সমপরিমাণে বজায় ছিল বলেই মনে করা যায়।

সেনবংশের রাজত্বকালকে বৈষ্ণব ধর্মের 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। বৈষ্ণবধর্ম দু'ভাবে সমৃদ্ধ হয়— বিষ্ণুর দশাবতার রূপ ও কৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিকাশে। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন রাজসাহী শহরের অদূরে দেওপাড়া (দেবপাড়া) নামক গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন। প্রদ্যুম্নেশ্বর বিষ্ণুরই অপর নাম। ড. সত্যবতী গিরি প্রদ্যুম্নেশ্বর নামটি কৃষ্ণ-বিষ্ণুর অভিন্নতার প্রত্যক্ষ পরিচয়বাহী বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৪১] তাছাড়া লক্ষণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণবভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক। পাল ও সেনযুগে বাংলাদেশে নানা স্থানে বহু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেলেও সেনযুগে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকৃষ্ণ প্রেমলীলাই ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। এযুগের সাহিত্যই তার প্রমাণ।

লিপিলিখনে কৃষ্ণকথা

চৈতন্য-পূর্ব সময়ে লিপি লিখনেও বাংলায় কৃষ্ণ-বন্দনার কথা পাওয়া যায়। যদিও বিষ্ণু প্রসঙ্গ লিপির অনেক আগেই পাওয়া গিয়েছে। অশোকের রাজত্বকালের সমসাময়িক সময়ের (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে) বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় রচিত *মহাস্থানচক্র লিপি*[৪২] বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনতম প্রত্ন নিদর্শন। ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে পাওয়া ভোজবর্মার *বেলাভ লিপি* জয়দেব ও চণ্ডীদাসের অগ্রপথিক। ড. সত্যবতী গিরি প্রদত্ত গোপী সমাবেশে থাকা কৃষ্ণের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক লিপিটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ।
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ।
প্রাদুর্ভূবোদ্ধতভূমিভারঃ।।[৪৩]

লিপিলিখন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে সপ্তম শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ভক্তির মৃদুমন্দ বাতাস দক্ষিণ থেকে প্রবাহিত হয়ে বাঙালির মানসপটে শীতলতার অনুভূতি প্রদান করেছিল। বিষ্ণু-কৃষ্ণের একীভূত হওয়া ও ক্রমেই কৃষ্ণভক্তির তুলনামূলক জনপ্রিয়তা (বিষ্ণুভক্তির নিরিখে) সাহিত্য অঙ্গনকেও ফুলে ফলে ভরিয়ে তুলেছিল।

সাহিত্যে কৃষ্ণকথা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীনযুগের সাহিত্য *চর্যাপদ* (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) গ্রন্থ দিয়েই শুরু। এর পূর্বে রচিত সাহিত্য সৃষ্টির প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তুর্কী আক্রমণে বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য এক সংকটাপন্ন মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। আগ্রাসী মুসলমান শাসনে মঠ, মন্দির ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা অনেক পুঁথিই এই সময়ে বিনষ্ট হয়। অনেক পুঁথি সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কালের আবর্তে বিলীন হয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালি তাদের শিরদাঁড়া শক্ত করে ঘুরে দাঁড়াবার পথ দেখে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে। চৈতন্যদেবকে ঘিরে কৃষ্ণকথার প্লাবন ঘটে। ভক্তিসাহিত্য বিকশিত হয় শ্রীচৈতন্যের নির্দেশিত ভক্তিধর্মের ছত্রছায়াতলে। প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণকথাকে খুঁজে পেতে হলে বাংলা ভাষার বাইরেও পদার্পণ করতে হবে। প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কৃষ্ণকথামূলক আখ্যান চৈতন্য-পূর্ব ভক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের বর্ণনায় সাহায্য করবে। এইসব ভক্তিগ্রন্থ প্রাণের স্পর্শে উষ্ণ।

প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সাহিত্যে কৃষ্ণকথা

গাথাসপ্তশতী (চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক) ও *প্রাকৃত পৈঙ্গল* (চতুর্দশ শতক) প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। গ্রন্থ দু'টিতে সাধারণ জীবনের বিচিত্র পর্ব রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীলীলার প্রসঙ্গ আছে। প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকীর্ণ প্রাকৃত কবিতার সবচেয়ে প্রাচীন সংগ্রহ *গাথাসপ্তশতী* (প্রাকৃত *গাহাসত্তসঈ*)। এই গ্রন্থে রেবা, পহঈ, রোহা, অনুলচ্ছী, মাহবী প্রভৃতি নারীদের কবিতাও পাওয়া যায়।[৪৪] *গাথাসপ্তশতী* উত্তরকালীন কৃষ্ণলীলাকথার বিভিন্ন উপাদান যেমন বাৎসল্য ও মধুর রসাসৃত শ্লোক এবং নায়িকা-প্রেমের বিচিত্র স্তরের স্বরূপ

প্রকাশ করেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির অধিকাংশই স্থুল আদিরসের মেয়েলিয়ানার কবিতা।[৪৫]

খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর দিকে সংকলিত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত ছন্দনিবদ্ধ *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* গ্রন্থে নানা বিষয়ক কবিতা ও গান পাওয়া যায়। ড. সত্যবতী গিরির মতে *প্রাকৃত-পৈঙ্গল* –এ প্রথম নৌকালীলার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।[৪৬] নৌকালীলার কবিতাটি উল্লেখ্য—

আরে রে বাহিহি কাহ্ন ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুঁই এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি।।[৪৭]

অর্থাৎ ওহে কৃষ্ণ তুমি নৌকা বাও। নৌকা দোলানো (ডগমগ করা) ছেড়ে দাও, কষ্ট দিও না। আগে তুমি নদী পার করে দাও, পরে যা চাও তাই নিও।

রাধা *প্রাকৃত-পৈঙ্গল*-এ দেবমহিমায় ভূষিতা। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা, মহামায়া প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে রাই অর্থাৎ রাধিকার উল্লেখ রয়েছে—

লচ্ছী রিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্জা কখমা অ দেই।
গৌরী রাঈ চুন্না ছাআ কান্তী মহামাঈ।।[৪৮]

গ্রন্থটি *গাথাসপ্তশতী*-র অনেক পরের রচনা। অনুমান করা যায় ততদিনে রাধার দেবত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বিকাশে সহায়তা করেছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে কৃষ্ণকথা

বঙ্গদেশে পঠিত অর্বাচীন সংস্কৃত শ্লোকসংকলন *সুভাষিতরত্নকোষ* বা *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* (দ্বাদশ শতাব্দী) ও *সদুক্তিকর্ণামৃত* (ত্রয়োদশ শতাব্দী)। এই গ্রন্থ দু'টিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হল কারণ দু'টি গ্রন্থই বাংলার সংকলন। *সুভাষিতরত্নকোষ*-এর *হরিব্রজ্যা*-য় রয়েছে মোট চুয়াল্লিশটি শ্লোক। তার মধ্যে বারোটিই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। শ্লোকগুলিতে রাসলীলা ছাড়াও কৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান প্রধান ঘটনা কাব্যরূপ লাভ করেছে। গোপনে মিলনকামনায় কৃষ্ণ রাধার গৃহদ্বারে এসেছেন। গোপী তাঁকে আমল না দিয়ে উপহাসমূলক জেরা শুরু করেছেন। জেরায় কৃষ্ণের একেবারে নাকাল অবস্থা। ষোড়ষ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ভাবের পদাবলী বিস্তর রয়েছে। *সুভাষিতরত্নকোষ*-এ এই কথোপকথনমূলক নাট্যরসপূর্ণ ভাবের উৎস পাওয়া যায়। শ্লোকটি উল্লেখ্য—

> কোহয়ং দ্বারে হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
> কৃষ্ণোহহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
> মুগ্ধেহহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাং
> ইথং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ।।[৪৯]

অর্থাৎ রাধা জিজ্ঞাসা করছেন, দ্বারে কে রয়েছো? উপবনে যাও। বানরের এখানে কী প্রয়োজন? উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন, প্রিয়ে আমি কৃষ্ণ। বড় ভয় করছে। বানর কি কখনো কালো হয়? ভেতর থেকে রাধার উত্তর আসে "বোকা মেয়ে আমি মধুসূদন"। যাও ফুল ফুটেছে যে লতায়। —এইভাবে প্রিয়ার কাছে বাক্যহারা হয়ে লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন। একেবারে রক্তমাংসের মানবিক কৃষ্ণ যাঁকে স্বভাবগুণে তিরস্কৃত হতে হচ্ছে। *সুভাষিতরত্নকোষ*-গ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, উত্তরগোষ্ঠ, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি ঘটনার বিবরণে যে বেণুবাদনরত, ধূলা-মলিন, ম্লান বনমলীর (কৃষ্ণ) পরিচয় পাওয়া যায় তা বৈষ্ণব পদাবলীতে দুর্লভ নয়।

ভক্তিসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ করে কৃষ্ণকাহিনির হদিশ পাওয়া যায় *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে। সংকলনগ্রন্থটির শ্লোক পাঁচটি প্রবাহে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম *অমরপ্রবাহ*-এ দেবদেবী সম্বন্ধীয় পদ রয়েছে। একটি বড় অংশ জুড়ে কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবনলীলার পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে জননী যশোদার বাৎসল্যে পরিপূর্ণ পদ জনপ্রিয় ছিল। সেন রাজসভার কবিদের পদও এতে রয়েছে। পদগুলিতে আদিরসের প্রাধান্য লক্ষ করার মতো। রাজসভার রুচিকে তুষ্ট করতেই লৌকিক আখ্যানের পাশাপাশি শিবকাহিনি ও কৃষ্ণকাহিনিতে শৃঙ্গার আশ্রয় করেছে বলে মনে হয়।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ফলে রাজধর্মের প্রভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। সেন বংশের রাজত্বকালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সেন বংশের প্রথমদিকের রাজারা শৈব ছিলেন। তবে লক্ষ্ণণসেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকে দেবতা রূপে সামনে রেখে সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ তাঁদের হারানো মাটি ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এরূপ অনুকূল পরিবেশে কৃষ্ণকথা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। প্রজাদের মনকে তুষ্ট রাখতে

রাজাদের ধর্মান্তর বা আরাধ্য দেবতার বদল ঘটানো অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আরাধ্য দেবতা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। বাংলার মাটিতে দীর্ঘদিন বদ্ধমূল বৌদ্ধধর্মকে কৃষ্ণ একরকম আত্মসাৎ করেছেন বলা যায়। এ যুগের উচ্চ থেকে নিম্ন জাতি, হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত বাঙালির ধর্মীয় চেতনা কৃষ্ণতেই সমাবিষ্ট হয়েছিল। বাদ থাকেননি রাজসভার কবিগণ, এমনকি সেন রাজা নিজেও কাব্যসাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তার কবিসত্ত্বার প্রমাণ রয়েছে *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে। রাজসভার কবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* (দ্বাদশ শতাব্দী) কৃষ্ণভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা রূপে চিহ্নিত। জয়দেব চৈতন্য-পূর্ব ভক্তিসাহিত্যের ধারায় প্রখর সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তবে ভুললে চলবে না রাজসভার অন্যান্য চন্দ্র-তারকাদের কথা। তাঁরা জয়দেবের তেজে ম্লান মনে হলেও নিজস্ব কবিত্বের মহিমায় ছিলেন ভাস্বর। উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী এমনকি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর পুত্র কেশবসেন কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোক ও পদ রচনায় অমৃতের আস্বাদ প্রদানে বৈষ্ণব পদাবলীকে চিরন্তন রূপ দিতে সাহায্য করেছেন।

জয়দেব ও *গীতগোবিন্দ*

স্মার্তগোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষ যে সব ভক্তিগ্রন্থের মাধ্যমে চৈতন্যপূর্ব কৃষ্ণকথা আস্বাদন করেন *গীতগোবিন্দ* (দ্বাদশ শতাব্দী) সেই তালিকায় শ্রেষ্ঠতমের আসনে বিরাজমান। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় কবি জয়দেব সেকালের লৌকিক কৃষ্ণকথামূলক গীতিকবিতাকে দেবভাষায় অভিনবরূপে সাজিয়ে অমর গাথায় পরিণত করেছেন। আস্বাদ্যমানতার জায়গা থেকে গীতগোবিন্দ-এর প্রতি চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, সুশীলকুমার দে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ শক্তিমান কবি ও সমালোচকবৃন্দ সকলেই আকৃষ্ট হয়েছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিজেও *গীতগোবিন্দ* আস্বাদন করে পরম তৃপ্ত হতেন। এই বিবরণ পাওয়া যায় *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীত
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।[৫০]

গীতগোবিন্দ ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম গৃহে বা প্রাসাদে আবদ্ধ থাকেনি। প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত পটভূমিতে তার বিচরণ। জয়দেব তাঁর কাব্যে প্রথম কুঞ্জমিলনের গান সদর্পে গেয়েছেন। তিনি লৌকিক অমার্জিত রাধাকৃষ্ণের গল্পকে তুলে এনে তাতে ভক্তিভাবের মেলবন্ধন ঘটান। বৈষ্ণব সমাজে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* আকর গ্রন্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কৃষ্ণকথামূলক সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। এ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মত হল—

> ইহারই গীতিকবিতার আদর্শে বাঙ্গালা দেশে মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল।[৫১]

পদাবলী সাহিত্যে *গীতগোবিন্দ* কাব্যের প্রভাব এতটাই যে কবিসমাজে তাঁর নামে ‘অভিনব জয়দেব’, ‘দ্বিতীয় জয়দেব’ ইত্যাদি সান্মানিক উপাধির প্রচলন হয়।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথা ও বিশিষ্ট পদকর্তা

বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত কৃষ্ণকথার প্রাচীন গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের শৃঙ্গার রস প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাক-চৈতন্য পর্বের আরেকটি অন্যতম গ্রন্থ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শ্রীকৃষ্ণের বীর রস এতে প্রধান। এই দু’টি জনপ্রিয় গ্রন্থ ছাড়াও এই সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে অজস্র বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়। চৈতন্য জন্মের পূর্বে আবির্ভূত দু’জন শক্তিমান কবির কথা এই আলোচনাপর্বে উঠে আসবে। এঁরা আর কেউ নন একজন মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি আরেক জন দুঃখবাদী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ অন্তর দিয়ে কৃষ্ণের আরাধনা করেছেন। তাঁদের অসামান্য কবিপ্রতিভা পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের দিশারি হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়াদের পদাবলী কীর্তনের রসদ জুগিয়েছে উক্ত প্রতিভাধর কবিদের কাব্যগ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলী।

বড়ু চণ্ডীদাস ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি) আদি-মধ্যযুগে প্রাপ্ত বাংলা ভাষায় রচিত কৃষ্ণকথার প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য। পৌরাণিক এবং লৌকিক কৃষ্ণকথার সংমিশ্রণ ঘটেছে এই কাব্যে। বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের প্রবণতা ও পটভূমি একান্তভাবে গ্রামীণ। স্থূল গ্রাম্যতা কৃষ্ণচরিত্রেই সব থেকে বেশি পাওয়া যায়। *গীতগোবিন্দ*-এ আদিরসের পাশাপাশি ভক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠায় বাসলীসেবক কবি নিজেকে নিয়োজিত করেননি। জয়দেবের সঙ্গে তুলনায় বড়ুকবির কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনে ড. সত্যবতী গিরির মত উল্লেখ্য—

> কিন্তু জয়দেব সর্গ প্রারম্ভে অথবা শেষের সংস্কৃত শ্লোকে নিজেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করেছেন, অন্যদিকে বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের নিজের মুখে বা অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করলেও নিজে কোনও সময়েই কৃষ্ণের চরণে ভক্তি নিবেদন করেননি।[৫২]

পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* আদতে দেবতার মোড়কে মানবের কাব্য। এখানেই প্রথম রাধাকৃষ্ণের পারিবারিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ব বাংলাভাষায় রচিত কৃষ্ণকথায় বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসকেই পথিকৃৎ বলা যায়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ ভক্তিভাবের দিক অনুজ্জ্বল থাকলেও আঙ্গিক, প্রকরণ ও বিষয়বস্তুর বিবিধতা এবং সর্বোপরি কাজের অভিনবত্ব এ যুগের পাঠকের কাছে নতুন মাত্রা এনে দেয়।

মালাধর বসু ও *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*

পরবর্তী বা সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কাব্য বর্ধমানের কুলীনগ্রামনিবাসী মালাধর বসু রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বা *গোবিন্দমঙ্গল* কাব্য (১৪৮০-৮১ খ্রি.)। মালাধর বসু বৈষ্ণব সমাজের উপনিষদসম *ভাগবত-এর* অংশবিশেষ সরল বাংলায় অনুবাদ করে এ'দেশে বৈষ্ণব মতের প্রথম সূচনা করেন। চৈতন্য-পূর্ব কৃষ্ণ-ভক্তিসাহিত্যে তিনি ভিন্নপথগামী প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যে শুধু ভাগবত নয়, অন্যান্য পুরাণপ্রসঙ্গ এবং অল্পবিস্তর লৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্ত্বার প্রতিষ্ঠায় কবির মন ও প্রাণ নিয়োজিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে রাসলীলা, গোপীলীলা প্রভৃতি মধুররসাত্মক কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে মথুরা ও দ্বারকা পর্বের বীর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিই প্রাধান্যলাভ করেছে। জয়দেবের 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'র

দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও মালাধর বসুর এই ঐশ্বর্য-আসক্তি সমকালীন তুর্কি আক্রমণে বিপর্যস্ত হিন্দু বাঙালি মানসের আত্মরক্ষার অবচেতন আকাঙ্ক্ষা কী না তা বিবেচনার বিষয়। মালাধরের কাব্যে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই ছন্দ সবসময় সমাক্ষরযুক্ত ছিল না। এর কারণ রূপে ভাবা যেতে পারে, মধ্যযুগে এই কাব্য গান করে পরিবেশন করা হতো। একধরণের গেয় কাব্য ছিল *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। জনগনের আসরে সংগীতের মধ্য দিয়ে এই কাব্য পরিবেশিত হতো। গ্রন্থের পুঁথিতে সর্বত্র রাগের উল্লেখ আছে। যেমন— বিভাস, বরাড়ি, সিন্ধুড়া, ধানুসি, মহাবরাড়ি, সামগড়া, বসন্ত, পঠমঞ্জরি, কৌরাগ, পাহাড়ি, ভাটিআলি, শ্রীরাগ, ভৈরবি, কানড়, তুড়ি, মালবগৌড়িয়া, রামকেলি, মল্লার, কেদার, গন্ধার প্রভৃতি। সেই সময় মালাধরের কাব্য যে জনপ্রিয় গেয়কাব্য হয়ে উঠেছিল তা বৈচিত্রপূর্ণ রাগের উল্লেখ দেখে অনুমান করা যায়।

কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকে জীবনের নাট্যরস এবং গীতিময়তা। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের মতে, চৈতন্যদেব গৌড়ের নিকটবর্তী কানাই নাটশাল গ্রামে কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মালাধর বসু কর্মসূত্রে গৌড়ে থাকতেন। গৌড়ের কাছে কানাই নাটশাল গ্রামে পুতুল নাচের রঙ্গমঞ্চে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যের অনুশীলন হওয়াটা আশ্চর্যের নয়।[৫৩] কানাই নাটশাল সেই সময়ের দেশীয় রঙ্গমঞ্চ রূপে প্ররিচিত ছিল। এখানে গানের মাধ্যমে লীলা উপস্থাপন হতো।

বিদ্যাপতি

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি (১৩৭০-১৪৭০খ্রি.) মিথিলার অধিবাসী হয়েও বাংলার পদাবলী-সাহিত্যে এমন একটি ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে রয়েছেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে ভক্তিসাহিত্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। *চৈতন্যচরিতামৃত* –এ আছে যে বিদ্যাপতির পদ চৈতন্যদেবের আস্বাদধন্য হয়েছিল। বঙ্গ থেকে শিক্ষার্থীরা মিথিলায় পড়তে যেতেন। সেখান থেকে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি শিক্ষার্থীরা স্মৃতিতে ধারণ করে বাংলায় নিয়ে আসেন। সে যুগে মিথিলা এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে ঘটত। তাই 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে আবার বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ মিথিলার তুলনায়

বাংলাতেই বেশি আদৃত হয়েছে। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতির কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' উপাধি প্রদান করেন।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদে চরম নাট্যদ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। রাধার শৈশবের মন আর যৌবনের মন নিজ দেহ (কিশোরী না যুবতী) নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েছে। কবির মানসপটে রাধাচরিত্রের স্বরূপ প্রকাশে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতটি এইরূপ—

> পুরুষ-কৃষ্ণ যখন নারী-রাধিকার রূপ 'নেহারিছেন', তখন কৃষ্ণের দৃষ্টি কবির দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ নয় স্বয়ং কবিই তাঁহার আরাধ্য সৌন্দর্য্য-মুর্তির বন্দনাগান রচনা করিতেছেন।[৫৪]

প্রাক-চৈতন্য সময়ে আরাধ্যের সঙ্গে কবিরা একাত্ম হবার সুযোগ পেতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবসমাজ কবির একাত্ম হওয়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

রাধার রূপ, আবেগ, কৃষ্ণপ্রেমের যে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিমা তা কীর্তনের সামগ্রী। বিদ্যাপতির পদে রাধাই মূল চরিত্র। তিনি কখনোই বৈষ্ণব বা ভক্তি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবেননি। রমাকান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> Radha is the central figure of the Vaisnava Padavali of Vidyapati. But no Bhakti as a philosophical principle Vidyapati wrote no songs or verses. Merely because he wrote hundreds of songs on Radha and Mahadeva he cannot be regarded as a Vaisnava Bhakta or devotee.[৫৫]

এ পর্যন্ত তাঁর আটশতাধিক পদ পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতির পদগুলি কতটা নাট্য আঙ্গিকে কীর্তন তা একটি পদের উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে—

মধুর জুবতিজন সঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল।।
মধুর নটন-গীতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ।।[৫৬]

মৃদঙ্গ করতালের সঙ্গে সঙ্গে নর্তক-নর্তকীর মধুর নৃত্যে রাজসভায় বসন্তবিনোদন উৎসবের ছবিই যেন এখানে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাজসভার কবি হবার দরুণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাঁর পদগুলি রাজসভায় উপস্থাপিত হতো। মন্দির এবং রাজসভা উভয়স্থানে তাঁর পদাবলী কীর্তনের উপযোগী।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস (আনুমানিক ১৪১৭ খ্রি.) সহজতম ভাষায় প্রেমের গভীরতম আনন্দ-বেদনার রূপকার। তিনি রূপের নন, স্বরূপ সন্ধানের কবি রূপে পরিচিত। ভক্ত-প্রেমিকের আকুতি ধ্বনিত হয় তাঁর রচনায়। ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে—

> শ্রীরাধায় সৌন্দর্যের নব নব বিকাশ কবি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই জন্য তাঁহার কাব্যে চিত্রধর্ম-নাটকীয়তা-উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি।[৫৭]

রাধা চরিত্রে কবির ব্যক্তিক প্রচ্ছায়া লক্ষ করা যায়। মঞ্জরীভাবে ভাবিত হয়ে দূর থেকে ভক্তির চর্চা তখনও প্রচলিত হয়নি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যখন পদ রচনা করছেন তখন নায়ক-নায়িকা ভেদ ও রসপর্যায়ভেদে পদাবলী লেখার প্রচলন হয়নি। তা চৈতন্য-পরবর্তী ষড়গোস্বামীদের কঠিন প্রচেষ্টার ফল। এক্ষেত্রে ড. সনাতন গোস্বামীর মত উল্লেখ্য—

> পালাবদ্ধ রসকীর্তনের জন্য চণ্ডীদাসের পদ সংকলন করতে গিয়ে গায়ককে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ চণ্ডীদাসের কোন পদই সুস্পষ্ট ভাবে কোন রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।[৫৮]

যদিও শুধুমাত্র রসপর্যায়কে মাথায় রেখে পদাবলী রচনায় ব্রতী হলে যান্ত্রিকতায় জর্জরিত হয়ে উঠত তাঁর রচনা। নিয়মানুবর্তীতা এবং ছকে বাঁধা প্রথায় পদাবলীর চর্চায় অনেক সময় রসোপলব্ধি ব্যাহত হয়। চৈতন্য-পরবর্তী অনেক পদকর্তার ক্ষেত্রে তা ঘটতে দেখা গেছে।

চণ্ডীদাস নাম নিয়ে পদাবলী সাহিত্যে বিভ্রাট দেখা যায় যা চণ্ডীদাস সমস্যা নামে পরিচিত। তবে ড. বিমানবিহারী মজুমদার একুশটি প্রাচীন পুথি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচটি মুদ্রিত পদাবলী সংকলন থেকে আহরণ করে ১২০টি পদকে নিশ্চিন্তভাবে চৈতন্য-পূর্ব চণ্ডীদাসের রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস মরমীয়া পদ রচনার জন্য দুঃখবাদী বৈষ্ণব কবি রূপে আপামর বাঙালি হৃদয়ে স্থায়িত্ব অর্জন করেছেন।

খ। চৈতন্য সমসাময়িক

নবদ্বীপ চৈতন্যের জন্মস্থান। নবদ্বীপের আশেপাশে চৈতন্যদেবের আগে ভক্তিধর্মের বেশ কতগুলি ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল। কুমারহট্ট, শান্তিপুর, কুলীনগ্রাম, দেনুর, খাটন্দী, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কুলাই,

ফুলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানগুলিতে ভক্তিবাদের অনুগামীরা ছড়িয়েছিটিয়ে ছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হলে ভক্তিবাদীরা নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ফলে কীর্তন হয়ে উঠেছিল নবদ্বীপকেন্দ্রিক।

সেই সময় কাটোয়ায় বেশ ভাল কীর্তনের চর্চা ছিল। কুলাইয়ের সম্ভ্রান্ত গোবিন্দ ঘোষ কীর্তনে পারঙ্গম ছিলেন। শ্রীখণ্ড বরাবরই গানবাজনার জন্য বিখ্যাত ছিল। অনুমান করা যায় কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুরেও কীর্তনগানের চর্চা হতো। চৈতন্যদেব নীলাচলে থাকাকালীন রথযাত্রার সময় সমবেত ভক্তদের নিয়ে দল বেঁধে কীর্তনের ব্যবস্থা করতেন। দল হতো সাতটি। তাঁর মধ্যে তিনটি দল তৈরী হতো শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর ও কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়াদের নিয়ে। কীর্তন-চর্চার ঐতিহ্য না থাকলেও শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম ও শান্তিপুর নামের দল গড়া সম্ভব ছিল না।

নবদ্বীপের প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত এবং তাঁর তিন ভাই শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। এছাড়া মুকুন্দদত্ত, শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, গোপিনাথ আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারী ও প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ছিলেন। এঁরা নিত্য নিয়মিত সম্মেলক কীর্তন গান করতেন। সেই সময়ের বৈষ্ণব সমাজে আয়োজিত গান ও নাচ শিষ্ট সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এর বর্ণনা পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাস-রচিত *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ।।
কেহ বলে জ্ঞানযোগে এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নিত্য কোন ব্যবহার।।
কেহ বলে কতরূপ পড়িলোঁ ভাগবত।
নাচিব কান্দিব হেন না দেখিলোঁ পথ।।
শ্রীবাস পন্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভজন করিয়া।।
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুন্য নহে।
নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে।।[৫৭]

দেখা যাচ্ছে, নবদ্বীপের চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণবগোষ্ঠী উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করে উদ্দণ্ড নৃত্যসহযোগে কীর্তন করতেন। তাতে লোকে নিন্দাও করত যথেষ্ট। তবে এই নিন্দা উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণদের মুখ থেকেই বেশি শোনা যেত। এই অবস্থার পরিবর্তন করেন চৈতন্যদেব। কীর্তনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর

ভূমিকা ছিল অসামান্য। কীর্তনের সময় ভক্তদের ভাববিকারের অর্থাৎ মুহুর্মুহু কান্না-হাসির প্রসঙ্গও *চৈতন্যভাগবত*-এ আছে। চৈতন্যচরিতকারের বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হল—

যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ভিত।।
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে।।[৬০]

বাংলায় ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে সম্মেলক গানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা মনে রাখলে এইরূপ কীর্তনের প্রচলন দুর্লক্ষ্য ছিল না। চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের জন্য যে ধরণের কীর্তন প্রবর্তন করেন তার মধ্যে পূর্বসূরীদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বেও সমাজে কীর্তন করার রেওয়াজ ছিল। এক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যালের সংযোজিত তথ্য হল—

> চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে। তাঁহার জন্মদিনে চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার মুরারী গুপ্ত ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্’ কাব্যে (সাধারণতঃ মুরারি গুপ্তর কড়চা নামে পরিচিত) লিখিয়াছেন গ্রহণ উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের লোক কৃষ্ণকীর্তন করিয়াছিলেন (কড়চা, ১।৫।২১)।[৬১]

ঘটনাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে অথবা বিশেষ তিথিতে কীর্তন আয়োজিত হওয়াটা চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। চৈতন্যদেব রচিত *শিক্ষাষ্টক*-এ তিনি কীর্তনের মাহাত্ম জ্ঞাপন করেছেন। *শিক্ষাষ্টক*-এর প্রথম শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাবিষয়ক। শ্লোকটি এইরূপ—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরনঙ বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।[৬২]

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন চৈতন্যজীবনীকারেরা। এঁদের মধ্যে জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে কীর্তনের মহিমা প্রকাশে চৈতন্যদেবের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করি বিরহে নদীয়া পুরী
ভোজন শয়ন সুখ ছাড়ি।
বৈষ্ণবী মালিনী সীতা নারায়ণী ধাত্রী মাতা

গদাধর জগদানন্দের বাড়ি।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া   হরিনাম মন্ত্র দিয়া
সভারে কহিল একে একে।
শুনরে নদীয়ার লোক   ছাড়িঅ সংসার শোক
কীর্ত্তন করিয়া প্রেমসুখে।।[৬৩]

চৈতন্যদেব নিজেও খুব নামকীর্তন করতেন এবং তাঁর প্রভাবে বাংলায় কীর্তনগানের ব্যাপক প্রসার হয়। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ অংশে চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বৃন্দাবনদাস সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ[৬৪] বলেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এই বক্তব্যের পুনরুক্তি দেখা যায়, সংকীর্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।[৬৫] আগেই জানানো হয়েছে, চৈতন্যদেবের পূর্বেও বাংলায় কীর্তনের প্রচলন ছিল। তথাপি কীর্তনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক রূপে তাঁকে চিহ্নিত করার কারণ এই যে, বাংলায় উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে কীর্তন ও সংকীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ও তাৎপর্য চৈতন্যদেবের প্রভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

শ্রীচৈতন্যের জীবিতাবস্থায় কোনো কোনো ভক্ত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে নীলাচলে চলে গেলে তাঁর বিরহে কাতর হয়ে পড়েন গৌড়ের ভক্তরা। এঁদের মধ্যে কারও কারও কবিপ্রতিভা ছিল অসামান্য। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ গৌরচন্দ্রিকা নাম দিয়ে চৈতন্য বন্দনা ও লীলা পরিবেশক গান রচনা করতে লাগলেন। এই ধরণের চৈতন্য বিষয়ক গান রাধাকৃষ্ণের পালাকীর্তনের আগে গাইবার নিয়ম আছে। কেউ কেউ যেমন বাসু ঘোষ চৈতন্যের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনি অবলম্বনে পালাগানও লিখেছেন। সেই সময় বিদ্যাপতির পদের প্রভাবে এদেশে ব্রজবুলি পদ রচিত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষের প্রেমের আদলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা রচনা করা হত। তখনও দার্শনিক ভিত্তি স্থাপনের তাগিদ অনুভূত হয়নি। চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়নি। সেই কারণে চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। এখানে চৈতন্য সমসাময়িক কয়েকজন পদকর্তার উল্লেখ আবশ্যক।

নরহরি সরকার এবং মুরারি গুপ্ত

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে নরহরি সরকারের (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ[৬৬]) জন্ম ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। নরহরি যে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তার উল্লেখ *চৈতন্যচরিরামৃত*-এ রয়েছে। তিনি সংস্কৃতে দু'টি পদ লিখেছেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের তিনিই আদি রচনাকার।[৬৭] *পদকল্পতরু*-তে নরহরির ভণিতায় ছত্রিশটি পদ রয়েছে। তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ছ'টি। তবে সবগুলি পদ তাঁরই রচনা কী না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে সাহিত্যিক মহলের। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদস্রষ্টাদের মধ্যে একজন মুরারি গুপ্ত। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে বড়। দু'জনে একই টোলে পড়তেন বলে কথিত আছে। চৈতন্যজীবনী ছাড়াও তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক আক্ষেপানুরাগ, মান ও মাথুর পর্যায়ের একটি করে পদ পাওয়া যায়। মুরারি গুপ্তের রাধা কবি চণ্ডীদাসের রাধার মতই 'জাতিকুল শীল অভিমান' বিসর্জন দিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর ব্রজবুলি ভাষাতেও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ, মাধব ও বসুদেব ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বসু ঘোষ —এই তিন ভাই ছিলেন মহাপ্রভুর কৃপাধ্যন্য কৃষ্ণভক্ত এবং তাঁর নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। এঁরা তিনজনই ছিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত কীর্তনীয়া ও কবি। মহাপ্রভু এঁদের কীর্তন শুনে নৃত্য করতেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* -এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়—

> গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
> যাঁ সভার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই।।[৬৮]

তিন ভাই একাধারে ছিলেন কীর্তনীয়া ও পদ রচয়িতা কবি। কীর্তন করার নিমিত্তে পদাবলী রচনা করা মধ্যযুগের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য নয়। সুকুমার সেনের মতে—

> গোবিন্দ ঘোষের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় এমন পদ পাঁচ-ছয়টির বেশি পাওয়া যায় নাই। তবে ইঁহার আরও কয়েকটি পদ "গোবিন্দদাস" কবির রচনার সঙ্গে মিশিয়া থাকা অসম্ভব নয়।[৬৯]

পদকল্পতরু গ্রন্থে মাধব ঘোষের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তিনটি পদ আছে। এই তিনটির মধ্যে একটি হল শ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রার পদ। মাথুরের পদে একজন দূতীর কৃষ্ণের কাছে দশমী দশায় উপনীত বিরহকাতরা রাধার করুণ বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষণিক বিচ্ছেদের ভয়ে রাধাকৃষ্ণের ব্যাকুলতা

বর্ণিত হয়েছে নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুন পুন[৭০] পদটিতে। ভাবসম্মেলনের একটি পদে আছে বিরহিণী রাধার চিত্ত উল্লাসে (কৃষ্ণের আগমনের কথা ভেবে) আকুল হয়ে ওঠার কথা। তিনি সখীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ সম্পদ যত   সব ভেল অনুগত
সো পিয়া অনুকূল ভেল।। [৭১]

দুঃসহ দুঃখের পটভূমিকায় ভবিষ্যতের সুখের জন্য রাধার এই আশা বড় করুণভাবে অন্তরে বেজে ওঠে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী ছাড়া তিনি গৌর-পদাবলীও রচনা করেছিলেন।

বাসুদেব ঘোষ ছিলেন চৈতন্যদেবের মুখ্য কীর্তনীয়া বা প্রধান গায়েন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি পদ তিনি রচনা করেছেন। দানলীলা, বর্ষাভিসার প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ ছাড়া একটি পুঁথিও পাওয়া গেছে বাসুদেব ঘোষ ভণিতায়। পুঁথিটিতে ননীচুরি, ভানুপূজা, সুবল-সংবাদ, মান ও নৌকালীলার ভাব অনুসারে বর্ণিত হয়েছে পাঁচটি কাহিনি। ভানু পূজা এখনও সূর্য পূজা নামে হরিবাসরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও পরমানন্দ গুপ্ত

গোবিন্দ আচার্য চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ কবি ও কীর্তনীয়া। কবির চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দদাস ভণিতায় অনাড়ম্বর ভাবসমৃদ্ধ সহজ সরল পদ পাওয়া যায়। তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে ড. সত্যবতী গিরি বলেছেন—

> এই কৃষ্ণ যেন শুধু প্রেমিক নন, তাঁর সেবার মধ্যে একই সাথে প্রেম, দাস্য ও বাৎসল্যের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। দেহ নয় দেহাতীত ভাবের যে মাধুর্য এখানে সঞ্চারিত, তা চন্ডীদাস ছাড়া চৈতন্যপূর্ব আর কোনও কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।[৭২]

গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদগুলি গোবিন্দ আচার্যের চেয়ে বেশি পরিচিত, অনেকটা গোবিন্দদাসের পদের ধ্বনিঝঙ্কার পাওয়া যায়। তিনি একজন ভালো কীর্তন গায়কও ছিলেন। তাঁর পদে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার আদলে গৌরাঙ্গের নদিয়ানাগর আদিরসাত্মক রূপ কখনো কখনো প্রাধান্য পেয়েছে। বলাই বাহুল্য আদিরসের সংমিশ্রণ থেকে তখনও পদাবলীকে আলাদা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

পরমানন্দ গুপ্তের নামে মোট ১২টি পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কৃষ্ণকথামূলক পদের সংখ্যা ৬টি। তিনি শ্রীরাধার পূর্বরাগের যে পদটি রচনা করেছেন তাতে দেখা যায়, কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশত রাধা তাঁর প্রেম প্রস্তাব কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন দূতী মারফৎ। কিন্তু কৃষ্ণ দূতীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাতা দূতী রাধাকে বলেন—

সুন্দরি, দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঞে লেহ নহে সমুচিত
না পূরব তব অভিলাষ।।[৭৩]

চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। তবে পদ রচনার থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের কীর্তনসত্ত্বা।

রামানন্দ বসু

রামানন্দ বসু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম সহচর। কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় লীলাই তিনি রচনা করেছেন। রামানন্দ বসুর ভণিতায় *পদকল্পতরু*-তে যে সাতটি পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চারটি পদ উৎকৃষ্ট। এই পদগুলি যথাক্রমে পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, কুঞ্জভঙ্গ ও যুগলমিলনের। রামানন্দ বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও সখ্যরসের পদ রচনায়। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রামানন্দের চোখে দেখা শ্রীচৈতন্য। তিনি প্রেমধন মেগে বেড়ান সবার কাছে। বিনিময়ে নিজেকে উজার করে দেন সকলের কাছে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তাঁর পদাবলী গতানুগতিক বক্তব্য থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

বংশীবদন

বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়াপাহাড় গ্রামে। গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর গৌরাঙ্গলীলার নিখুঁত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তিনি চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছিলেন। তিনি যথাযথভাবে এই অভিজ্ঞতাকে পদে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলিতে কোথাও কোথাও মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন। সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসাশ্রিত পদে তাঁর অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

যদুনাথদাস

যদুনাথদাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালের পদকর্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদই রচনা করেছেন। তাঁর কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলি সাজালে একটি নিটোল কাহিনি চোখে পড়ে। বাল্যকালে কৃষ্ণের দৌরাত্মে যশোদার মধুর আকুতি দিয়ে এই কৃষ্ণকথা শুরু হয়। পদগুলি অজস্র সংলাপের দ্বারা পরিপূর্ণ। পূর্বরাগের বিবিধ পদে কৃষ্ণের ছলনা, রাধা ও গোবিন্দের দুষ্টু-মিষ্টি ঝগড়া এবং শেষে মিলনের মধ্য দিয়ে পদাবলী কীর্তনের রসদ জুগিয়েছে এই পদগুলি। যদুনাথদাস সুবল মিলনের কতগুলি পদ রচনা করেছেন। পদগুলির মধ্যে সংগীতের সুরলহরি আভাসিত হওয়ার পাশাপাশি সংলাপময় নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে পদ রচনার বৈচিত্র্য থাকলেও শক্তিশালী কবি রূপে এঁরা কেউই তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের প্রভাব তখনও প্রখর। তাঁদের প্রখর তেজ স্তিমিত করে রেখেছিল চৈতন্যের সমসাময়িক অন্যতম কবিপ্রতিভাকে। যদিও কীর্তনীয়া হিসেবে তাঁরা বড় মাপের শিল্পী রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গ। চৈতন্য-পরবর্তী কৃষ্ণ-চৈতন্যকথা

চৈতন্যদেব কীর্তনের প্রবর্তক না হলেও তিনিই কীর্তনকে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নগরকীর্তনের উদ্ভাবন তাঁরই হাতে। তাঁকে কাজীদলনের সময় ক্রুদ্ধ হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমে কীর্তন করতে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের পূর্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচালনায় কীর্তনের সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সে আলোচনা আগেই হয়েছে। চৈতন্যদেবের দৈবসত্তা প্রকাশের পর এই কীর্তন সংগঠনগুলি নবদ্বীপমুখী হয়। অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে—

> চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কীর্তন ছিল গণবিনোদনের একটি মাধ্যম তাতে ভক্তির ভাব তেমন স্পষ্ট ছিল না। নরনারীর প্রেম যে মানসিক প্রক্ষোভ তৈরি করে চৈতন্যপূর্ব কীর্তনে তা ছিল বেশ সুস্পষ্ট। পদাবলী-রচয়িতা তাঁদের উপাস্য দেবতাকে মনের কথা খুব কম ক্ষেত্রেই জানিয়েছেন।[৭৪]

যে কীর্তন ছিল মনোরঞ্জনের সাধনমাত্র চৈতন্যদেব তা করে তুললেন প্রতিবাদের হাতিয়ার এবং অহৈতুকী ভক্তির সামগ্রী। কাজীদলনে নগরকীর্তনের প্রচলন দেখে এমনটাই মনে হয়। মুসলমান শাসনের দ্বারা কোণঠাসা হিন্দু-বাঙালি ঘর ছেড়ে পথে নামার সাহস পায় শ্রীচৈতন্যের ডাকে।

সাধারণত মন্দির-প্রাঙ্গণ বা আসর পেরে গান করতে জানত সেকালের বাঙালি সমাজ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তীত এই নতুন পন্থা কীর্তন ও কীর্তনের আঙ্গিকে এবং বাংলার সামাজিক চাল-চরিত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

কীর্তন গানের বিভিন্ন পদসমূহ রচনায় শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভক্তির জোয়ার সেই সময়কার কুসংস্কার, ভীরুতা, সঙ্কোচ, অস্পৃশ্যতার কঠিন বাধা অতিক্রম করে বাণভাসি করেছে বাঙালিকে। অজস্র কবি ও তাত্ত্বিক এই সময় বৈষ্ণব সাহিত্য রচনায় আকর্ষণ অনুভব করেন। কীর্তনের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদ রচনা বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। এবার চৈতন্যের কৃষ্ণকে আত্তীকরণের পালা। বহিরাঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণের রূপ ধরে কলিকালের জীবন্ত দেবসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় চৈতন্যদেবের মাধ্যমে। চৈতন্যদেবের পূর্বেকার রচনা এবং পরবর্তীকালীন রচনায় পার্থক্য দেখা যায়। ড. সত্য গিরি বলেছেন—

> চৈতন্যদেবের নির্দেশে ও প্রভাবে রচিত গোস্বামীদের নবতর বৈষ্ণবদর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্র পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যের ধারাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করল। আগে যা ছিল শুধু পদাবলী, এখন তা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী।[৭৫]

কেবলমাত্র পদই বাড়ল না কীর্তন হয়ে উঠল বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতি বা দৈনিক পালনীয় বিষয়। পদাবলী সাহিত্য চৈতন্যের মানবধর্মের ছায়াতলে লালিত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা লাভের পথে শত ধারায় নিষ্ক্রান্ত হল।

বৈষ্ণবীয় রীতি-নীতি যুক্ত হয়ে কীর্তন তথা পদসমূহে এক নতুন বৈচিত্র্য দেখা দিল। যুক্ত হল বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকার মতো বিশেষ রীতি-পদ্ধতিগুলি। গৌরাঙ্গ ছিলেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-রসমূলক কীর্তনের প্রধান সম্প্রচারক। উপরন্তু তাঁকে কলিকালের অবতার রূপে ভাবা হতে থাকে। এমতাবস্থায় চৈতন্যদেব স্বয়ং কীর্তনের অঙ্গ হয়ে ওঠেন। গৌরচন্দ্রিকা যুক্ত হল কীর্তনে এবং তা কৃষ্ণলীলার আগে গীত হতে থাকে। এই পদ্ধতির প্রচলন আজও রয়েছে। কৃষ্ণের দাদা বলরামের মতো নিত্যানন্দকে বন্দনা করা হয়। অন্যদিকে কীর্তনের সুর, তাল প্রভৃতি ক্রমেই উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর সিংহভাগ বৈষ্ণব সম্প্রদায় গুরুবাদী পরম্পরায় চালিত হয়। তাই অন্যান্য

দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে গুরুবন্দনা-বিষয়ক গান রচিত হয়। কীর্তনে গুরুবন্দনা চৈতন্য-পরবর্তী কীর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

মহাপ্রভুর কাছে বাঙালির বড় প্রাপ্তি 'রাধা'। ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে রাধা লৌকিক নায়িকা থেকে শাস্ত্রীয় দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও বঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচেষ্টাতেই সম্ভবত রাধা দেবী রূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব ষড়গোস্বামীরা এই পথ প্রশস্ত করার দায়িত্ব নেন। তাঁদের প্রণীত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি অনুঘটকের মতো পদাবলী সাহিত্যকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এক স্বতন্ত্র্য রসশাস্ত্র নির্মাণ করেছেন। রূপ গোস্বামী রচিত *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে রসপর্যায় ভেদ, নায়ক-নায়িকার প্রকরণভেদ ইত্যাদির প্রভাবে কীর্তন ও বৈষ্ণব পদ রচনায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। রসপর্যায় অনুসারে কীর্তনের পদ রচনা চৈতন্য-পরবর্তী ঘটনা। তাই চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদকর্তাদের তুলনায় পরবর্তী পদকারেরা চৈতন্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন কীর্তনে। তাঁর জীবনাবসানের পরবর্তী সময়ে আয়োজিত খেতুরী মহোৎসব পদাবলী কীর্তন তথা বৈষ্ণব পদাবলীর উপযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। চৈতন্য-পরবর্তী প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের কবিত্বশক্তি এবং ভক্তি সাহিত্যের প্রসারে তাঁদের অসামান্য গুরুত্বের কথা এই অংশে আলোচিত হবে।

বলরামদাস

বৈষ্ণব পদাবলীতে চৈতন্য-পরবর্তী কবি রূপে বলরাম দাস স্বকীয়তায় দীপ্ত কবিসত্তা। গৌরাঙ্গ এবং কৃষ্ণ উভয় বিষয়ক পদ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ অনেক সময় গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর শিষ্য পদকর্তারা সখ্যরসের পদরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। পুরুষোত্তম, সুন্দরদাস ও বলরামদাস পদ রচনার কর্মে এগিয়ে এসেছিলেন। গৌরাঙ্গ ছাড়াও তাঁর নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য-বিষয়ক বহু পদ পাওয়া যায়। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের রচনায় অদ্বৈত আচার্যের সম্পর্কে পদ পাওয়া না গেলেও বলরাম দাসের দু'টি পদ পাওয়া যায়। গুরু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার পরিচয় পদগুলিতে বিদ্যমান। এক্ষেত্রে একটি পদ উল্লেখ্য—

বন্দিব অদ্বৈত শিরে   যে আনিলা ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝারে।
নন্দের নন্দন যে   শচীর নন্দন সে
নিত্যানন্দ রায় সখা যার।।[৭৬]

এছাড়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বর্ণনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নির্দিষ্ট সরণি অবলম্বনে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, আক্ষেপানুরাগ, সম্ভোগ, রসোদ্গার, দানলীলা, নৌকাবিলাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, বাসকসজ্জিকা, খণ্ডিতা বিরহ প্রভৃতি বিষয়ের পদও তিনি রচনা করেছেন।

পুরুষোত্তমদাস ও কানুরামদাস

বিরহমূলক পদ রচনায় পুরুষোত্তমদাস অগ্রগণ্য নাম। বৈষ্ণব সাধক নিত্যানন্দের সামনে সংকীর্তনকারী রূপে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বৈষ্ণব পদ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। শুধু রাধা নয়, কৃষ্ণবিরহে মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, সখাবৃন্দ, এমনকি বৃন্দাবনের প্রকৃতির বেদনাময় প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত হয়েছে পুরুষোত্তমদাসের পদে। শ্রীরাধার বিরহে উদ্ভিদ, পশু এমনকি জড়জগতের ক্রন্দন তাঁর নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* -এ পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানুরামদাসের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনায় তাঁর ওপরে জয়দেব ও রূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি সূর্যপূজার পদে বৈষ্ণব সন্ত রূপ গোস্বামী এবং বাসকসজ্জিকার একটি পদে কবি জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন।

লোচনদাস

চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস শুধু চৈতন্যজীবনীকার রূপে নয়, গীতিকাররূপেও খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁকে 'গৌরনাগরী ভাব'-এর প্রবর্তক বলা হয়। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, ১৫৪০ সালে তাঁর জন্ম এবং *চৈতন্যমঙ্গল* রচনা করেন আনুমানিক ১৫৬০-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ।[৭৭] লোচনদাস চৈতন্যলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। তাঁর গৌরনাগরীভাবের পদগুলিতে ব্যক্তিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ড. সত্যবতী গিরির মতে—

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের খ্যাতি, তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিকে নেপথ্যে সরিয়ে দিলেও, এই কবির কৃষ্ণকথাবিষয়ক পদে গ্রামীণ জীবনের কিঞ্চিৎ অমার্জিত অথচ অকৃত্রিম আধারে রাধাকৃষ্ণপ্রেমকথাকে উপস্থিত করা হয়েছে।[৭৮]

তাঁর পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের জীবনযাপনের এক সামাজিক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। রাধার জীবনের দুঃখকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেও রাধাকৃষ্ণের দ্বন্দে তিনি যেন মানসিকভাবে কৃষ্ণের সহায়ক হয়েছেন।

জ্ঞানদাস

চৈতন্য-পরিমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পদকর্তা জ্ঞানদাস (১৫২০-১৫৭৫ খ্রি.) অন্যতম। তিনি যেভাবে নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করেছেন, তাতে অনুমান করা যায় কবি নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণের জন্ম থেকেই শুরু হয়েছে। কাহিনির সূচনা হয় বাসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণের যশোদাগৃহে আগমন দিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরকে অবলম্বন করে প্রচুর পদ রচিত হলেও শ্রীরাধার শৈশব-কৈশোর বর্ণনা বিষয়ক পদ বিরল। এই বিরল পর্যায়ে পদরচনা করে মৌলিকতার পরিচায় দিয়েছেন জ্ঞানদাস।

সখ্য ও বাৎসল্যরসযুক্ত গোষ্ঠলীলার পদ বর্ণনায় কবি হিসেবে জ্ঞানদাসের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেও যেন সক্রিয়ভাবে গোষ্ঠলীলায় অংশগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ নিজেকে তিনি এক কৃষ্ণসহচর গোপবালকরূপে কল্পনা করেছেন। জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে অনুরাগ, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ ও রসদ্গারের পদে। এছাড়াও আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদেও জ্ঞানদাস তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যসাহিত্যের বিচারে জ্ঞানদাসের পদাবলীতেই বোধ হয় প্রথম বিস্তৃতভাবে রাধাকৃষ্ণের দোললীলা বা হোলিখেলার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোবিন্দদাস

অলঙ্কার, কলানৈপুন্য, অপূর্ব ছন্দঝঙ্কার এবং শব্দ ব্যবহারের কুশলতায় গোবিন্দদাস (১৫২৫ খ্রি.) বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গতানুগতিক রাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনিকে

নিয়ে পদ রচনা করলেও, সেই কাহিনির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চরিত্র চিত্রণে এবং কথা বস্তুর কিছু কিছু অভিনবত্বে কবি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময়ানুসারে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। অষ্টকালীয় লীলার এই দৈনন্দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় গোবিন্দদাসের রাধা, কৃষ্ণ, সখী ও স্নেহস্নিগ্ধা যশোদার চিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোবিন্দদাসকে আমরা প্রধানত অভিসার, উৎকণ্ঠিতা ও ভাবোল্লাসের কবি বলেই জানি। বিশেষত অভিসার-বিষয়ক পদ রচনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের সঙ্গে তুলনীয়। ।

গোবিন্দদাস শুধু শ্রীরাধার নয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনাও নিখুঁতভাবে করেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে নির্ণীত অভিসারের বিভিন্ন পর্যায়গুলি প্রকাশিত হয়েছে গোবিন্দদাসের পদে। তাঁর পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিত্রনাট্যধর্ম। এক্ষেত্রে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মত উল্লেখ্য—

> গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যে যে পদ-পর্য্যায়ে, তাহার কোনটিতে হয় চিত্রধর্ম, নয় নাটকীয়তা—ইহার যে কোনো একটি অনুস্যূত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন। গৌরচন্দ্রিকায় উভয়ের মিলন, রূপানুরাগে চিত্র-রসের প্রাধান্য, অভিসারে নাটকীয়তা, মহারাসেও তাই।[৭৯]

নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মীতার রূপ কীর্তনের মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট ফুটিয়ে তোলা যায়। গোবিন্দদাসের পদ উপস্থাপনে কীর্তন ভীষণভাবে সহায়ক। গোবিন্দদাস ছিলেন *সঙ্গীত দামোদর* এর রচয়িতা দামোদর সেনের ভাগ্নে। মাতুল-সূত্রেই তাঁর সংগীত-শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপাগুণে তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ হন। নরোত্তমদাস আয়োজিত খেতুরী মহৎসবে যোগদান করে কীর্তনগান সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি *কৃষ্ণকর্ণামৃত* নামক একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য ও *সঙ্গীতমাধব* নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। কীর্তনের উপযোগিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বলেছেন—

> প্রতিটি পালায় গোবিন্দদাসের কিছু পদ গাইতে হয়, আবার অনেক পালা কেবল গোবিন্দদাসের পদ দিয়েই গাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যেহেতু খেতুরী প্রকরণের গায়ক, সেহেতু তাঁর গানগুলির বেশিরভাগই 'গরাণহাটি' গান বলে পরিচিত। সব চেয়ে বেশি জাতগান এবং দাগীগান আছে তাঁরই রচনায়।[৮০]

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগে পদাবলী কীর্তনে প্লাবন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই গড়াণহাটী ঘরানার কীর্তন গানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নরোত্তমদাস

ভাগবতের ব্যাখ্যাকাররূপে শ্রীনিবাসের যে প্রসিদ্ধি রয়েছে, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাসে সেই প্রসিদ্ধি নরোত্তমের রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে নরোত্তম বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে ও কীর্তন গানে নতুন প্রাণের ধারা সংযোজিত করেন। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ কায়স্ত পরিবারে নরোত্তমদাস জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং এঁদের তিনজনের চেষ্টাতেই বাংলাদেশে ঝিমিয়ে পড়া বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। নরোত্তমের জীবনের একটি মহৎ কীর্তি হল খেতুরী মহৎসব। বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি সাধনভজন বিষয়ে বেশ কতগুলি নিবন্ধ রচনা করেছেন। পদকর্তা রূপেও নরোত্তমের খ্যাতি কম ছিল না। বিশেষত প্রার্থনার পদগুলিতে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়া মানভঞ্জন, আক্ষেপানুরাগ, মিলনের পদ রচনায় স্বকীয়তা রক্ষা করেছেন নরোত্তমদাস। তবে শরৎকালীন মহারাস, অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, নিত্যরাস ও বসন্তরাস বর্ণনায় নরোত্তমদাস ষড় গোস্বামী প্রবর্তিত রীতিই অনুসরণ করেছেন।

উপরোক্ত বিশিষ্ট কবিদের মতই তাঁদের পরবর্তী আরও অনেক কবির পদ পাওয়া যায়। শ্যামানন্দ দাস, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, বসন্ত রায়, রায়শেখর, বল্লভদাস এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম। সকল কবিদের আলোচনায় বিশদে বিবরণ দেওয়া গেল না; তা করা হলে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে আলোচনায় এটুকু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, চৈতন্যের পূর্বে বা পরবর্তীকালে কৃষ্ণকথায় মেতে উঠেছিল বাংলার শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তসমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই। পদাবলী কীর্তন নিয়ে মানুষ ভেবেছে (প্রকরণের দিক দিয়ে), মেতেছে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। চৈতন্যদেব এই ভক্তিপথের পাথেয় রূপে কীর্তনকে সঙ্গী করার মন্ত্র দিয়েছিলেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কবি ও কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন

সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের প্রভাব দেখা যায় না। তবে পদাবলী কীর্তন কখনোই জনপ্রিয়তা হারায়নি। বরং পদাবলীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ক্রম-পরম্পরাতেই লিখিত হয়ে চলেছিল বৈষ্ণব পদাবিলী সাহিত্য। এই সময়কার পদকর্তাদের মধ্যে

অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কুমুদানন্দ, নৃসিংহ কবিরাজ, প্রসাদদাস, রাধাবল্লভদাস, দিব্য সিংহ, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, যদুনন্দনদাস, বলরাম কবিরাজ, গৌরদাস, রামগোপাল চৌধুরী, মনোহরদাস প্রমুখ শক্তিশালী কবি ও পদাবলী কীর্তনীয়ার আবির্ভাবে সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবীয় ধর্মভাব স্তিমিত হয়নি।

সপ্তদশ শতকে পদাবলী রচনার পাশাপাশি বেশ কিছু কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্যগুলিতে কমবেশি *ভাগবত*-এর অনুসরণ করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অনেক কাব্যেই ভাগবতের অনুবাদ করা হয়েছে। এই সময়ে রচত কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য হল— সনাতন বিদ্যাবাগীশের *ভাষাভাগবত*, কৃষ্ণদাসের *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*, কৃষ্ণদাস (ইনি কাশীরাম দাসের বড় ভাই) রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিলাস*, ঘনশ্যামদাসের *কৃষ্ণবিলাস*, কবিশেখর রচত *গোপালবিজয়*, বংশীদাসের *কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতম*, *কৃষ্ণগুণ বর্ণনা*, *কৃষ্ণগুণার্ণব*, *কৃষ্ণলীলা*, *দানখণ্ড* ও *নিকুঞ্জরহস্যস্তব* (উক্ত পুথিগুলিতে বংশীদাসের নাম পাওয়া যায়), অভিরামদাসের *গোবিন্দবিজয়* কাব্য, পরশুরাম চক্রবর্তীর *কৃষ্ণমঙ্গল*, যশচন্দ্রের *গোবিন্দবিলাস*, পরশুরাম রায়ের *মাধবসঙ্গীত*, ভবানন্দের *হরিবংশ*, ভবানীদাসের *রাধাকৃষ্ণবিলাস*, নরহরিদাসের *কেশবমঙ্গল* ইত্যাদি।

ভুললে চলবে না, সেই সময় লীলানাট্য এবং লীলাকীর্তন বেশ ভালোমাত্রায় উপস্থাপিত হত। পালাভিত্তিক কীর্তনের আসর জমাতে কঠিন তত্ত্বকথার চেয়ে সরল কাহিনি অনেক বেশি প্রয়োজন। এই সময় মানুষের মধ্যে লৌকিক গল্প শোনার প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। *ভাগবত*-এর সেই অংশগুলো তারা শুনতে আগ্রহী যেখানে কথা-কাহিনি প্রধান হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যগুলিতেও দেখা যায়। কাব্য রচনা করতে গিয়ে *ভাগবত*-এর তত্ত্বকথা এবং দার্শনিকতা অনেকাংশেই এড়িয়ে গেছেন কবিরা। তার পরিবর্তে তাঁদের কাব্যে স্থান পেয়েছে পুরাণ ও উপপুরাণ এবং দোললীলা, দানলীলা, নৌকালীলা, বস্ত্রহরণ, বড়াই চরিত্র ইত্যাদি লৌকিক প্রসঙ্গ। এই কবিদের একাংশ গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং গীতিবহুল কাব্য রচনায় নিজেদের নিয়োজত করেন। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক অনেকের কাব্য রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে চৈতন্যদেবের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। মহাজনদের বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় ভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী সপ্তদশ শতকে কবিদের

রচনায় বৈচিত্র্যের সমাবেশ থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা একরকম চর্বিত চর্বণে পর্যবসিত হয়। এই সময়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজন কর্তৃক পদাবলীর সংকলন। অষ্টাদশ শতকে আবির্ভূত কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও তাঁদের পদসংকলন গ্রন্থগুলি হল— রাধামোহন ঠাকুরের *পদামৃতসমুদ্র,* দীনবন্ধুদাসের *সংকীর্তনামৃতম্,* কমলাকান্তদাসের *পদরত্নাকর,* নিমানন্দদাসের *সংকীর্তনানন্দ,* নটবরদাসের *রসকলিকা,* গৌরসুন্দরদাসের *কীর্তনানন্দ,* বৈষ্ণবদাসের (ইনি নিজে একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন) *পদকল্পতরু* (এর আসল নাম ছিল *গীতকল্পতরু*), চন্দ্রশেখর ও শশীশেখরের *নায়িকা রত্নমালা* (নায়িকার চৌষট্টি রকমের বৈশিষ্ট্য সহ চৌষট্টিটি পদের সংকলন) ইত্যাদি।

পদাবলী সংকলনের পাশাপাশি উক্ত কবিদের বৈষ্ণব পদও পাওয়া যায়। তবে তা সংখ্যায় অনেক কম। অনেকেই যেমন বৈষ্ণবদাস প্রমুখ প্রখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। পদাবলী কীর্তন করার পাশাপাশি তাঁরা পদসংকলন গ্রন্থ রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এতে যেমন মহাজনদের পদ সংরক্ষণ করা হত আবার তেমনি পদাবলী কীর্তনের উপস্থাপনায় গ্রন্থগুলি একরকম স্ক্রিপ্ট হিসেবেও কাজ করত। এই সময় যে কেবলমাত্র বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন ও পদাবলী রচনা হয়েছিল এমন নয়। সপ্তদশ শতকে যেমন বিভিন্ন কৃষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্য রচিত হয়েছিল তেমন অষ্টাদশ শতকেও একাধিক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়। যেমন— কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রচিত *ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল,* মহারাজ গোপাল সিংহের (বিষ্ণুপুরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন) *রাধাকৃষ্ণমঙ্গল,* দীন বলরামদাসের *কৃষ্ণলীলামৃত,* দ্বিজ রামনাথের *শ্রীকৃষ্ণবিজয়,* দ্বিজ রামেশ্বরের *শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা,* বনমালিদাসের *গোবিন্দমঙ্গল,* ভক্তরামদাসের *গোকুলমঙ্গল,* দ্বিজ বৃন্দাবনের *শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা* ইত্যাদি অসংখ্য কাব্য পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলিতে একদিকে যেমন পদাবলী কীর্তনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে অন্যদিকে লীলানাট্য প্রভাবিত লীলাকীর্তনের প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমানে লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে পালাভিত্তিক পালাকীর্তনের নমুনা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে যেমন কাব্য রচিত হয়েছে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলার নানা অংশ অবলম্বন করে অজস্র পালা রচিত হয়েছে। যেমন— *জন্মাষ্টমী, কানাইবন্ধন, শুক-পরীক্ষিত সংবাদ,*

মানভঞ্জন, কলঙ্কমোচন, তুলসী মাহাত্ম্য, উদ্ধবসংবাদ, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, মণিহরণ, সুদামার দারিদ্রভঞ্জন ইত্যাদি পালার পুথি পাওয়া যায়। অসংখ্য কবি ও কীর্তনীয়া এই কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণলীলার টুকরো টুকরো অংশ অবলম্বনে পালা রচিত হত। পালা রচনার পেছনে পালাকীর্তনের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা উভয়ই সমান্তরালভাবে কাজ করেছিল। কেবলমাত্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত বা উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যেই পদাবলী কীর্তন ও পালাকীর্তন সীমাবদ্ধ ছিল না। চিত্তবিনোদনের উপায় রূপে তা গৃহীত হয়েছিল আপামর জনসাধারণের মধ্যে। কীর্তন সংরূপটি জনপ্রিয়তার পাখায় ভর করে ক্রমেই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত পদাবলীর পরিবর্তে লিখিত আকারে পদসংকলন উপলব্ধ হওয়ায় পেশাজীবী কীর্তনের দল গঠনের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় নতুন নতুন নাট্যসংরূপের জন্ম হয়। এই সময় কীর্তনের পেশাজীবী দলগুলি ভেঙে তৈরি হচ্ছিল নতুন নতুন নাট্যদল (যাত্রা, কবিগান, ঢপ-কীর্তন ইত্যাদি)। পদাবলী কীর্তন সংরূপের আদল গ্রহণ করে সেই নতুন নাট্যরূপের পথ চলা সূচীত হয়। তবে এত ভাঙাগড়ার মাঝেও কীর্তনের মূল স্রোত কখনোই বেগ হারায়নি। এর সজল গতি আজও শতধারায় উজ্জীবিত।

চৈতন্যজীবনী

চৈতন্যদেব তাঁর জীবতকালেই ঈশ্বরত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর মাহাত্ব কীর্তিত হয়েছে সংস্কৃত শ্লোকে, কাব্যে ও নাটকে এবং বাংলায় কাব্যে ও গানে। অদ্বৈত আচার্য প্রকশ্যে চৈতন্যদেবের পূজা করেছিলেন। যদিও চৈতন্যদেব নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করতেন না, তবু তার অনুচরবৃন্দ তাঁর দেবত্ব প্রতিষ্ঠায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। চৈতন্যজীবনকাহিনি সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন মুরারি গুপ্ত। তাঁর পরবতী চৈতন্যজীবনী রচয়িতা হলেন স্বরূপ দামোদর। দু'জনের রচনাই 'কড়চা' নামে পরিচিত। সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যবিষয়ক নাটক লিখেছিলেন কবিকর্ণপূর পরমানন্দদাস। তাঁর নাটকটির নাম *চৈতন্যচন্দ্রোদয়*।

বাংলায় লেখা প্রথম চৈতন্যচরিত কাব্য *চৈতন্যমঙ্গল* যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় *চৈতন্যভাগবত* নামে। এই গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ

চৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্যদেবের জীবন সম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে উক্ত গ্রন্থদুটি পরিচিত। গবেষণার কাজে বহু জায়গায় গ্রন্থদুটির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি হল— লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল*, চূড়ামণিদাসের *গৌরাঙ্গবিজয়*, জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* ইত্যাদি। সুর ও তালে আবৃত্তি এবং গান করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। গানের মাঝে রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। তবে একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* পাঠের জন্য রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে গীত হওয়ার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যটি পাঠ এবং গান দুয়ের উপযগী করে রচনা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি পদ সংযুক্ত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। এতে পদাবলীর আস্বাদ পাওয়া কঠিন নয়। লোচনদাসের কাব্যটি আকারে ছোটো এবং তা গান করে উপস্থাপনের উপযুক্ত। তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল* কাব্যে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ নেই। চারটি খণ্ডে কাব্যটি বিন্যস্ত। এই গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে ধুয়া-গানের ব্যবহার রয়েছে যা থেকে দোহারের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। বৈষ্ণবেরা এই কাব্য পাঠ এবং সংগীতের দ্বারা চৈতন্যদেবকে স্মরণ করতেন। খুব সম্ভবত পদাবলী কীর্তনের মতই বৈঠকি কায়দায় তা উপস্থাপিত হত। চৈতন্যজীবনী নিয়ে আরও অনেক বিষয় আলোচনা করা যায়, তবে তাতে হয়তো তথ্যভার বৃদ্ধি পাবে। চৈতন্যজীবনী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের নাট্য-উপস্থাপন উপলক্ষ্যে করা হবে।

১:৫ বঙ্গে কীর্তনের প্রচলন

কীর্তন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই সমাজে প্রচলিত ছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। কীর্তনগানকে সমাজের চোখে সম্মানের স্থানে পৌঁছে দিতে মহাপ্রভুর ভূমিকা কতখানি ছিল তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু একার প্রচেষ্টায় কীর্তনের জনপ্রিয়তা কখনোই সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচার করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে কীর্তনের প্রচার ও প্রসারে চৈতন্যের ভাবাদর্শে চালিত ঘনিষ্ট বৈষ্ণব পরিকরদের ভূমিকা কম ছিল না। বঙ্গে কীর্তনের চালচিত্র বুঝতে হলে কীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি বড় ঘটনাকে গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত— কাজীদলনে নগরকীর্তন, নীলাচলে রথযাত্রাকালে কীর্তন এবং খেতুরী মহোৎসবে বৃহৎ কীর্তন অনুষ্ঠান। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া তথ্য যা তখনকার কীর্তনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সাহায্য করেছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রখ্যাত

কীর্তনীয়ারা সার্বজনীন মঞ্চ পান নীলাচল ও খেতুরীর উৎসবে। প্রতিবাদের হাতিয়ার রূপে নগরকীর্তনের প্রচলন হতে দেখা যায় কাজী দলনের ঘটনায়। এই ঘটনার বর্ণনা চরিতকাব্যের মধ্যে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তা ঐতিহাসিক সত্য রূপে পরিগণিত। এই অংশে চৈতন্য ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট পরিকরদের কথা আসবে যাঁরা চৈতন্যদেবের ভক্তিপথ অনুসরণ করে কীর্তনের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিলেন।

ক। নবদ্বীপে কাজিদলনে নগরকীর্তন

ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর চৈতন্যদেব নবদ্বীপে ফিরে এলে শ্রীবাসের গৃহে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে কীর্তন গান আরম্ভ করেন। সেই সময়কার নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গন ছিল কীর্তন উপস্থাপনের নাট্যমঞ্চ। এক্ষেত্রে ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর মত উল্লেখ্য—

> শ্রীবাস অঙ্গনই কীর্তনের শ্রেষ্ঠ নাটমন্দির ফলতঃ সর্বাধিক গায়ক-বাদকের সমাবেশ হ'ত সেখানে। কীর্তনের সমবেত চর্চা বলতে যা বোঝা যায় তার পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ ছিল নবদ্বীপে।[৮১]

তাছাড়া অদ্বৈত আচার্য, চন্দ্রশেখর, নন্দন আচার্যের বাড়িতেও চৈতন্যদেবকে কীর্তন করতে দেখা যায়। চৈতন্যদেবের আদেশে নদিয়ার লোক খোল করতাল বাজিয়ে ঘরে ঘরে কীর্তন আরম্ভ করেন। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে এর বর্ণনা পাওয়া যায়—

সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সব মিলি।
কীর্তন করেন সভে দিয়া হাতে তালি।।
এইমত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিল শচীর নন্দন।।
... ...
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্বঘরে।
দুর্গোৎসব কালে বাজাবার তরে।।
সেইসব বাদ্য ইবে কীর্তন সময়ে।
গায়েন বায়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে।।[৮২]

নবদ্বীপ জুড়ে প্রবল কীর্তন শুরু হলে সেখানকার কাজী তাতে রুষ্ট হন। ধর্মসাধনায় হিন্দুদের কীর্তন বন্ধ করার আদেশ জারি করা হয়। কাজী হিন্দুদের প্রহার করেন, তাঁদের জাতিচ্যুত করার হুমকি দেন ও তাঁদের মৃদঙ্গ ভেঙে ফেলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* (আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ) ও *চৈতন্যভাগবত* (মধ্যখণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়) গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজীর ভয়ে নদিয়াবাসী কীর্তন

বন্ধ করে দিলে চৈতন্যদেব তাঁদের অভয় দেন। কাজীদলনের দিনেই কীর্তন, সর্বব্যাপী হয়ে প্রতিবাদের ভাষা রূপে ঘরের গণ্ডী ত্যাগ করেছিল চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে। সম্প্রদায় নিয়ে কীর্তন করার রীতি তাঁর পূর্বে কবি জয়দেবকে করতে দেখা গেছে। যদিও সেই সম্প্রদায় ছিল একান্ত ঘরোয়া। কাজীদলনে সম্প্রদায় নিয়ে নগরকীর্তনে নামেন চৈতন্যদেব। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়—

এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।।
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য গোসাঞি পরম-উল্লাস।।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচিত বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।।
বৃন্দাবন্দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে।।
এমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা।।[৮৩]

বৃন্দাবনদাস এই নগরকীর্তনের বর্ণনা দিয়ে সেই সময়ে উপস্থিত কীর্তনজ্ঞ বিশিষ্ট সুধীজনের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে—

মন দিয়া শুন ভাই নগরকীর্তন।
সেকথা শুনিলে কর্মবন্ধের খণ্ডন।।
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারী শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদীশ বিপ্র গঙ্গাদাস।।
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর।।
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে রহকার্য।।[৮৪]

কাজীদলনে যে সব খ্যাতনামা কীর্তনগাইয়েদের পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তাঁরাই নীলাচলে রথাগ্রে ও খেতুরী মহোৎসবে কীর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই যুগ থেকে আজকের কীর্তন গাইয়েদের পুরুষানুক্রমে তালিকা যদি প্রস্তুত করা যেত তাহলে বোধ হয় যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেত আজকের কীর্তন পদ্ধতির। কখনো গুরু পরম্পরায় কখনো জীবিকার চাহিদায় কীর্তনের গায়নরীতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হয়েছে। আজকের কীর্তন গানে হয়তো সেদিনের সবটা

পাওয়া যাবে না, সেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেদিনকার কীর্তনের ভাবে ও মহাত্ব-গুণের পরিচয় বহনে কার্পণ্য করেনি এই সময়ের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা।

খ। নীলাচলে রথযাত্রায় কীর্তন প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য থেকে পুরীধামে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে বাংলার বহু ভক্ত পুরীধামে উপস্থিত হন। তখন তিনি সেই ভক্তদের নিয়ে চারটি সম্প্রদায় গঠন করে কীর্তন করেছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়—

বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন।।
চারিদিকের চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তান্ডব নৃত্য করে গৌররায়।।
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হইল।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিল।।
অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়।।
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর।।[৮৫]

বেড়াকীর্তনের মাধ্যমে এই সংগঠিত কীর্তনচর্চার ধরণ বাংলায় প্রচলন করেন শ্রীচৈতন্য। পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় মহাপ্রভু আরও বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বেড়াকীর্তনের প্রচলন করেন। সেখানে সাতটি সম্প্রদায়ের কীর্তন উপস্থাপিত হয়েছিল। মন্দির বা কোনো স্থান বেষ্টন করে এই কীর্তন করা হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই ধরনের সম্মিলিত কীর্তনের প্রক্রিয়া সংকীর্তন-রাসনৃত্য নামে পরিচিত। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যলীলায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়—

কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন।।
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন।।
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।।[৮৬]

চৈতন্যচরিতামৃত-এ বিস্তারিতভাবে কীর্তনগোষ্ঠীর কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একেকটি সম্প্রদায়ে পৃথক পৃথক মোট নয়জন নর্তক নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম সম্প্রদায়ের মূল গায়েন হলেন স্বরূপ দামোদর এবং নর্তক অদ্বৈত আচার্য। পাঁচজন দোহার হলেন নারায়ন দত্ত, গোবিন্দ, দামোদর, রাঘব পণ্ডিত এবং গোবিন্দানন্দ। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত মূল গায়েন, নর্তক নিত্যানন্দ আর দোহার হলেন গঙ্গাদাস, শ্রীমান, হরিদাস, শুভানন্দ এবং শ্রীরামপণ্ডিত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের মূল গায়েন মুকুন্দ, নর্তক হরিদাস ঠাকুর, দোহার হলেন গোপীনাথ, মুরারি, বাসুদেব, শ্রীকান্ত এবং বল্লভ সেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ের মূল গায়েন হলেন গোবিন্দ ঘোষ এবং নর্তক ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। আর পাঁচজন দোহার হলেন বিষ্ণুদাস, রাঘব, হরিদাস, মাধব এবং বাসুদেব। পঞ্চম সম্প্রদায়ে ছিলেন কুলীন গ্রামের কীর্তনীয়া সমাজ, নর্তক সত্যরাজ খান এবং রামানন্দ বসু। ষষ্ঠ সম্প্রদায়ে ছিলেন শান্তিপুর আচার্যের এক সম্প্রদায়, নর্তক অদ্বৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ। সপ্তম সম্প্রদায়ে কীর্তন করেছিলেন খণ্ডবাসী কীর্তনীয়ারা, নর্তকের ভূমি কায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরহরি সরকার ও শ্রীরঘুনন্দন। সাতটি সম্প্রদায়ের কীর্তনকে সঞ্চালন করা বেশ কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকলে কীর্তন পরিচালনা ও উপস্থাপন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু পুরীতে রথ উপলক্ষে আসা পরিকরেরা যে কীর্তন ও নর্তন করতে পারঙ্গম ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিনের কীর্তন ও নর্তনের অভ্যাস যে তাঁদের ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। চৈতন্য-পরিকরদের কীর্তনে পারঙ্গমতার পরিচয় দেওয়াটা এক্ষেত্রে মনে হয় যুক্তিযুক্ত হবে।

নিত্যানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দ (আনুমানিক ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ) বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হরিনাম সংকীর্তন প্রচারে মহাপ্রভুর প্রধান সহায়ক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নদিয়ার পথে প্রকাশ্যে কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তি প্রচারে ব্রতী ছিলেন তখন নিত্যানন্দ ও হরিদাস সেই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। বৃন্দাবনদাস *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের শুরুতেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে সংকীর্তনের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কখনো কীর্তন কখনো নর্তন- দুই বিষয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন

গৌর-নিতাই। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে চৈতন্যের নির্দেশে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভরের সংকীর্তন ও নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে—

> আগে পাঠাইল বায়ু খেপা তিন জনে।
> তিনজনার নাট সবে হরিসংকীর্ত্তনে।।
> অদ্বৈত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর।
> আগল পাগল খেপা তিন দ্বিজবর।।
> ইহা শুনি সর্বলোক করে কানাকানি।
> এমন কথা এমন নাট কোথায় না শুনি।।[৮৭]

অতএব বোঝা যায়, কীর্তনের মধ্যে নৃত্য যুক্ত হওয়ায় নদিয়ার মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। কারণ এর আগে বাংলার মানুষ কীর্তনের সঙ্গে 'পাগলের মতো' নৃত্য করতে দেখেনি। নামকীর্তনের প্রচারে নিত্যানন্দের অবদান চিরস্মরণীয়। নামকীর্তনের মতই লীলাকীর্তনেও যে তাঁর আগ্রহ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে—

> হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র রায়।
> করিতে লাগিল নিত্য গোপাল লীলায়।।
> দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
> শুনি অবশূতশিংহ পরমসন্তোষ।।[৮৮]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, চৈতন্য-পার্ষদরা একে অপরের কাছে কীর্তন শুনতে যেতেন এবং তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতেন। পাশাপাশি কৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যনিলা লীলানাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। কীর্তনের সঙ্গে লীলানাটক জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নাটকের উপস্থাপন একই আসরে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করার পেছনে নিত্যানন্দের মতো গুণী নাট্যশিল্পীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে এসে বাস করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে রাতের বেলা অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা কৃষ্ণকথা আলোচনা ও হরিসংকীর্তন করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া থেকে ফিরে শ্রীবাসের উঠোনেই কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে দ্বার রুদ্ধ করে কীর্তনগান আরম্ভ করেন। অনেক ব্রাহ্মণ এতে রুষ্ট হয়ে বিরোধিতা করেছিলেন। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

নবদ্বীপ এবং পুরীতে কীর্তনের ঘরোয়া আসরে, রাজপথে, রথের সামনে কীর্তনের দলে শ্রীবাসকে সক্রিয়ভাবে কীর্তন ও নর্তনে অংশ নিতে দেখা যায়।

অদ্বৈত আচার্য

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে অদ্বৈত আচার্য (১৩৫৫ শকাব্দে) আবির্ভূত হন। কাজীদলনের দিন শ্রীচৈতন্য কীর্তনের যে বিরাট মিছিল বের করেছিলেন, সেখানে তিনি তার সম্প্রদায় নিয়ে সবার আগে কীর্তনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *চৈতন্যভাগবত* -এ আছে—

> শুনি সর্ব বৈষ্ণব আইল ততক্ষণ।
> সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন।।
> আগে নৃত্য করিবেন আচার্য গোসাঞি।
> এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি।।[৮৯]

সংকীর্তন প্রারম্ভে অধিবাসের প্রবর্তনে অদ্বৈত আচার্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মন্দিরেই অধিবাস কীর্তনের সূচনা হয়। *পদকল্পতরু* গ্রন্থে পরমেশ্বর দাস ও বৃন্দাবন দাসের যথাক্রমে ২৩ ও ২৪ সংখ্যক পদ[৯০] দু'টি রয়েছে যেখানে তাঁর অধিবাসের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

কীর্তনে অদ্বৈতই সর্বপ্রথম চৈতন্যদেবের নামগান প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে এই প্রথা অনুসরণে বসু ঘোষ প্রমুখ পদকর্তারা গৌরলীলা-বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালের গৌরচন্দ্রিকার বীজ অদ্বৈত রচিত চৈতন্য-গীতিতেই নিহিত ছিল বলে অনুমান করেছেন ড. কৃষ্ণা বক্সী।[৯১] এক্ষেত্রে জেনে রাখা উচিত, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এই ভেদরেখাটি স্পষ্ট করে বলেছেন—

> রাধাভাবের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিল রেখে গৌরাঙ্গ জীবনে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি প্রদর্শন করে যে সমস্ত গৌরপদ রচনা করা হত সে সমস্ত পদের নাম তদুচিতা গৌরচন্দ্রিকা।[৯২]

অদ্বৈত আচার্য পরবর্তী সময়ে রচিত পদাবলী সাহিত্যে তথা কীর্তনের নিয়ম নির্ধারণে যে অভূতপূর্ব দিক দু'টির সংযোজন করেছেন তাতে বৈষ্ণব সন্তদের ইতিহাসে তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি এই দুই ক্ষেত্রে পথিকৃত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

হরিদাস

চৈতন্য জন্মের প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে হরিদাস যশোহর জেলার বূঢ়ন গ্রামে যবন কুলে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান হরিদাসের হরিনাম সংকীর্তনের জন্য তাঁকে কাজীসাহেব 'বাইশ বাজার'-এ বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি কাজীদলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজীদলনে কীর্তনের মিছিলে তিনি ছিলেন সকল কীর্তনীয়াদের একেবারে মাঝখানে। এর বর্ণনা পাওয়া যায় *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে-

> মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
> এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ।।[৯৩]

হরিদাস প্রতিদিন তিনলক্ষ বার হরিনাম কীর্তন করতেন। তার মধ্যে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ, লতাপাতা ইত্যাদির জন্য উচ্চস্বরে একলক্ষবার হরিনাম কীর্তন করতেন। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*-এ হরিদাসের এক বিশেষ কৃতিত্বের কথা জানতে পারা যায়-

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
> হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
> এই মন্ত্র হরিদাস দিলেন সভারে।
> এই মন্ত্রে জীবের নিস্তার সংসারে।।[৯৪]

নামকীর্তনের ইতিহাসে হরিদাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর যবন হয়েও কৃষ্ণভক্তি প্রচার ও প্রসারের জন্য। জয়ানন্দের কথা সত্যি ধরলে বাংলার মানুষ এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরের জন্য তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে।

স্বরূপ দামোদর

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বরূপ দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরলে স্বরূপ দামোদর তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্য যখন শেষ বারো বছর নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন তখন স্বরূপ দামোদর ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। সেই সময় সুকণ্ঠ গায়ক রূপে প্রসিদ্ধ স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও *গীতগোবিন্দ*-এর পদ গান করে শোনাতেন। পুরীতে রথাগ্রে কীর্তনের প্রথম সম্প্রদায়ের ইনি মূল গায়েন ছিলেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।[৯৫] ইনি সুগায়ক হবার পাশাপাশি গুণী মৃদঙ্গবাদকও ছিলেন।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত

গঙ্গাদাস চৈতন্যদেবেকে ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াতেন। পরবর্তীকালে তিনি প্রিয় শিষ্যের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। কাজীদলনের দিন দীপাবলীসহ যে নগরকীর্তনের মিছিল মহাপ্রভু বের করেছিলেন তিনি তাতে গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কথিত আছে নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার সময় সারা পথ তিনি কীর্তন গাইতে গাইতে যেতেন। রথাগ্রে কীর্তন গানের সময় তিনি দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দোহার ছিলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত নর্তক ও সুগায়ক। একবার বক্রেশ্বর মহাপ্রভুর কাছে দশ হাজার গন্ধর্ব প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁদের গানে নৃত্য করার জন্য। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলায় তা বর্ণিত হয়েছে—

> বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
> একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য।।
> আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
> প্রভুর প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে।।
> দশ সহস্র গান্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
> তারা গায় মুঞি নাচোঁ তবে মোর সুখ।।[৯৬]

রথযাত্রার সময় তিনি প্রতি বছর নীলাচলে যেতেন এবং কখনো কখনো সেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করতেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বক্রেশ্বর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

গ। খেতুরী মহোৎসবে কীর্তন প্রসঙ্গ

নরোত্তমদাসের বাড়ি ছিল গোপালপুর গ্রামে। পদ্মানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত প্রেমতলী দেশে ফিরে তিনি খেতুরীতে থাকবেন বলে স্থির করেন। খেতুরী থেকে তিনি বাংলার বিচ্ছিন্ন (মতাদর্শের কারণে) বৈষ্ণব সমাজকে একত্র করে সংগঠন করার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ও ওড়িশার

বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন পরিভ্রমণ করে বৈষ্ণব সমাজে গোষ্ঠী-নায়কদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। পরিভ্রমণ শেষে তিনি খেতুরীতে একটা বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তমের কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন। বাংলার সকল গোষ্ঠীনায়ক-মহন্তদের তিনি এই মহোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

> ভাবাদর্শের সূত্রে বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীসমূহকে একত্রীকৃত করাই এই খেতুরী মহোৎসবের মূল উদ্দেশ্য।[৯৭]

এই কাজে নরোত্তমকে সাহায্য করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। স্থান হিসেবে কেন খেতুরীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তার যুক্তি দিয়েছেন অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী। তিনি মনে করেন—

> উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণের জন্যই খেতুরীকে বেছে নেওয়া হয়।[৯৮]

সব মিলিয়ে বলতে হয় খেতুরী মহোৎসব বৈষ্ণব সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। ঝিমিয়ে পড়া বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

খেতুরী মহোৎসব আয়োজন ও এর সফলতার পেছনে অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এর আগে কাটোয়া এবং শ্রীখণ্ডে মহোৎসবের আয়োজন করতে দেখা যায়। গদাধরদাস এবং নরহরি সরকারের মৃত্যুর এক বছর পর তাঁদের তিরোধান তিথি উজ্জাপন করা হয় উক্ত দুই মহোৎসবে। দুই মহোৎসবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল শ্রীনিবাসের। কাটোয়ায় গদাধরদাসের গোষ্ঠী দ্বারা আয়োজিত এই মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীখণ্ড গোষ্ঠীর মহন্তরা। এরপর শ্রীখণ্ডে যাওয়ার পথে যাজিগ্রামেও মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। শ্রীখণ্ডে শ্রীনিবাসের ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সকলের ভালো লাগে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈষ্ণবগোষ্ঠীবর্গের মধ্যে একধরনের সম্প্রীতির আবহ তৈরি হয়েছিল এই মহোৎসবের আয়োজনে। সবচেয়ে বড় ও সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহোৎসব খেতুরীতে দেখা যায়। উল্লিখিত প্রতিটি মহোৎসবেই শ্রীনিবাস আচার্য সংগঠনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। খেতুরী মহোৎসব ঠিক কবে হয়েছিল তা জানা যায় না। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে ১৫৭৬ সাল বা

তার অব্যবহিত পরে খেতুরী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ ও একটি গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে নরোত্তম এই মহোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৯৯]

মহোৎসবে সকলকে পদ্যের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ জানান শ্রীনিবাস পণ্ডিত। বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষ্ণব পার্ষদরা তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে খেতুরী মহোৎসবে যোগ দিতে আসেন। শ্রীনরোত্তমের কৃপাধন্য রাজা সন্তোষ দত্ত খুব সুন্দরভাবে সংকীর্তন স্থান এবং ছ'টি বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য ষড় বিগ্রহের অভিষেক ও পূজা করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে ভূষিত করে তা অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এরপর জাহ্নবাদেবী ও মহন্তদের নির্দেশে নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনগান আরম্ভ করলেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নরোত্তমদাসের এই নূতন কীর্তন কৌশল সম্পর্কে জানান যে— অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীতের দ্বারা নরোত্তম কীর্তন আরম্ভ করেন।[১০০] 'অনিবদ্ধ' এবং 'নিবদ্ধ' শব্দ দু'টি শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তত্ত্ব ও শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে নরোত্তমদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক সংগঠন দৃঢ় ও ব্যাপক করে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। মহোৎসব উপলক্ষে সমবেত গোষ্ঠীনায়কগণসহ বৈষ্ণবমণ্ডলীর সামনে নূতন গায়ন পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য নরোত্তম তৈরি হয়েছিলেন। সেজন্য অনেক খোল ও করতাল গড়িয়ে রাখা হয়েছিল। নরোত্তমদাসের সহযোগীরা সকলেই ছিলেন গীতবাদ্য ও নৃত্যবিশারদ। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নরোত্তমদাসের দল সম্পর্কে বলেছেন—

> নরোত্তমের প্রধান বাদক দুইজনের নাম শ্রীগৌরাঙ্গদাস ও শ্রীদেবীদাস। প্রধান দোহার গায়ক দুইজনের নাম শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ। প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজে জনশ্রুতি শুনিওয়াছি, ইঁহারা চারিজনপুরীধামে গিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের নিকট গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।[১০১]

খেতুরী মহোৎসবে পদাবলী কীর্তন উপস্থাপনকারীরা সকলেই নৃত্য এবং গীতে পারদর্শী ছিলেন। কীর্তনের সঙ্গে শাস্ত্রীয় যোগসাধনে চৈতন্য পার্ষদদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। নরোত্তমদাসের নূতন কীর্তন-কৌশল প্রকাশের বিবরণ নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

> শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ।
> সকলেই গীত নৃত্য বাদ্যে বিচক্ষণ।।
> প্রথমেই দেবী দাস মর্দল বামেতে।

করে হস্তাঘাত—প্রেমময় শব্দ তাতে।।
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লব্দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে।।
...   ...
গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না যায়।।
নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে।।
...   ...
রাগিণী সহিত রাগ মুর্ত্তমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা।।
...   ...
শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন' পুস্পমাল।।
গণসহ নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
নিজ হস্তে পরাইলা শ্রীমালা-চন্দন।।
নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময়।
নিবন্ধ গীতের পরিপাটি প্রচারয়।।[১০২]

ভক্তিরত্নাকর-এর বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে কীর্তন শুরু হয় বাজনা দিয়ে। 'প্রথমে মর্দল' অর্থাৎ খোলবাদ্য আরম্ভ করলেন দেবীদাস। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বল্লভদাস। এছাড়া বর্ণনায় আছে করতাল বাজিয়েছিলেন গৌরাঙ্গদাস। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তালের বোল উচ্চারণ করা হয়েছিল। কীর্তনগানে এই প্রথা আগে থেকেই চালু ছিল এবং এখনও তা বজায় আছে। বোল উচ্চারণ করার রীতিকে বলে 'পাট'। বাজনা বেশ জমে উঠলে গোকুলদাস আরম্ভ করলেন অনিবদ্ধ গীত অর্থাৎ রাগরাগিণী নিয়ে আলাপচারী, বর্ণবিন্যাস স্বরালাপ। এই মহোৎসবে নরোত্তম যে ধারায় গান করেছিলেন, সেই ধারা গড়ের হাটি বা গড়াণহাটীর ধারা নামে পরিচিত। খেতুরী অবস্থিত উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার গরেরহাট পরগণায়। পরগণার নাম অনুসারে নাম হয় গড়াণহাটী ঘরাণা। এই কীর্তন সম্মেলনেই প্রণালীবদ্ধভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন করার প্রথা চালু হয়।

শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি ও নীলাচলে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গদের সম্মিলিত সভায় যে পদাবলী গীত হত তা বৈঠকী গানের কায়দায় গাওয়া হত। সেই সময় একধরনের লোকলজ্জা ও ভীতি কাজ করত। কিন্তু একটি ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন যে চৈতন্যদেব কীর্তনগানকে অন্তর্মুখী ও বদ্ধ করে রাখতে চাননি। নীলাচলে রথাগ্রে অথবা কাজীদলনের ক্ষেত্রে নগরকীর্তনে সেই অভিপ্রায়ের

প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু লীলাকীর্তনের আয়োজন ও পদাবলী গানের উপস্থাপন তার চিরাচরিত গণ্ডী পার করে সর্বসমক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল খেতুরী মহোৎসবে। এক্ষেত্রে তৎকালীন পাঁচালি গানের আসরের প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে ড. হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতটি উল্লেখ্য—

> চৈতন্যদেবের পর প্রকাশ্যে পদগান কতটা কি চালু হইয়াছিল বা কি ভাবে গাওয়া হইত, জানি না। প্রকাশ্যে পদগান করার প্রথা চালু করিলেন নরোত্তমদাস। নরোত্তমদাস পদগানকে বৈঠকী পর্যায় হইতে সরাইয়া প্রচলিত পাঁচালি গানের ধাঁচে খোলা আসরে আনিয়া গাহিলেন।[১০৩]

পাঁচালি গানের প্রভাব কীর্তনের গঠনগত দিকটি নির্মাণে কতটা সাহায্য করেছিল তা অস্পষ্ট। কিন্তু আসর নির্বাচনের ক্ষেত্রে কীর্তন যে প্রচলিত জনপ্রিয় উপস্থাপনভঙ্গির অনুসরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে অনুমোদনেরও অভাব হয়নি। এই সম্পর্কে ড. কৃষ্ণা বক্সীর মত হল—

> এই কীর্তন আসরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর লীলাকীর্তনের যে অভিজাত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা উপস্থিত সমস্ত বিদগ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।[১০৪]

আসর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই খেতুরী মহোৎসব কীর্তনে এক নতুন দিক নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। এর পর থেকে কীর্তন ও ভক্তমণ্ডলীর (দর্শক-শ্রোতা) দূরত্ব অনেক কমে আসে।

জাহ্নবাদেবীর আদেশে কীর্তন অনুষ্ঠানের শেষে রঙ খেলা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি এবং নামকীর্তনসহ শ্রীচৈতন্যের জন্মাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সারা রাত্রি জুড়ে সংকীর্তন চলে। মঙ্গল আরতির শেষে জাহ্নবাদেবী নিজের হাতে ভোগ রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করে সকল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে দেন। এই পদ্ধতির অনুসরণে আজও কীর্তনানুষ্ঠানের শেষ দিন প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

১:৬ উপসংহার

কীর্তনের ইতিহাস আলোচনাপর্বে জানা গেছে এর বৃহৎ প্রেক্ষাপটের কথা। শুধুমাত্র সংগীত রূপে কীর্তন গীত হত না। এর একটি জনপ্রিয় দলবদ্ধ উপস্থাপনের দিকও ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন লিপিলিখনে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এবং সর্বোপরি সাহিত্যে। আলোচনায় বৈষ্ণব পদাবলী ও পদাবলী কীর্তনের সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পদকর্তারা যে গান করার জন্য পদাবলী রচনা করেছিলেন সেই

উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পদকর্তাদের অনেকেই ছিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত কীর্তনীয়া, দোহার, নর্তক ও বাদ্যকর। কীর্তনে ভক্তি আন্দোলন তথা ভক্তিসাহিত্যের গুরুত্ব কতখানি তা হয়তো অনেকাংশেই স্পষ্ট করা গেছে। বাংলায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কীর্তনের বলিষ্ঠ ভাবমূর্তি আরও স্পষ্ট করে তুলেছিলেন চৈতন্য-পরিকরবৃন্দ। ভক্তির আবেশে আলোচনা যে অনেকাংশেই ভক্তিভাবে আবিষ্ট হয়েছে তা অকপটেই স্বীকার করতে হয়। যেখানে এমন মাধুর্যের আধার কৃষ্ণকথা এবং ভক্তির নানা অনুষঙ্গ রয়েছে সেখানে গবেষক মনের মোহাবিষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। মোহভঙ্গের সুযোগ রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে যেখানে এর সংরূপগত দিকটি নিয়ে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনাপর্বে নাটকের প্রেক্ষিতে পদাবলী কীর্তনকে দেখা যায় কী না তা বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র

[১] দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেত লিমিটেড। ১৯৯৪। পৃ. ৪২০

[২] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬। পৃ. ৬৩৩

[৩] গোস্বামী, রাধাবিনোদ। *শ্রীমদ্ভাগবতম্*। দশম স্কন্ধ। কলকাতা: গিরিজা। ২০০৫। পৃ. ১২৮৫

[৪] তদেব। পৃ. ২৭৮২

[৫] গোস্বামী, প্রাণগোপাল। *শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ*। কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভান্দার। ২০১৮। পৃ. ৬

[৬] তদেব। পৃ. ৬১৫

[৭] তদেব। পৃ. ৬৩৮

[৮] গোস্বামী, রাধাবিনোদ। *শ্রীমদ্ভাগবতম্*। পঞ্চম স্কন্ধ। কলকাতা: গিরিজা। ২০০৫। পৃ. ১২৮৫

[৯] সেন, হরিদাসদা। *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*। সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৭। পৃ. ৫৩

[১০] গোস্বামী, প্রাণগোপাল। *শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ*। সংস্কৃত পুস্তক ভান্দার। ২০১৮। পৃ. ৬২১

[১১] তদেব। পৃ. ৬২০

[১২] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও মজুমদার সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭। পৃ.-৬

[১৩] তদেব। পৃ.-৬১৯

[১৪] ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬১। পৃ. ১৩

[১৫] তদেব। পৃ. ১৫

[১৬] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ১৯

[১৭] ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬৪। পৃ. ১৭

[১৮] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৩৪

[১৯] ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬৪। পৃ. ২৮

[২০] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৪

[২১] তদেব। পৃ. ১৪

[২২] Dey, Sushil Kumar. *Early History of The Vaishnava Faith and Movement In Bengal*. Firma KLM Private Limited. 1986. p.2.

[২৩] ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১২। পৃ. ২৫

[২৪] Dey, Sushil Kumar. *Early History of The Vaishnava Faith and Movement In Bengal*. Firma KLM Private Limited. 1986. p.3.

[২৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মর্ডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৬-১৭। পৃ. ২১

[২৬] Chatterjee, Chinmoy. *Studies in the Evolution of Bhakti Cult with Special Reference to Vallabha School*. Kolkata: Jadavpur University. 1976. P.72.

[২৭] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ২০১

[২৮] ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬৪। পৃ. ৩৩৫

[২৯] তদেব। পৃ. ৩৪১

[৩০] ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১২। পৃ. ২৮

[৩১] মহারাজ, দেবগোস্বামী (সম্পা.)। *শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*। নবদ্বীপ: শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। ২০০৭। পৃ. ৩৫

[৩২] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ৪৭

[৩৩] গিরি, সত্য। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৫। পৃ. ১২৮

[৩৪] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩২

[৩৫] জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭। পৃ. ৭

[৩৬] সেন, সুকুমার। *চৈতন্যাবদান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬। পৃ. ১৮

[৩৭] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৩৮

[৩৮] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৭

[৩৯] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ৭৫

[৪০] গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: শম্পা বুক হোম। ২০০২। পৃ. ১৩

[৪১] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৩৯

[৪২] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ১৯

[৪৩] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৩৯

[৪৪] সেন, সুকুমার। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: ভারবি। ১৯৯২। পৃ. ২৬৬

[৪৫] তদেব। পৃ. ২৬৬

[৪৬] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৪২

[৪৭] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৪৮

[৪৮] তদেব। পৃ. ৫২

[৪৯] তদেব। পৃ. ২৮

[৫০] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬। পৃ. ৪৬

[৫১] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩২

[৫২] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ৮৬

[৫৩] ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.)। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গুনরাজ খান মালাধর বসু বিরচিত*। কলকাতা: রত্নাবলী। পৃ. ১১০

[৫৪] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৬১। পৃ. ২১

[৫৫] Chakravarti, Ramakanta. *Vaisnavism on Bengal*. vol-II. kolkata: Sanskrit pustak bhandar. 1985. p.-22.

[৫৬] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ ও মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা)। *বিদ্যাপতির পদাবলী*। কলকাতা: কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ১৯৫৩। পৃ-৪৪৩

[৫৭] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। সেপ্টেম্বর। *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ২০০৭। পৃ. ১৮

[৫৮] গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণেব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: শম্পা বুক হোম। ২০০২। পৃ. ১১৭

[৫৯] সেন, সুকুমার (সম্পা)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ৪৩।

[৬০] তদেব। পৃ. ৪২

[৬১] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৯

[৬২] মহারাজ, দেবগোস্বামী (সম্পা.)। *শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*। নবদ্বীপ: শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। ২০০৭। পৃ. ১

[৬৩] মজুমদার, বিমান বিহারী, মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬। পৃ. ১১৯

[৬৪] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১

[৬৫] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬। পৃ. ৪

[৬৬] মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেতথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৯৩। পৃ. ২৭

[৬৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১১। পৃ. ৯২

[৬৮] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও মজুমদার সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটুর প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭। পৃ. ৯২

[৬৯] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৫০

[৭০] তদেব। পৃ. ৩৫০

[৭১] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ২৫৬

[৭২] তদেব। পৃ. ২৫৯

[৭৩] রায়, সতীশচন্দ্র। *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।২০০৪। পৃ. ১০৫

[৭৪] চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ। ২০১১। পৃ. ১৫৪

[৭৫] গিরি, সত্য। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৫। পৃ. ৫১

[৭৬] জানা, মনু। *বলরাম দাসের পদাবলী*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৮। পৃ. ৩৪

[৭৭] মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৯৩। পৃ. ২৭

[৭৮] গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭। পৃ. ২৯৩

[৭৯] বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৬১। পৃ. ১৪৬

[৮০] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ. ৯৪

[৮১] তদেব। পৃ. ৯৪

[৮২] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৮৪-১৮৫

[৮৩] তদেব। পৃ. ৩৪

তদেব। পৃ. ১৮৬

[৮৫] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬। পৃ. ৯৩

[৮৬] তদেব। পৃ. ১০০

[৮৭] মজুমদার, বিমান বিহারী, মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬। পৃ. ৩৪

[৮৮] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ২৬৪

[৮৯] তদেব। পৃ. ১৮৬

[৯০] রায়, সতীশচন্দ্র। *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৪১০। পৃ. ১৭-১৮

[৯১] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৬। পৃ. ১

[৯২] চক্রবর্তী জনার্দন। *শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৭। পৃ. ১৭৩

[৯৩] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৮৬

[৯৪] মজুমদার, বিমান বিহারী, মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পাদিত)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬। পৃ. ৩৬

[৯৫] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬। পৃ. ১০০

[৯৬] তদেব। পৃ. ১৭

[৯৭] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি বাগচী আয়ান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৪১

[৯৮] চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। চতুর্থ মুদ্রণ। কলকাতা: আনন্দ। ২০১১। পৃ.-৮৮

[৯৯] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি বাগচী আয়ান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৪২

[১০০] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫২। পৃ.- ২৬

[১০১] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৬

[১০২] দাস, শ্রীকিশোর। *শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর*। কলকাতা: জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট। ২০০৭। পৃ. ৪২৩-৪২৪

[১০৩] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি বাগচী আয়ান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৪৭

[১০৪] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৬। পৃ. ১৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটকের ইতিহাস: উপেক্ষিত অধ্যায় ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক

২:০ ভূমিকা

বাংলা ভাষায় লিখিত আদি সাহিত্যিক নিদর্শন এখনও পর্যন্ত *চর্যাপদ*-কেই ধরা হয়। সেই আদিকাল অর্থাৎ নবম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত কাব্যের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০খ্রিঃ) মধ্যযুগের অবসানকাল রূপে নির্ণিত। গদ্যসাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনাময় অঙ্কুরোদ্গমের সাক্ষী অষ্টাদশ শতাব্দী। গদ্যের সংরূপে বাঙালি পাঠক-দর্শকের কাছে এসে হাজির হয় বাংলা নাটক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ভারতে বাংলা থিয়েটারের প্রচলন হয়। সাহেবদের থিয়েটার দেখে তার আদলে বাঙালির নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়; বীজগণিতের সূত্রের মতো তা একরকম প্রতিষ্ঠিত অভিমত। নাটকের সূচনাকালের সন্ধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কারণ সেই সময়টা ভাবা হয়, কেবলই কাব্যের আরাধনায় নিয়োজিত থাকার সময় রূপে। সাহিত্যিক মূল্য কেবলমাত্র তালপাতা কি তুলোট কাগজের হরফের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। এক্ষেত্রে কাব্য পরিবেশনার দিকটি একেবারেই অবহেলিত থেকে যায়। কাব্যের উপস্থাপনের দিকটি যদি দেখা যায় তবে হয়তো নাট্যসাহিত্যের অন্যরকম পাঠ পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসিকে নবরূপে আস্বাদনের সুযোগ পাবে পাঠকসমাজ।

বাংলা সাহিত্য অনেকাংশেই সংস্কৃত সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এক সময় সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক বিবেচিত হত কাব্যের অংশ রূপে। ‘সাহিত্য’ বলতে কাব্যকেই বোঝানো হত। এই মত এখনও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেকালে গদ্যসাহিত্য বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। সংস্কৃত কাব্য দুই প্রকার। যথা— শ্রব্যকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গুরুত্ব বেশি। অন্যদিকে দৃশ্যকাব্য হল দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক কালে যাকে নাটক বলা হয় তা দৃশ্যকাব্য রূপে পরিচিত ছিল। দৃশ্যকাবের অন্তর্গত রূপক ও উপরূপকের মধ্যে নাটকের শ্রেণিকরণে বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের নাটকীয় উপস্থাপনের

উপেক্ষিত দিকটি ন্যায়সহকারে বিচার করলে, নাট্যসাহিত্যের অবদমিত ইতিহাস খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে না। একটু কল্পনা করার সাহস এক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে। সময়ের এক বিরাট ব্যবধান বাঁধা হয়ে উঠলেও, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রমাণ এখনও একেবারে লোপাট হয়ে যায়নি; সাহিত্যিক নিদর্শনেই তা প্রোথিত রয়েছে। রাজকুমারীর ঘুম ভাঙানো প্রয়োজন এবং সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি সন্ধান করার সময় হয়েছে।

২:১ বাংলা নাটকের উদ্ভব সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা ও মত

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের অভাব নেই। অনেকে বলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর উৎপত্তি হয়, অনেকে থিয়েটারের সঙ্গে বাংলা নাটককে এক করে দেখার পক্ষপাতী; অনেকে আবার 'যাত্রা'-কে প্রাচীন ও প্রথম নাট্যরূপ বলে মনে করেন। এভাবেই কখনও লোকনাট্য, পালাগান, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য অথবা নিছক কাব্যরূপে নাটকের বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ মুছে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের দ্বারা ঋদ্ধ সংস্কৃতির সমান্তরালে বাংলার নাট্যসংস্কৃতির প্রবহমানতা কোথাও যেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্যের নায়িকাদের মতো উপেক্ষিত থেকে গেছে। অবহেলার সামগ্রী নাটক ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ যদিও শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। যুক্তিতে সত্যতা যতই থাক, সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে অনেক গবেষক-মন আজও দ্বিধাগ্রস্ত। সময় এসেছে প্রথাগত ধারণার পাশাপাশি একটি নতুন পাঠ তৈরি করার, যেখানে নাট্যসাহিত্যকে অন্য দৃষ্টিতে খুঁজে বের করার চেষ্টা থাকবে। অচলায়তনের দ্বার ভাঙবার সময় হয়েছে। যারা বাংলা নাটকের ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিতপ্রাণ, এই পাঠ হয়তো তাদের সমর্থনে একটি নতুন পৃষ্ঠার সংযোজন করতে পারে।

থিয়েটার থেকে বাংলা নাটকের সূচনা সম্পর্কিত ধারণা

'বাংলা নাটক! সে তো আমাদের ইংরেজদের কাছে ধার করা সংরূপবিশেষ। থিয়েটার করা তো তাঁদের কাছেই শেখা।' অনেক বাঙালির প্রাথমিক ধারণা হয়তো তাই। গবেষক, নাট্যতত্ত্ববিদ এমনকি পণ্ডিত ব্যক্তিত্বরাও বাংলা নাটকের সন্ধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পদার্পণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' ও 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ সমূহে বাংলা নাটকের সূচনা

কাল রূপে নির্ধারিত হয়েছে দুটি নাটকের সময়কাল। একটি গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত রচিত *কীর্তিবিলাস* (১৮৫২ খ্রি.) এবং অন্যটি তারাচরণ সিকদারের লেখা *ভদ্রার্জুন* (১৮৫২ খ্রি.) নাটক। নাটক দু'টির উল্লেখ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এর আগে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অনুবাদ নাটক রচনার প্রচেষ্টা থাকলেও ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দকেই বাংলা নাটকের সূচনাপর্ব রূপে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা নাটক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা স্পষ্টভাবে বুঝতে অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয়ের মত এখানে তুলে ধরা হল—

> ১৮৫৭ সালে বাংলা নাটকের যে গতি আরম্ভ হয়, সেই গতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে বহুকাল পর্যন্ত। লক্ষণীয় বিষয় হলো— একমাত্র 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ছাড়া এই সময়ে যে-সব নাটকের অভিনয়ের সূত্রপাত হয় তার প্রায় সবগুলিই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অথবা সংস্কৃত নাটকের অবলম্বনে লেখা নাট্যকর্ম। এর আগে বাংলায় নাটক বলে কিছু ছিল না। যা ছিল তা প্রধানত যাত্রা, কবিগান অথবা হাফ আখড়াই— তাও তেমন রুচিশীল প্রয়োগ নয়, অভদ্র অশ্লীল প্রবৃত্তির পুষ্টি হত তাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত বাঙালির কাছে তাই নাটক-রচনার তাড়না সৃষ্টি হলো।[১]

তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ধ্বনিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দী হল বাংলা নাটকের উৎপত্তিকাল। যাত্রা, কবিগান, হাফ আখড়াই প্রভৃতির মধ্যে নাট্যগুণ থাকলেও তা ছিল অভদ্র ও অশ্লীল রুচির মানুষের বিনোদনের সামগ্রীমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কেবলমাত্র রুচিশীলতার মাপকাঠিতে তাদের নাটক হতে বাধা। কিন্তু নাটক হয়ে ওঠার শর্ত কী কখনও শ্লীল-অশ্লীলের ঘেরাটপে আটকে থাকতে পারে? মনে হয় না এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য হবে। শালীনতার সঙ্গে নাটক হয়ে ওঠার সম্পর্ক নেই। এই যুক্তির সমর্থনে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর অশ্লীলতা সম্পর্কিত মত উল্লেখ্য—

> আধুনিককালে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা যে-কোনো আদিরসের বর্ণনাকে অশুচী ভাবতে শিখেছি। তাই আমাদের কাছে কালিদাসের কুমারসম্ভব, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলীর অংশবিশেষ এবং ভারতচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বলে মনে হয়। কিন্তু যুগভেদে মানুষের রুচিরও বদল হয়। আজ যেটা আমাদের কাছে অতিশয় ঘৃণ্য মনে হচ্ছে, একদা এ-দেশের কবি ও পাঠক কেউই তার প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেননি।[২]

এই যুক্তি বাৎস্যায়নের *কামসূত্র* গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও সত্য। ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্প কখনও অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হয়নি। সর্বোপরি শিল্প সংরূপের ক্ষেত্রে অশ্লীলতার যে সম্পর্ক নেই তা মন্দিরগাত্রে খোদাই করা মৈথুনমূর্তি প্রমাণ করে। ধর্মসাধনার পীঠস্থান মন্দির কখনোই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হতে পারে না। সেক্ষেত্রে নাটক হতে গেলে রুচিশীল এবং দৃশ্য বিভাজিত গদ্য সংলাপে পরিপূর্ণ থাকতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয় নি। এই অধ্যায়ে নাট্য-জাতিচ্যুত দেশজ সংরূপগুলির মধ্যে নাটকের সজল ধারা সন্ধানে সচেষ্ট থাকা হবে যা থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যাত্রা থেকে বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা

বাংলা নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে দ্বিতীয় সুপ্রচলিত ধারণা হল— 'যাত্রা প্রাচীন বাংলা নাটকের আদি নিদর্শন'। বাংলা নাটকের উৎস যাত্রার মধ্যেই নিহিত বলে ধরা হয়। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত উল্লেখ্য—

> প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ বিষয়ে দুইটি ধারা প্রচলিত— একটি সংস্কৃত নাটকের ধারা, আর একটি দেশীয় যাত্রার ধারা। উনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের পরিচয় লাভ করিল, তখন নিজের দেশের বিশিষ্ট এই দুইটি নাট্যধারার প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।[৩]

পাঠক সমাজে তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। তাঁর নাটক সম্পর্কিত ধারণা পরবর্তী কালে একরকম প্রতিষ্ঠিত অভিমত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যাত্রা সংরূপটির ক্রমবিকাশের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, কৃষ্ণলীলা বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীনতর যাত্রাসমূহ রচিত হইয়াছিল; কালক্রমে রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সম্পর্কেও এই রীতি অনুসরণ করা হয়—তাহার ফলেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ও ভাসান যাত্রাসমূহের উদ্ভব হয়।[৪]

এই মতের পুনরাবৃত্তি ধ্বনিত হয় অন্যান্য সমালোচকবৃন্দের কণ্ঠে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অজিত কুমার ঘোষ মনে করেন যে—

> মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, পালাগান প্রভৃতির মধ্যে যাত্রার অঙ্কুর বিদ্যমান ছিল।[৫]

অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল মহাশয়ও যাত্রাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন রূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে—

> আমাদের আধুনিক কালের নাটকের জন্মের আগে এদেশে যতপ্রকার অভিনেয় সাহিত্য ছিল, সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল 'যাত্রা'।[৬]

তাঁদের বক্তব্যে 'যাত্রা' থেকে অন্যান্য নাট্য-আঙ্গিকের সৃষ্টি বা যাত্রা-র অন্যান্য নাট্যসংরূপের আত্তীকরণ তত্ত্বটি পরোপুরি স্পষ্ট হয় না। অভিনয়যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগে প্রচলিত প্রতিটি শক্তিশালী সংরূপ (পাঁচালি, নাটগীতি, লীলানাট্য, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি) স্বমহিমায় বিকশিত না হয়ে কেন এক যাত্রার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তা যুক্তির নিক্তিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। যাত্রার মহিমা প্রকাশে এই তত্ত্ব বা অনুমানসাপেক্ষ সংমিশ্রণের তথ্যটি প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়াটা কতখানি যুক্তিযুক্ত

হবে, তা বিবেচনাসাপেক্ষ। তাছাড়া যাত্রাকে আদি নাট্যনিদর্শন বলা হলেও যাত্রাকে কি ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটক সম্পর্কিত ধারণায় একে নির্বিঘ্নে 'নাটক' বলা চলে? ভুলে গেলে চলবে না যাত্রার সঙ্গে পালা বা গান শব্দের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। সংরূপটিকে 'যাত্রা-পালা' বা 'যাত্রা-গান' বলা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে উপস্থাপনযোগ্য সমস্ত সংরূপেই গানের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। এই যুক্তি সমর্থনে অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ্য—

> দশম শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই বাঙলাদেশে ধর্মসংক্রান্ত পদাবলী জনসমাজে গীত হোত, আধুনিক কালের মতো পঠিত হোত না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই রীতি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোত। মন্দিরা মৃদঙ্গ, নূপুর ও চামর সহযোগে একাকী বা দলবদ্ধভাবে সমস্ত কাব্য-কবিতাই-যে গীত হোত—এই রকম কথা খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ লিখে গিয়েছেন। বস্তুত আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন থেকে দু'শ বছর আগে পর্যন্ত রচিত কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করা কোনোদিনই প্রচলিত ছিল না।...উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—নানা পাঠভঙ্গি অর্থাৎ গীতভঙ্গি সেখানে ব্যবহৃত হোত।[৭]

গান ছাড়া একধরণের নিরস উপস্থাপনকে তিনি সমর্থন করছেন না। তবে নাটকে যে চরিত্রের কথোপকথন থাকে তা কী সেই গানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে পারত? উনিশ শতকের আগে কি তাহলে সংলাপের অস্তিত্ব ছিল না? অবশ্যই ছিল। সংলাপও যে গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় তা যে কোনও পালার উপস্থাপন দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কাব্যে ও বিভিন্ন পদসংকলনে সংলাপের অপূর্ব ব্যবহার দুর্লখ্য নয়। মনে রাখতে হবে গদ্যসাহিত্যের চল বাংলা সাহিত্যে অনেক পরের ঘটনা। ভিন্ন চরিত্রের মুখে ভিন্নতর সংলাপ শোনার অভিজ্ঞতাও ঘটেছিল ইংরেজ আমলে। যাত্রাও সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কালক্রমে যাত্রাগানের সংরূপে পরিবর্তন এসেছে। অস্তিত্ব বজায় রাখতে পরিবর্তন করতে হয়েছে বলাটা অত্যুক্তি হবে না। কালক্রমে যাত্রাগানে সংলাপ হয়ে উঠেছে প্রধান সহায়। থিয়েটার দেখা অভিজ্ঞতায় যাত্রাকেই মনে হয়েছে একমাত্র সমতুল্য নাটক। তবে সংলাপ অংশ অনেক বর্ধিত হলেও তার মূল বৈশিষ্ট্য রূপে গানকে আজও 'যাত্রা' থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। তাই কেবলমাত্র যাত্রাকে প্রধান ও একমাত্র সংরূপ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাটা ভুল ও একপেশে বিচার করা হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সংরূপকে, বিশেষভাবে যেখানে নাটকের বৈশিষ্ট্য চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায় তাদের বাংলা নাটকের আলোচনা থেকে বাদ দেওয়াটা মোটেই সঙ্গত হবে না।

যাত্রাকে নাটক রূপে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় এসেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল ঊনবিংশ শতক কেন নাটকের উদ্ভবকাল রূপে চিহ্নিত হল? এবং এই মত (যাত্রা প্রাচীন নাট্যসংরূপ) প্রতিষ্ঠার প্রবণতা পণ্ডিতদের মধ্যে কেন বদ্ধমূল রয়েছে? কেন সেই সময় প্রচলিত দেশজ নাট্যমাধ্যমগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়? কখনও কুরুচিকর তকমা দিয়ে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-চর্চার পথ কেন বন্ধ করা হয়? আদতে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের আরাধনা এর জন্য দায়ী। বিশেষভাবে বলতে গেলে পাশ্চাতের প্রতি একরকম অন্ধ ভক্তি এখানে কাজ করেছে। এই মানসিকতা থেকে আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারা যায়নি। দেশীয় যা কিছু তা সবই অমার্জিত বলে আখ্যা দেওয়াটাও বোধ হয় সেকারণেই। যেভাবে স্থান-কালের কাণ্ড-জ্ঞান ছাড়াই ইংরাজি ভাষায় অভিব্যক্তি প্রকাশে আত্মগরিমা ও আভিজাত্য অনুভব করার প্রবণতা দেখা যায়; ঠিক সেভাবেই দেশজ সংস্কৃতি কখনও কখনও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষিত বাঙালির কাছে। দেশজ নাট্যসংরূপের আলোচনাক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটতে দেখা যায়।

শক্তিশালীর প্রতি অহেতুক ভক্তি প্রদর্শন বোধহয় মানুষের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যের একটি দিক। ইংরেজ একটি শক্তিশালী জাতিরূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান। তাদের থিয়েটার দেখে নাটকের সংজ্ঞা বদলে যাওয়া এবং দেশীয় নাট্য-ঐতিহ্য অবজ্ঞার চোখে দেখার মধ্যে যে প্রবণতা, তা শক্তিশালীর প্রতি অহেতুক ভক্তি রূপে চিহ্নিত করা কি অযৌক্তিক হবে? থিয়েটারের প্রভাবে ভরতমুণি প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটিও ক্রমেই ঝাপসা দেখায়, স্মরণে আসে না। ইংরেজি নাটক ও তার তত্ত্বের মাপকাঠি হয়ে ওঠে আদর্শ। অনেকটা আক্ষেপের সুরে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকে, তাঁহারা প্রধানত এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটককেই আদর্শ নাট্যরচনা মনে করিয়া, বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ রচনার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণও এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ইংরেজি সমালোচনা-পদ্ধতি দ্বারা বাংলা নাটকের মূল্য বিচার করেন। এই সম্পর্কে এই দেশীয় নাটক বিচারের যে পদ্ধতি আছে, তাহার কদাচ অনুসরণ করা হয় না।[৮]

তাঁর বক্তব্যে আক্ষেপের সুর ধ্বনিত হলেও বাংলা নাটকের উৎস নির্ণয়ে বোধ হয় সুবিচার করা হয়নি। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিসমাজ থিয়েটার দেখে, ইংরেজি তত্ত্বগ্রন্থ আউরে দেশজ নাট্যধারা নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন তাতে এক অর্থে বিদেশি আনুগত্যই প্রাধান্য পায়।

উনিশ শতকে লেখা নাটকগুলি বিষয়ের দিক দিয়ে দেশজ থাকলেও প্রকরণগত ভাবে তা থিয়েটারের মঞ্চে উপস্থাপনের কথা মাথায় রেখেই লেখা হয়েছে। সেই সময় যাত্রা ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। যাত্রাদলগুলি ভেঙে তৈরি হচ্ছে থিয়েটারের দল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত অনেকেই এভাবে থিয়েটারের জগতে পদার্পণ করেন। নগরসংস্কৃতির মান্যতা ও জনপ্রিয়তা পেতে কখনও থিয়েটারের অনুকরণে যুগোপযোগী হয়ে উঠতে দেশজ নাট্যসংরূপগুলি ক্রমেই বিবর্তিত হতে শুরু করে। যাত্রার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পড়লে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয়।

ইংরেজি নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে জানা যায়, গ্রীসদেশে দায়োনিসাস্‌ (Dionysus) দেবতার পূজায় যে সংগীতের (Dithyramb) প্রচলন ছিল তা থেকে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয়েছে। ওই দেবতার উৎসবে হাস্যপরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সংগীত (phallic song) থেকে কমেডি সৃষ্টি হয়। অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে নাটকের উৎপত্তি। *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে একেই 'অবস্থানুকৃতি' বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ নৃত্য ও সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুকরণের চেষ্টা করত। নাট্যবিশেষজ্ঞ ড. অজিতকুমার ঘোষের মতে—

> আদিম সমাজে নৃত্যের মধ্য দিয়ে লোকে ধর্মভাব এবং হৃদয়ভাব প্রকাশ করত, সমস্ত প্রকার ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। সঙ্গীত, তাল এবং সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়া এই নৃত্যের উদ্বোধনেই সাহায্য করিত। এই সঙ্গীতসম্বলিত ভাব-প্রকাশক নৃত্যই ক্রমে ক্রমে নাটকের অভিনয়ে পরিণতি লাভ করেছে। ভারতীয় নাটকের উৎপত্তিও এই নৃত্য হইতে হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।[৯]

ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল নাটক। আমাদের দেশে 'লোকনাট্য' রূপে পরিচিত নাট্যমাধ্যমের উৎপত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি থেকেই হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল; গ্রীস দেশের ধর্মীয় সংগীত থেকে পরিপূর্ণ নাটক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি এ দেশে সঙ্ঘটিত হয়নি। উনিশ শতকে নাটক লেখার ধরন কখনোই দেশীয় নাট্যপরম্পরায় সঞ্জাত নয়। বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের সূত্রপাত পাশ্চাত্যের অনুকরণ থেকেই। এক্ষেত্রে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতটি উল্লেখ্য—

> প্রত্যেক জাতির লোক-নাট্য (folk-drama) হইতেই তাহার নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে কেবলমাত্র যে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহাই নহে— ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে লোক-নাট্য হইতে নাটকের উৎপত্তি না হইয়া বরং লোকনাট্যই নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।[১০]

দেশজ নাট্যপরম্পরায় বিঘ্ন ঘটিয়ে অন্য দেশের সংস্কৃতিকে খোলশ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের ইতিহাস খুঁজে বের করা ও ক্রমবিকাশের পারম্পর্যে তা সাজানোর কাজ একারণেই বোধ হয় এতটা শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে।

'লোকনাট্য এক ধরনের কৌম সমাজের নাটক'

নাটকের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে তৃতীয় যে ধারণার সম্মুখীন হতে হয় তা শাস্ত্রীয় নাটক ও লোকনাট্যের ধারণা। শাস্ত্রীয় বলতে বোঝায় যা নাট্যশাস্ত্রকে আদর্শ করে রচিত হয়েছে। অর্থাৎ তা হল সংস্কৃত নাটক। লোকনাটক হল শাস্ত্রীয় মার্জনার বহির্ভূত। এই লোকনাট্য এখানে আলোচনার বিষয়। লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর *বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* বইতে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু ভৌমিক, মণি বর্ধন, ড. অজিত কুমার ঘোষ, ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যসহ প্রমুখ ব্যক্তিদের লোকনাট্য সম্পর্কিত সংজ্ঞা ও ধারণার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যেকের নির্ণীত সংজ্ঞা, উদাহরণ ও লোকনাট্যের ব্যাখ্যায় তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করেছেন। অন্যত্র তিনি স্বীকার করেছেন যে— লোকনাট্যের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত মেলেনি।[১১] এখানে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু ভৌমিক ও ড. শিশির মজুমদারের সংজ্ঞার একটি সম্মিলিত রূপ তিনি তুলে ধরেন—

> আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি লোকেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকেদের দ্বারা আদৃত মূলতঃ লোকবিষয়ক যে নাটক তাই হল লোকনাট্য। পৌরাণিক চরিত্র বা বিষয়ও লোকনাট্যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিতে লৌকিক হয়ে ওঠে।[১২]

এখানে লোকনাট্যের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলে, লোকনাট্য বলতে যা বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লোকনাট্যের উদ্ভব ধর্মীয় লোকউৎসব থেকে যা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক –এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত। অনুকরণমূলক যাদুক্রিয়া, কুলপ্রতীকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এর উদ্ভবের মূলে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। লোকনাট্য পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি নয় কিছুটা শৈথিল্যে ভরা। এর রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং তা মুখে মুখে প্রচলিত হয়। আলোকসম্পাতের সুযোগ এখানে নেই। সংগীতের প্রাচুর্য থাকায় সংলাপ হয় সংক্ষীপ্ত বা তাৎক্ষণিক। লোকোনাট্যে হারমনিয়াম, জুড়ি, মন্দিরা, বাঁশি এই ধরনের সীমিত সংখ্যক কয়েকটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ঘটে। লোকবিনোদনের

জন্য নৃত্য, গীত, অভিনয় এতে বিদ্যমান। কিছু ক্ষেত্রে মুখোশের ব্যবহার, পথ-পরিক্রমা, জনসংযোগ, সঙসাজা লোকনাট্যের অঙ্গ।

বারবার যে 'লোক' কথাটি বলা হচ্ছে তা আদতে কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই লোকনাট্য বলার যাথার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্তত নাটকের ইতিহাসে এই সংরূপটির যাথার্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'লোক' কথাটি ব্যাখ্যা করা জরুরি। 'লোক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ব্যক্তি'। কিন্তু 'লোকনাট্য'-এর লোক বৃহৎ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মতে—

> লোক-শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে সংকীর্ণ অর্থে নাগর শিক্ষা-সংস্কৃতি বহির্ভূত অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, বিশ্বাস-প্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথা চালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝায়।... লোক-অলোক ভেদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সৃষ্টি এবং সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি উচ্চস্তরের সামাজিকদের বিশেষ মনভাব হইতেই ইহার উদ্ভব। সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যেদিন লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল সেই দিন হইতেই লোক-কথাটি চলিয়া আসিতেছে।[১৩]

লোক বলতে সমাজের এমন অংশকে বোঝানো হয় যারা কমবেশি একই ধরনের বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি মেনে চলে। এদের মধ্যে প্রচলিত নৃত্য, বাদ্য, সংগীতসমন্বিত নাট্যমাধ্যমকেই নগর-সংস্কৃতি 'লোকনাট্য' বলে চিহ্নিত করে। 'লোক'-এর ধারণা বা লোকোনাট্যের সংজ্ঞা নিয়ে সাহিত্যমহলে বিবিধ যুক্তিতর্ক থাকলেও, সকলেই একমত যে তা নগর-সংস্কৃতির আরোপ করা সংরূপ বিশেষ। শ্রেণিকরণটা শহুরে-মানুষের হাতেই হয়েছে।

যারা আদিম সঙ্গবদ্ধ কৌম-সমাজে বিশ্বাসী মানুষ, তারা নিজেরা কখনোই সংরূপগুলির শ্রেণিকরণ করেনি। শ্রেণিকরণ করেছে শিষ্টমনভাবাপন্ন শহুরে মানুষ। মনে রাখতে হবে সঙ্গবদ্ধ-সমাজের অন্তর্গত মানুষের কাছে তাদের সংস্কৃতি কোনও পৃথক বস্তু নয়, তা জীবনযাপনের অংশ; কখনও বিনোদনের উপায়বিশেষ, আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম। নাগরিক হবার আভিজাত্যপূর্ণ মনোভাবের কারণে, আজ লোকের অর্থাৎ অন্যের সংস্কৃতি বলে যে মানুষগুলিকে রুচির বিচারে আলাদা করে রাখা হয়েছে, সেই সমাজব্যবস্থার উপরেই এই শহরের ভিতটা যে দাঁড়িয়ে আছে, এই সহজ সত্য বিস্মৃতপ্রায়। এক্ষেত্রে বেঞ্জামিনের শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) তত্ত্বের বাস্তবায়নের কথা মাথায় রাখলেও গ্রাম-শহরের দ্বৈত-ধারণার পরিস্ফূটন ঘটে। আদিম যাযাবর মানুষ অরণ্যজীবন ত্যাগ করে ধীরে ধীরে

পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনে গ্রামীণ-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। শিল্পের হাত ধরে ব্যবসায়িক শিক্ষায় দীক্ষিত মানুষ নগর পত্তন করেছে যার অবয়ব বৃদ্ধির রসদ জুগিয়েছে গ্রাম। আধিপত্য ও আভিজাত্যের ধর্ম ভীষণ ছোঁয়াচে। গ্রামীণ-লোকাচার একদিন সকলের মজ্জাগত ছিল এই সহজ সত্য মেনে নিতে সকলেই নিস্পৃহভাবের পরিচয় দেন। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব মেনে আজ সেই স্মৃতি অব্যবহারের ফলে লুপ্তপ্রায়। যে সংস্কৃতি আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল তা লোকসংস্কৃতি বলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার নাট্যসংরূপগুলির নাটক রূপে পরিগণিত হতে বাধা পায় কেবল একপেশে মানসিকতায়। দীর্ঘদিনের চর্চাকে ভিন্নভাবে দেখাতে আপত্তি এখানে বড় হয়ে ওঠে। নতুনকে চট করে মেনে নেওয়াটা যে দস্তুর নয়। পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে দেখতে বা রুচিহীন বলে দূরে সরিয়ে রাখতে কুণ্ঠাবোধ হয় না। তাই নাটক না বলে ‘লোকনাট্য’ বলার ক্ষেত্রে আপত্তির জায়গা তৈরি হয় এই মেনে না-নেওয়ার প্রবণতায়।

লোকনাট্যের উদাহরণ রূপে পাওয়া যায় বনবিবির পালা, বোলান গান, গম্ভীরা, মঙ্গল গান, ঝুমুর, ছৌ, আলকাপ, চোর-চুরণী, কুশান, খনের গান, পুতুল নাচ, যাত্রা ইত্যাদির পরিচয় পাই। যদিও সবগুলিকে লোকনাট্য বলে অনেকেই স্বীকার করেননি। যেমন যাত্রা ও পুতুল নাচকে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকনাট্যের স্বীকৃতি দেননি।[১৪] অন্যদিকে ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য যাত্রার প্রাথমিক অবস্থায় একে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।[১৫] নাট্যগুণ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংরূপকে শ্রেণিকরণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তা বাদ পড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল বাদ পড়ে যায় কোথায়? আদতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে নাটক রূপে মেনে নিলে আর কোনো সংরূপকেই বাদ পড়তে হয় না। তবে কী বাঙালি জাতি নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার উপায় খোঁজ করেনি? অবশই করেছে। কিন্তু উনিশ শতকীয় নাটক সংরূপের সন্ধান করলে তা কখনোই পাওয়া যাবে না। এপ্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> কিন্তু প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালীজাতির নাট্য-পিপাসা কিসে মিটিয়াছিল? আমার বিশ্বাস, আমাদের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি এবং আমাদের রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিই নানাভাবে আমাদের এই নাট্যপিপাসা মিটাইয়াছিল। এইগুলির ভিতর দিয়া আমাদের নাট্য-পিপাসা নানাভাবে চরিতার্থ হইতেছিল বলিয়াই হয়ত আমরা আর পৃথক্ ভাবে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করি নাই।[১৬]

বেশ জোড়ালোভাবেই নাটক উপস্থাপিত হত। উপস্থাপনের দিক দিয়ে নাট্যগুণান্বিত কী না তার বিচার আবশ্যক। তবে কেন এই ভেদভাব করা হবে? প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ এমনকি আধুনিক যুগেও উপস্থাপনের মধ্যে নাট্যগুণের বিচারে নাটক রূপে মেনে নিলে এই সমস্যা আর থাকে না। শুধু থিয়েটারের তিন দিক ঘেরা একমুখী মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নতুনভাবে আসরকেন্দ্রিক নাটকের ইতিহাস খুঁজতে হবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যসম্ভারে এর অসংখ্য প্রামাণ্য দলিল খুঁজে পাওয়া যাবে। অজস্র নাট্যসংরূপ কেবলমাত্র স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সেই অবহেলিত নাট্যসংরূপের সন্ধান করতে গিয়েই হয়তো পদাবলী এবং লীলাকীর্তনের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।

২:২ বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত নাট্যসংরূপ

প্রাচীন কাল থেকেই লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের উপর ভর করে আধ্যাত্মিক ও প্রেমমূলক ভক্তি আখ্যানের পাশাপাশি সামাজিক নানাবিধ গল্প-কাহিনি হয়ে উঠেছিল নাটকের বিষয়বস্তু। তবে এগুলি নাটক নামে হয়তো পরিচিত ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও সেগুলি ছিল নাট্যগুণে ভরপুর। নাট্যগুণের বিচারেই এদের এক সাড়িতে দাঁড় করানো যায়। ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এর আধার। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস একান্তভাবে অন্তরের সামগ্রী বিশেষ। ধর্মীয় (বিশেষ ক্ষেত্রে ঈশ্বর ব্যতীত গোষ্ঠীর বিশ্বাস ধর্ম হয়ে ওঠে) কৃত্যানুষ্ঠানকে আজও বাদ দেওয়া যায়নি উপস্থাপন (performance) থেকে। এখানেই থিয়েটার থেকে বাংলা নাটকের ধারা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানে এর সূচনা হলেও, উনিশ শতকের থিয়েটার যেমন করে ধর্মের ছায়া থেকে আলাদা হতে পেরেছিল (আখ্যান ও কৃত্য থেকে পৃথকীকৃত চরিত্রাভিনয় রীতির প্রচলন) সেভাবে কখনোই দেশীয় উপস্থাপনরীতি নিজেকে ধর্মীয় বিষয় ও রীতি (গান, পাঁচালি, লীলা, নাটগীত, গম্ভীরা, আলকাপ, গাজীর গান, মঙ্গলনাট ইত্যাদি) থেকে বিচ্যুত হয়নি। সুতরাং কৃত্যানুষ্ঠান ব্যতীত নাটক উপস্থাপনের কথা ভাবাই যায় না। বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতে— আমাদের জনপদে নাটক এসেছিল কৃত্যের ছদ্মবেশে।[১৭] এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মত হল—

> বাংলা নাটক বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত গেয় সাহিত্য— বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত। আর এই গেয়রীতির মধ্যেই দানা বেঁধেছিল নাট্যরীতি। এই নাট্যরীতি নাচ ও গান-আশ্রয়ী। তাই প্রাচীন কোনো কাহিনী সভায় নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে অভিনীত হোতো। অভিনয় যারা করত তারা হলো নট।[১৮]

প্রধানত মৌখিক রীতিতে সৃষ্ট, কাব্যিক সুষমাপূর্ণ উপস্থাপনই ছিল এর বৈশিষ্ট্য; পাশ্চাত্যের উপস্থাপনভঙ্গীর সঙ্গে মেলালে বাংলা নাটকের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এক্ষেত্রে বিধেয়। বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলায় মেতে থাকাটা গৌরবের কিছু নয়। এক্ষেত্রে বাঙালির হারানো নাটকের ইতিহাস পুনরুদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়া ভীষণ জরুরি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য সংস্কৃতিতে 'নাটক' কথাটা অপ্রচলিত হওয়ার কারণ হয়তো এতেই নিহিত। প্রাচীনকালে নৃত্য, গীত ও নাটককে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা হত না। বরং একে অপরের পরিপূরক রূপে ভাবা হত। নৃত্যের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক কতটা নিবিড় তা অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর মতে—

> প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা। কিন্তু এই নাটকের কী ছিল রূপ এবং নৃত্যগীতের কী ছিল স্থান, বলিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃত্য ছাড়া নাটক ছিল না; কাজেই বুদ্ধ নাটকই হোউক আর তুম্বুরনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই।[১৯]

চর্যাপদ-এ বীণা পা রচিত ১৭ সংখ্যক চর্যায় 'বুদ্ধ নাটক'কে নাটক বলা হয়েছে তবে তা নৃত্যগীতের আঙ্গিকের দিক থেকে। প্রাচীন বাংলায় এই নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যের সম্পর্ক কেমন ছিল তার পরিচয় সন্ধান করাটা নাটকের ইতিহাস খোঁজার সামিল হবে।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে 'প্রবৃত্তি-ব্যঞ্জক' অধ্যায়ে দেশ, বেশ, ভাষা ও রীতি অনুসারে অঞ্চলভেদে চার ধরনের বৃত্তি-আশ্রিত নাট্যের কথা বলা হয়েছে।[২০] এর মধ্যে ওড্র-মাগধী (চতুর্থতম) নাট্যপ্রবৃত্তি যেসব অঞ্চলে সেকালে প্রচলিত ছিল বলে ভরত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে বঙ্গের ('বঙ্গা' শব্দটি ব্যবহৃত) নাম পাওয়া যায়।[২১] *নাট্যশাস্ত্র*-এ উল্লেখ রয়েছে ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তি 'ভারতী' ও 'কৈশিকী' বৃত্তি আশ্রিত।[২২] কৈশিকী বৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে— বহুনৃত্তগীতবাদ্যা কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুরমধুরললিতাঙ্গাভিনয়শ্চ।[২৩] অর্থাৎ বঙ্গে ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তির কৈশিকী বৃত্তিতে বহুজন মিলিত হয়ে 'নৃত্ত', গীত ও বাদ্যের সহযোগে মধুর ললিত অঙ্গাভিনয়ের প্রচলন ছিল। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে এই মিশ্র বৈশিষ্ট্য (নৃত্ত, গীত, বাদ্য) আজও বিভিন্ন নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে 'নৃত্ত' শব্দটির উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত, যা নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যেও পূর্বে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে ভরত

মুণি কর্তৃক 'নাট্য', 'নৃত্ত' ও নৃত্য —এই তিনটি শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। তিনটি শব্দই 'নৃৎ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। নাট্যশাস্ত্রের অনুবাদক ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> নৃত্ত শব্দে বোঝায় নাচ (dance); এটি তাললয়াশ্রিত। নৃত্য শব্দে বোঝায় অনুকরণাত্মক অঙ্গভঙ্গী (mime); এটি ভাবাশ্রয় শেষোক্ত দুইটি গীত ও সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাট্যের সৃষ্টি করে। নাট্য রসাশ্রিত; এখানেই নৃত্ত ও নৃত্য অপেক্ষা এর স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ।[২৪]

The Mirror of Gesture গ্রন্থে এই শব্দত্রয়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

> The sages speak of Natya, Nrtta and Nrtya. Natya is dancing used in drama (nataka) combined with the original plot. Nrrta is that form of dance which is void of flavour (rasa) the mood (bhava). Nrtya is that form of dance which possesses flavour, mood, and suggestion (rasa, bhava, vyanjana etc), and the like.[২৫]

সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থে নৃত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> করণ, চারী, মন্ডল, স্থানক, অঙ্গহার প্রভৃতি এবং সমুচিত গীত-বাদ্য-লয়-তাল-কলা-অভিনয়-রস-ভাব এই সবকিছু নিয়ে নৃত্য।[২৬]

নাট্যকার সেলিম আল দীন বলেছেন—

> নৃত্ত হলো ছন্দে তালে সাধারণ অঙ্গভঙ্গি। এ হচ্ছে জননন্দিত লৌকিক নাট্যাভিনয়। এতে নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত মার্গীয় মুদ্রারীতি অনুসৃত হয় না। 'নৃত্ত' শব্দটি কৈশিকী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় প্রাচীনকালের ওড্র-মাগধী নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। প্রাচীন বাঙলার যে ক'টি নাট্যরীতি এ যাবত আবিষ্কৃত হয়েছে, দেখা যায় যে, সেগুলো লৌকিক নাট্যাভিনয়রীতি অর্থাৎ 'নৃত্তে'র আশ্রয়ী।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনার বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে *নাট্যশাস্ত্র*-এর কালে (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী) এবং তার পূর্বে বাংলা তথা বাঙালির নিজস্ব নাট্যরীতির অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। *নাট্যশাস্ত্র*-ই তার প্রমাণ রেখেছে। এখনও প্রাচীন সেই নাট্যমাধমের ঐতিহ্য প্রবহমান। গান, নাচ, অভিনয় বাদ্যের সুললিত কাব্যিক সুর কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেনি কোনো হুন, তুর্কি, পাঠান, মোগল কি ব্রিটিশ শাসন। সাহিত্যের পাতায়-পাতায় এর দলিলীকরণ ঘটেছে। কিন্তু এর স্বরূপ ছিল ভিন্ন। এখনকার চিন্তা চেতনায় সেই সময়ের প্রবহমান নাট্য ঐতিহ্য কিছুটা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। এক সূত্রে বাধা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই আলোচনাপর্বে আদি-মধ্যযুগে প্রাপ্ত গ্রন্থাদিতে নাট্যধর্মীতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করা হবে। এর সূচনা প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন *চর্যাপদ* থেকে হলেই বোধ হয় ঔচিত্যবোধের মাত্রা সমপরিমাণে বজায় থাকবে।

চর্যাপদ ও ‘বুদ্ধ নাটক’

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় *চর্যাপদ*-কে। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সাধন পদ্ধতির সূত্র প্রকাশক গান হিসেবে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। এতে গানের বাণীতে গুহ্য সাধনতত্ত্বের কথা বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনা ও কাহিনির মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। এদিক দিয়ে *চর্যাপদ*-কে নাট্যবৈশিষ্ট্যমূলক গান হিসেবে শনাক্ত করা কঠিন নয়। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় চর্যায় উল্লিখিত বুদ্ধ নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

> নৃত্য ও গীতের সাহয্যে এক ধরণের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়েই বোধ হয় কোনও বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে?) রূপদান করা হইত।[২৮]

এর নাট্যমূলক গানে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কিছু ধর্মীয় আচরণ-বিধির ইঙ্গিত দেওয়া হলেও পদকর্তাগণ সমসাময়িক কালের মানুষের জীবনযাপনের এক চিত্তাকর্ষক ছবি এঁকেছেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নৃত্য ও গীত এবং উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সমূহের গঠনশৈলী, সুর, তাল, লয়, ধ্বনিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নাটক ও নাট্যপরিবেশনরীতি সম্পর্কেও শিল্পসম্মত বিবরণ চর্যায় পাওয়া যায়।

চর্যার বিভিন্ন পদ থেকে প্রাচীন বাংলার লোকায়ত সমাজে প্রচলিত ‘বুদ্ধ নাটক’ পরিবেশনার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বীণা পার ১৭ সংখ্যক পদটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হই।। ধ্রু।।[২৯]

অর্থাৎ বাজিল (হে বজ্র) নাচছেন এবং দেবী (নৈরামণি) গাইছেন। বুদ্ধ নাটক একেবারে উল্টোভাবে অভিনীত হত। ‘বিসমা’ কথাটির দিকে বিশেষ মনযোগ দিলে বোঝা যায়, এর অর্থ ‘সমান নয়’ বা ‘বিপরীত’। সচরাচর পুরুষ গান করেন এবং নারী সেই গানের তালে তালে নৃত্য করে থাকেন (যেভাবে *গীতগোবিন্দ*-এর কবি জয়দেব গাইতেন ও তার স্ত্রী পদ্মাবতী নৃত্য করতেন)। কিন্তু বুদ্ধ নাটকে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে নারী গাইতেন ও পুরুষ নাচতেন। বুদ্ধ নাটকের ক্ষেত্রেই যে তা বিশেষভাবে পালন করা হত তা ‘বিসমা’ শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট। স্বাভাবিকের ব্যতিক্রমে অভিনীত হত। এ থেকে দু’টি বিষয় স্পষ্ট— এক, বুদ্ধ নাটক উপস্থাপনে অভিনব পন্থার ব্যবহার সকলের অজানা ছিল না। দুই, সেই

সময় প্রচলিত নৃত্যগীতময় উপস্থাপনে নারী-পুরুষ উভয়েরই বিশেষ স্থান ছিল যা বুদ্ধ নাটকে সর্বত্র অনুকরণ করা হত না।

বুদ্ধ নাটকের সর্বত্র যে 'বিসমা' অবস্থান পরিলক্ষিত হত এমনটা একেবারেই নয়। ১৭ সংখ্যক পদে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাতিক্রমী ঘটনা। ১০ সংখ্যক চর্যায় নৃত্যপটিয়সী নিম্নশ্রেণির এক ডোম্বীর নৃত্যকলা এর প্রমাণ রূপে উল্লেখ্য—

এক সো পদমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।। ধ্রু।।[৩০]

অর্থাৎ চৌষট্টি পাপড়ির এক পদ্ম, তাতে চড়ে বাউলী ডোম্বী নৃত্য করছে। নৃত্যগীতের সঙ্গে জীবনজীবিকা কীভাবে ওতপ্রোত যুক্ত ছিল তার যুক্তি অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন—

> অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নৃত্যগীতের কথা চর্যাগীতের বহু জায়গায় আছে। ডোম কাপালিক নট ইত্যাদি জীবিকার এবং জাতির লোকেদের মধ্যে নৃত্য করা কিংবা গীত-বাদ্যের সমাদর করা খুবই প্রচলিত ছিল মনে হয়। সেই সময় বাঙালী সমাজের নিম্ন স্তরে এমন এক ধরনের লোক বোধ হয় ছিল, যারা নাচগান করেই জীবিকা নির্বাহ করত।[৩১]

১০ সংখ্যক চর্যাতেই নাট্যপারদর্শী কাপালিক কাহ্নপাদের পরিচয় পাওয়া যায়; যে কিনা নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর আসঙ্গলিপ্সায় নটের সজ্জা ছেড়ে দিতে চাইছে, তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া[৩২] বলে। এই 'নড়এড়া' শব্দটি কোথাও 'নড়পেড়া' রূপে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন। মুণিদত্তের টীকায় 'নটবৎ সংসারপেটকং'-এর উল্লেখ আছে যার অর্থ সংসার রূপ নটপেটিকা। নড়এড়া বা নড়পেড়া বা নটপেটিকা শব্দের বিশ্লেষণে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসামগ্রীর কথা উঠে আসছে যা বুদ্ধ নাটকে 'নট' জীবিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

নীম্নশ্রেণির মধ্যে 'নট' জীবিকার প্রচলন থাকলেও উচ্চবর্ণের মানুষেরাও যে এই পেশাকে অবহেলা করেনি তার প্রমাণ মৈথিল কবি জয়দেব ও পদ্মাবতী। এই নটপেটিকায় থাকত নাট্যাভিনয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন সরঞ্জাম ইত্যাদি। নটপেটিকায় সাজপোষাক রক্ষণাবেক্ষণ করা পেশাজীবীদের পক্ষেই সঙ্গত। সেকালে নিম্নবর্ণের নারীপুরুষেরা নৃত্যগীতাভিনয়ের জন্য যে নানাস্থানে যাতায়াত করত

তার পরিচয়ও পদটিতে রয়েছে। অধ্যাপক মহুয়া মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলার নাট্যাভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন—

> প্রাচীন বাংলায় সুসজ্জিত রথে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীদের স্থাপিত করে রাজপথে সভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হত। নৃত্যগীত এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক যাত্রা, অভিনয় ও ক্রীড়াকৌতুকাদিও অনুষ্ঠিত হত।[৩৩]

ধর্মীয় কারণে নৃত্যগীতমূলক শোভাযাত্রা বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তাতে ধর্মের ভেদাভেদ কাজ করেনি। প্রতিটি *চর্যাপদ*-এর আর কোনো নির্দেশ থাকুক না থাকুক রাগরাগিণীর উল্লেখ বেশ স্পষ্ট। মল্লার, মালশ্রী, বঙ্গালী, গবড়া, ধনসী, পটমঞ্জরী, কামোদ ইত্যাদি মোট ১৬টি রাগ রাগিণীর উল্লেখ প্রতিটি চর্যার শুরুতেই সিদ্ধাচার্যরা দিয়েছেন। প্রতিটি চর্যায় যেমন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনই ধুয়া বা ধ্রুবপদের (ধ্রু) উল্লেখ প্রায় দু'টি পদের পর পর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। গায়ক ও শ্রোতার বুদ্ধি ও দৃষ্টি আকর্ষণে ধুয়ার ব্যবহার মধ্যযুগীয় দোহার যুক্ত দলবদ্ধ উপস্থাপনরীতির মধ্যে একটি। অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়া মহাশয়ের উক্তিটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> গবেষক বর্ণিত চর্যাপদের এই ধূয়া গায়ন রীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের কীর্তন ও বাউল গানের গায়ন পদ্ধতির মিল থাকা অসম্ভব কিছু নয়।... চর্যার পদগুলি বাংলা কীর্তনের আদি বা প্রাচীনতম নিদর্শন।[৩৪]

বর্তমান সাহিত্যসমালোচকের কাছে তাঁর শেষের কথাটি অনেকটা অত্যুক্তির মতো শোনালেও সত্যতা যে নেই, তা জোরের সঙ্গে বলা যাবে না। তাঁর বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহাশয়ের কথায়। তিনি কীর্তনের সময়কাল সম্পর্কে বলেছেন—

> অনেকের অভিমত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত নামগান বা নামকীর্তনই ঠাকুর নরোত্তমদাস-প্রবর্তিত রসকীর্তনরূপ রাধাকৃষ্ণলীলাসম্পৃক্ত পদাবলী-কীর্তনের উৎস বা উত্তরসূরী। কিন্তু তা ঠিক নয়, কেননা বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী ও সঙ্গে সঙ্গে কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ'-পদগানের রসলালিত্যপূর্ণ রচনা ও প্রকাশভঙ্গীর তুলনামূলকভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায়, কীর্তনগানের রূপ ও শৈলী নবম-দশম শতকে প্রচলিত বজ্রযানী ও সহজযানী বৌদ্ধাচার্যদের অভিপ্রায়িক সন্ধ্যাভাষায়রচিত মিষ্টিক চর্যাপদগান ও বজ্রগানও কীর্তনগানের উৎসস্থল।[৩৫]

বাংলায় কীর্তন গায়নরীতির প্রচলন যে আকস্মিক কোনও ঘটনা হতে পারে না সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হবেন। *চর্যাপদ*-এর যুগ অতিক্রম করে *গীতগোবিন্দ* তথা ভক্তিসাহিত্যে ঋদ্ধ পদাবলী সাহিত্য ও পাঁচালি কিংবা একান্ত মানবপ্রেমের আখ্যান *মৈমনসিংহ গীতিকা*-য় সে উপস্থাপনভঙ্গি সঞ্চারিত হওয়াটা

অমূলক নয়। রাগরাগিণী, ধুয়ার ব্যবহারে গীত-নৃত্য-বাদ্য সহযোগে, নাটকীয় উপস্থাপন-বৈশিষ্ট্য দিয়ে এদের এক সূত্রে গাঁথা যায়।

চর্যাপদ-এ নৃত্যাভিনয়ে ব্যবহৃত আহার্যের (সাজ-অলঙ্কার) অনুষঙ্গ ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ১১ সংখ্যক পদে 'নেউর' বা নূপুর এবং 'ডমরু'র উল্লেখ পাওয়া যায়। নৃত্যকালীন অঙ্গাভরণ 'কুণ্ডল' ও 'মুত্তিহার'-এর (মুক্তাহার) অস্তিত্ব সেকালের অভিনেয় রূপটি পরিস্ফুট করে তোলে। এ ছাড়াও ১৭ ও ১৯ সংখ্যক পদে 'হেরুঅ বীণা' (হেরুক বীণা), 'পড়হ' (পটহ), 'দুন্দুহি' (দুন্দুভি), 'কর' (ঢোল), 'মাদলা' (মাদল), 'কশালা' (কাশি) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তিব্বত থেকে সংগৃহীত সিদ্ধাচার্যদের রেখাচিত্রগুলো অবলম্বনে প্রাচীন বাংলার নাট্যরূপটি স্পষ্ট হয়। বুদ্ধ নাটকে নারী-পুরুষের যে সংগীত ও নৃত্যের কথা বলা হয়েছে এই চিত্রগুলি যেন তারই বিবৃতি দেয়। রেখাচিত্রে আঠারোজন সিদ্ধাচার্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের বিশেষ ভঙ্গিমায় অবস্থান, হাতের মুদ্রা, বাদ্যবাদনরত রূপ সেই সময়ের নৃত্য-নাট্য-বাদ্যের সম্মেলক অস্তিত্বের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়া মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ্য—

> এই পর্যায়ে রেখাচিত্রে কাহ্নপাকে নৃত্যের ভঙ্গিতে দেখে এবং তার রচিত পদমধ্যস্ত নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গকে মাথায় রেখে কাহ্নপাকে প্রত্যক্ষভাবেই নৃত্য-গীত বা প্রাচীন বাংলার নাট্য সংশ্লিষ্ট বলে অনুমান করা যায়।[৩৬]

রেখাচিত্রের পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পের মাধ্যে নৃত্য-নাট্য ভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায়। পাহাড়পুর ও ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও পাথরের মূর্তিতে রয়েছে নৃত্যমগ্ন নারী-পুরুষের প্রতিকৃতি। অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়া পাহারপুরের বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধধর্ম সংশ্লিষ্ট লোকজীবনের চিত্রের পাশাপাশি কৃষ্ণলীলা, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থের আখ্যানবস্তুর ঐশ্বর্যহীন অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[৩৭] নির্মাণশিল্পীরা তাদের পারিপার্শ্বিকের ছাপ যে শিল্পে রাখবেন তা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই স্বাভাবিক ঘটনায় উঠে আসে সেই সময়ের জনপ্রিয় লোকবিনোদনের সামগ্রী যাতে নাট্যাভিনয়ের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার বাদ্যের (পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) পরিচয়ও এর থেকে পাওয়া যায়। এসব প্রামাণ্য দলিল খুব সন্তর্পণে কালের প্রবাহে সেযুগের নাটকের অস্তিত্ব মুছে যেতে দেয়নি।

এরপর আসা যাক *চর্যাপদ*-এর যুগে রঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চের প্রসঙ্গে। পাহারপুর বৌদ্ধবিহারে বিরাট হলঘরের (৫৩x৪৭ ফুট বড় হলঘর এবং ৩৭x২৪ ফুট ছোট হলঘর) উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন সাইমন জাকারিয়া তাঁর *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক* বইতে।[৩৮] এখানে হলটির বিবরণ থেকে সেযুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে নাট্য উপস্থাপনের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হলঘর যে নাট্য উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হত তাতে সন্দেহ নেই। অন্যত্র মঞ্চ প্রসঙ্গে তাঁর মতটি উল্লেখ্য—

> বুদ্ধ নাটকের অভিনয় স্থান বা মঞ্চ সম্পর্কে চর্যাপদে সুস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে, বিভিন্ন পদে উদ্ধৃত নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিবেশন, তথা নাট্যাভিনয়ের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, এই নাটক অবশ্যই সমতল ভূমিতে দর্শক সম্মুখে অভিনীত হতো। এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত অভিনয় স্থানের চতুর্দিকে দর্শকদের অবস্থান থাকত।[৩৯]

তাঁর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে মঞ্চের বিচার করলে দেখা যায়, বুদ্ধ নাটকের মঞ্চের সঙ্গে প্রথাগত দেশজ নাটকে ব্যবহৃত মঞ্চের একটি সাজুয্য রয়েছে। পরবর্তী পদাবলী কীর্তন বা রামকীর্তন কী মঙ্গলগান প্রভৃতি উপস্থাপনের মধ্যে এই মাটিতে চৌকো মঞ্চের নির্মাণ ও তাকে ঘিরে দর্শকবৃন্দের অবস্থানগত ঐতিহ্যের সাদৃশ্যই লক্ষ করা যায়।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণসিঞ্চনকারী আদিগ্রন্থ রূপে দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*-এর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। কাব্যটিতে মোট চব্বিশটি গান ও আশিটি শ্লোক পাওয়া যায়। এই সব গানে সবসুদ্ধ বারোটি রাগ আর পাঁচটি তালের উল্লেখ আছে। যেমন— গুর্জরী, রামকিরী, দেশব্রাড়ী, বসন্ত, মালবগৌড়, কর্ণাট, দেশাখ, গোন্ডকিরী, মালব, ভৈরবী, বারাড়ী এবং বিভাস ১২টি রাগ। একতালী, রূপক, পদগুলি যতি, নিঃসার, অষ্টতাল- এই ৫টি তালে গাওয়া হত। পদাবলী কীর্তনে *গীতগোবিন্দ*-এর প্রভাব যে কতখানি তা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট ধ্বনিত হয়। তাঁর মতে—

> "বদসি যদি কিঞ্চদপি" গানটি এখনও কোনও কোনও কীর্তনীয়ার মুখে অষ্টতালেই গাইতে শোনা যায়। অষ্টতালের অন্তর্গত আটটি বিভিন্ন তালের নাম—আড়, দোজ, জ্যোতি (বা যতি), চন্দ্রশেখর, গঞ্জন, পঞ্চ, রূপক ও সম। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সঙ্গীতশাস্ত্রে এই সব তালের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে কীর্ত্তনের আসরে তা অপরিচিত হয়ে পড়েনি।[৪০]

রাগ ও তালের পটুতায় এই কাব্য পরবর্তী বাংলা কাব্যকে বিশেষভাবে পদাবলী সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কাব্য যে কতখানি নাট্যসম্ভাবনাময় তার ইঙ্গিত দুষ্প্রাপ্য নয়। জয়দেব দশাবতার

বর্ণনার পরে প্রথম সর্গে[৪১] *গীতগোবিন্দ*-কে 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' (মঙ্গলাচরণ বা মঙ্গল গান) রূপে উল্লেখ করায় এবং 'বয়ম' (বহুবচনে ব্যবহৃত) শব্দের প্রয়োগ দেখে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

> সুতরাং এখানে "বোয়ম" মানে তাঁহার গীতিনাট্যের গায়ক-বাদক-দল। মঙ্গল-গানের ও কীর্তন-পদাবলীর আসরে মঙ্গলাচরণ করিয়া মূল পালা আরম্ভের আগে গায়ন-বায়ন সকলে মিলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই।[৪২]

কীর্তনের উত্তরাধিকার এর আগে চর্যাপদেও লক্ষ করা গেছে। এই বক্তব্যে *গীতগোবিন্দ* কাব্যের মধ্যেও সেই উপস্থাপনরীতিই লুকিয়ে আছে; যার ফলে বারংবার পদাবলী কীর্তনের প্রসঙ্গ চলে আসছে। তাহলে কী কীর্তনের মধ্য দিয়ে সেই উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যের চরম উৎকর্ষ ঘটেছে? এই প্রশ্ন গবেষকের মনে ওঠাটা অবান্তর নয়। এক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতটি উল্লেখ্য—

> তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমনই এক সময়ে যখন বাংলাদেশে ভাগবতধর্মের ছিল লীলাচঞ্চল যৌবনকাল। জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বের প্রচারব্রত নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একদিক থেকে বলা যায় বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের পটভূমিকা-রচনার সূচনাও হয়েছিল ঠিক তখন থেকে বাংলাদেশে। যদিও চর্যাগীতির অবদান পদকীর্তনের ভাণ্ডারে কম নয়।[৪৩]

ধরে নেওয়া যেতে পারে চর্যার কাল থেকে পদসাহিত্য উপস্থাপনের একটি বিশেষ পন্থা ধর্ম নির্বিশেষে পালিত হত। প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান নাট্য উপস্থাপনের বিশেষ রীতির জনপ্রিয়তার পালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যেন বাতাসের কাজ করে। ধারাবাহিক পথে গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যের জোয়ারে বাংলার মানুষ যে চৈতন্যের আবির্ভাবের আগেও মাতোয়ারা ছিল, তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

একক নয়, সম্মিলিত উপস্থাপনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়েছে *গীতগোবিন্দ* কাব্যে। এই নাট্যসংরূপ নাটগীত নামে পরিচিত। নাটগীত সংগীতময় নৃত্যসংবলিত নাট্য-উপস্থাপনা। এতে দহার (পরাসর ও অনেকে), বাদ্যকর ও নৃত্যপটিয়সী (পদ্মাবতী) সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করে দলের অধিকারী বা মূলগায়েন (জয়দেব) শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলারস পরিবেশন করতেন। দ্বাদশ সর্গ 'সুপ্রীত-পীতাম্বর'-এর শেষ শ্লোকটিতে সম্মিলিত উপস্থাপনরীতির উল্লেখ রয়েছে—

> শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
> পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু।।[৪৪]

'পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে' শব্দের ব্যবহার সমবেত উপস্থাপনকেই সমর্থন করে। পরাসর ও প্রমুখ বন্ধুদের কথা শ্লোকটিতে থাকায় ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

> মনে হয় জয়দেবের দলে কবিই অধিকারী ছিলেন, সম্ভবত মূল গায়নও। পরাসর প্রভৃতি আত্মীয় ছিলেন দোহার ও বায়ন।[৪৫]

একাধিক ব্যক্তি উপস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যে উপস্থাপন-কৌশলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা পরবর্তীকালে পদাবলী কীর্তনের উপস্থাপন নির্ধারণে সহায়তা করেছিল কী না বলা যায় না। তাছাড়া *গীতগোবিন্দ*-এর উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক গানগুলি একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি জানান দেয়। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র *গীতগোবিন্দ*-এর উপস্থাপন বিষয়ে জানিয়েছেন যে—

> গীতিগুলি অভিনয়কালে পৃথক পৃথক কুশীলব নৃত্যসহ গাইত, আর সন্দর্ভগুলি সূত্রধার বা অধীকারী স্তোত্রের মতন আবৃত্তি করতেন—সে আবৃত্তিতে সুরের স্পর্শ থাকত। চর্যাপদের মতই জয়দেব অভিনীত নাটকের মঞ্চ ছিল দেবমন্দির।[৪৬]

দেবতার মন্দির নাট্যমঞ্চ রূপে ব্যবহৃত হত। আজও পদাবলী কীর্তন বা পাঁচালি উপস্থাপনের আসর দেবতার মন্দিরের সামনেই তৈরি করা হয়। কেবলমাত্র একজনের পক্ষে যে এই 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' উপস্থাপন সম্ভব ছিল না তা বোঝাই যাচ্ছে। লক্ষণ সেনের রাজসভায় জয়দেবের গানে পদ্মাবতী যে নৃত্য করতেন সে সত্য সকলেই স্বীকার করবেন। জয়দেব তাঁর দলের মূল গায়ন ও অধিকারী ছিলেন বলার পাশাপাশি সুকুমার সেন মন্তব্য করেন— এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় পালা গানে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেন।[৪৭] এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, জয়দেবের একটি গানের দল ছিল যে দলে পদ্মাবতী ছিলেন প্রধান নৃত্যপটীয়সী সদস্য। উপস্থাপনরীতি সম্পর্কিত অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতটি উল্লেখ্য—

> ১৭ সংখ্যক চর্যার কথাবস্তুর সঙ্গে জয়দেব-পদ্মাবতী-প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে একটি কথা স্পষ্ট হবে যে, নাটক তখন ছিল নৃত্য ও গীতের ওপর নির্ভরশীল; আর সমস্ত অভিনয় কাজটি ছিল দুই ব্যক্তির যুগ্ম কৃয়াকর্ম। তখনও কথা অধিক প্রশ্রয় পায়নি, নৃত্য ও গীত আধিপত্য করছে।[৪৮]

অধ্যাপক যেভাবে নিঃসংকোচভাবে নাটকে কথাবস্তুর তুলনায় নৃত্য-গীতের প্রাধান্য থাকার কথা বলছেন তাতে একদিকে যেমন *চর্যাপদ*-এর ধারাবাহিক নাট্য-ঐতিহ্যের পারম্পর্য প্রকাশ পায়, তেমনি নাটক সংরূপটির অস্তিত্ব সেকালে কেমন (নারী-পুরুষের যুগ্ম উপস্থাপন) ছিল তা নির্ণয় করতে সুবিধা হয়।

শ্রীনাভদাস বা নাভাজির হিন্দি ভাষায় রচিত *ভক্তমাল* গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভক্ত কবি জয়দেবের বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পদ্মাবতীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করেন—

এতো শুনি জয়দেব বিচার করয়ে।
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়ে।।
যে হয় হউক অঙ্গী করিতে হইল।
বুঝিলাম মায়ারজ্জু গলায় লাগিল।।[৪৯]

অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও পদ্মাবতীকে জয়দেবের পত্নী রূপেই প্রমাণ করেছেন। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যে পদ্মাবতীর অন্য পরিচয় পাওয়া যায়। উক্তিটি উল্লেখ্য—

> দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যার এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক না কেন তাঁহার রুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে; জীবনেও পদ্মাবতী নাম্নী এক "সেবাদাসী" তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, শেখশুভোদয় গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় যে, পদ্মাবতী লক্ষ্মন সেনের সভায় নৃত্য করিতেন।[৫০]

পদ্মাবতী ও জয়দেবের সম্পর্ক যাই হোক না কেন তাঁরা যে মিলিতভাবে গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যের উপস্থাপনে অংশগ্রহণ করতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ড. সুকুমার সেন মনে করেন— গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য।[৫১] *গীতগোবিন্দ* কাব্যে খাঁটি কাব্যের গুণ যতটা তার থেকে অনেক বেশি আসরকেন্দ্রিক পরিবেশনমূলক কাব্যের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক আহমেদ শরিফ বলেছেন— গীতগোবিন্দ একটি নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য।[৫২] একই কথা নাট্যকার সেলিম আল দীনের মন্তব্যেও প্রকাশিত— গীতিনৃত্য ও বর্ণনার মাধ্যমে এ কাব্য আসরে পরিবেশিত হতো।[৫৩] মনে রাখতে হবে জয়দেব ছিলেন সভাকবি। *গীতগোবিন্দ* উপস্থাপনের স্থান রাজসভা। বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ ছিলেন দর্শক। ধ্রুপদী নৃত্যের মুদ্রার প্রচলন থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এর উপস্থাপন করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। এই পদ্ধতি রপ্ত করে মার্জিত মনকে তুষ্ট করতে মহড়া (রিহার্সাল) আবশ্যক।

গীতগোবিন্দ-এ তিনটি চরিত্রের, যথা— রাধা, কৃষ্ণ ও সখীর উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক গান রয়েছে যা নাট্যগুণে ভরপুর। সংলাপের ঢঙে গানগুলোকে সাজানো হয়েছে, মাঝে মাঝে শ্লোক দিয়ে এমনভাবে

গাঁথা হয়েছে যা অনেকটা সূত্রধরের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। ড. সুকুমার সেন এই বৈশিষ্ট্য দেখে বলেছেন—

> জয়দেবের গীতিনাট্যেও রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, গান দোহারে গাহিত, আর সখীর ভূমিকা অধীকারী অথবা প্রধান গায়ন গ্রহণ করিত।[৫৪]

নাট্যকার সেলিম আল দীন *গীতগোবিন্দ*-এর উপস্থাপনভঙ্গী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> পদ্মাবতী এ কাব্যের পরিবেশনায় মূল অভিনেত্রীরূপেই বিবেচ্য। ধারণা করা যায় গীতগুলি চরিত্রগত বলেই মঞ্চে একই সঙ্গে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করতেন তিনি। এর সঙ্গে ছিল অধিকারী বা মূল গায়েনের শ্লোক ও দোহারদের ধ্রুবা।[৫৫]

একই সময়ে একটি চরিত্র বলছে ও অন্যজন শুনছে এবং উক্তির শেষে আছে শ্লোক —এই পদ্ধতি সমগ্র কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মতটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

> নাচ-গানের নাটকে এমন ধ্রুবপদ অনেকটা 'ড্রামাটিক রিলিফের' মতো। ধ্রুবপদের এমন ব্যবহার রায় রামানন্দের 'জজন্নাথবল্লভ নাটকে'ও আছে। জয়দেব তাঁর কাব্যকে গান্ধর্ববিদ্যার উদাহরণ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন — 'যদ গান্ধর্ব কলাস্যু কৌশল' ইত্যাদি। গান্ধর্ব বিদ্যা হচ্ছে সঙ্গীতবিদ্যা। তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দকে দুই বিন্দুর নাটক বলব। অর্থাৎ নাচ ও গানের নাটক। পুতুল নাচও দু বিন্দুর নাটক— নাচ ও গান। শ্রব্য ও দৃশ্য। এই দুই বিন্দুর নাটক তিন বিন্দুতে দাঁড়াল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। এই তিন বিন্দু হলো প্রস্তাবনা, ক্লাইম্যাক্স ও পরিসমাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তাবনা হলো জন্মখণ্ড, ক্লাইম্যাক্স খটল বাণখণ্ডে এবং পরিসমাপ্তি রাধাবিরহে। গীতগোবিন্দে ঘটনা এভাবে সজ্জিত নয়। তাই গীতগোবিন্দের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আরও বেশি নাট্যধর্মী।[৫৬]

নাটকের যে ধারা *গীতগোবিন্দ*-এ সূচিত হয় তার সমাপতন ঘটে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এসে। এই বিশেষ নাট্যধারার অনুবর্তন পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনে মূল গায়েন, দোহার ও খোলবাদকের কথোপকথনে এই ধরনের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে ধুয়ার ব্যবহার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ধুয়ার পদ ও ছত্র দুই'ই এই গ্রন্থে আছে। ড. সুকুমার সেন এই ধুয়া সম্পর্কে বলেছেন— এই জিনিসই বহু পরবর্তীকালে কীর্তনগানে ঢুকে ও আঁখরে পরিণত হইয়াছে।[৫৭] *গীতগোবিন্দ*-এর উপস্থাপনরীতি কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষক মহলে নানা তর্ক থাকতে পারে কিন্তু *গীতগোবিন্দ* কাব্যের মাধ্যমে সেকালের মানুষ যে নাট্যপিপাসা দূর করেছে সে সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন। অপরপক্ষে এর জনপ্রিয় উপস্থাপনমাধ্যম পরবর্তী মিথিলার কীর্তনীয়া নাটক, উড়িষ্যার লীলানাটক, আসামের অঙ্কীয় নাট ও নেপালের বাংলা-মৈথিলী নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।

বড়ুকবির *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) কাব্যটিকে কেন্দ্র করে বাংলা গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। কাব্য ও কবি যেন এক রহস্যের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। এই কাব্যে *গীতগোবিন্দ*-এর প্রভাব স্পষ্ট। উপস্থাপনের বিচারে *গীতগোবিন্দ* কাব্যের মতই নাটগীত নাট্যসংরূপের প্রভাব এতে স্পষ্ট। তিনটি চরিত্রের প্রাধান্য এই কাব্যেও রয়েছে। উপরন্তু বহুমাত্রিক বড়াই চরিত্র নাট্য বৈশিষ্ট্য তরান্বিত করেছে। বড়াই তার কপটকুশলতার সীমাকে অতিক্রম করে কোথাও কোথাও স্নেহ মমতা বিজরিত একটি মানবিক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনির প্রয়োজনে বড়াই এসেছে ও তার উপস্থিতি নাট্যক্রিয়াকে বহুগুণে তরান্বিত করেছে। *গীতগোবিন্দ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* দু'টি কাব্যের মধ্যে যোগসূত্রের কথা ড. সুকুমার সেন স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> মঙ্গল-নাটগীতের প্রথম পর্ব জয়দেবের পদাবলীতে পেলুম। যেখানে নাটের চেয়ে গীতেরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় পর্ব মিলল উমাপতির পারিজাতমঙ্গলে। তাতে গীতের প্রাধান্য থাকলেও নাটের গুরুত্ব বেড়েছে। তৃতীয় পর্বে পাচ্ছি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। সেখানে গীতকে ছাপিয়ে নাট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যথার্থই গীতিনাট্যকাব্য এখানে সংস্কৃত শ্লোকময় যে কাব্যিক কাঠামো রয়েছে তা নিতান্ত শ্লথ, তাকে কাঠামো না বলে চিত্রডোর বলাই সংগত।[৫৮]

জয়দেবের কাল থেকে বাশুলীভক্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কাল, অন্যতম যোগসূত্র হল নাট্যধর্ম। নাট্যরূপের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকায় গ্রন্থটি বিনোদনমূলক করে তুলতেই যেন কবির এই নাট্যধর্ম বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রাধা দেবী নন, রক্তমাংসের মানবী। বড়ু চণ্ডীদাস সংসারে অনভিজ্ঞা একটি সাধারণ বালিকাকে কীভাবে ধীরে ধীরে প্রিয় অনুসারিণী যুবতীতে পরিণত করেছেন সেই ক্রমবিকাশটুকু চমৎকারভাবে নাট্যরীতি সম্মত হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কে জাগের গান, ঝুমুর, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, নাটগীতি, বীথি, ধামালি, চিত্রনাটগীত বা পুতুলনাচ ইত্যাদি নানা অভিধায় অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক মুনমুন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যেখানে স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে—

> শ্রীচৈতন্য সম্ভবতঃ কানাইয়ের নাটশালায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-র কোনও কোনও খণ্ডের পুতুলনাচের মাধ্যমে অভিনয় দেখেছিলেন।[৫৯]

লক্ষ করার বিষয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংরূপগুলি নাট্যমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। নাট্যসম্ভাবনাময় দিকটি গবেষকদের নজর এড়িয়ে যায়নি। রাধা চরিত্রের অল্প অল্প করে নাটকীয় ভঙ্গিমায় নায়িকায় পরিণত হওয়া অসামান্য নাট্যময়। নাটকের অঙ্কে অঙ্কে খণ্ডপালার মাধ্যমে যেন রাধার পরিণত মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অখণ্ড নাটক নয়, এটি অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমষ্টি।[৬০] একটি ব্যাপারে সকলেই একমত যে কাব্যটি অফুরন্ত জীবনরস ও অভাবনীয় নাট্যরসে পরিপূর্ণ। নাট্যকার সেলিম আল দীন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সংরূপ সম্পর্কিত মতটি তাৎপর্যপূর্ণ—

> পরিশেষে, কাব্যের গঠন, পদবিচার ও আখ্যানস্থ বিভিন্ন লক্ষণ দৃষ্টে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গায়েন-দোহার ও পাত্রপাত্রী সহযোগে অভিনীত আদি মধ্যযুগের 'গীতনাট শ্রেণীর' আখ্যান।[৬১]

বক্তব্যের যাথার্থ কতখানি তা গীত, নৃত্য, ধ্রুবপদ, সংলাপ প্রভৃতি সূচকের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

বড়ুকবির *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রন্থ বাংলা গীতশাস্ত্রের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রূপে ভাবা যেতে পারে। এখানে গানের রূপবন্ধে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। কাব্যটিতে আহের, গুজ্জরী, কহ্নু, কেদার, কোড়া, বঙ্গাল, ধানুষী প্রভৃতি ২৭টি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং জলদ, লঘু, গঞ্জল, চুটখিল, বিষম, রূপক, যমক, ঝম্পক, হরগৌরী, আলুটী, ভ্রমরষটপদী, রসতাল প্রভৃতি তালের হদিশ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ মিলেছে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাসের মত এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রাগ-তাল-ঠাট বিচারে পূর্বভারতের নাট্যসংরূপের বিবেচনা বিশেষভাবেই জরুরি বলে মনে হয়।[৬২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অসামান্য রাগ-তাল-ঠাটের উপস্থিতি এর নৃত্যময় নাট্য-উপস্থাপন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য *গীতগোবিন্দ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনক*-এ নাটগীত শ্রেণির রচনা আখ্যা দিয়ে এর উপস্থাপনভঙ্গিমা নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে—

> নাটগীত নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহার সঙ্গে নৃত্য এবং গীত দুই-ই যুক্ত ছিল এবং তাহার কাহিনী অনেকটা পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইত।[৬৩]

পদের শেষে কবির ভনিতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়। বড়ুকবির ভনিতায় 'গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে'-এর উল্লেখ থাকায় অনুমান করা যায় বড়ু চণ্ডীদাস গায়েন রূপে আসরে কাব্যটি পরিবেশন করতেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ধ্রুবপদের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্রুবপদ গীতের প্রথম দু'টি পয়ার বা ত্রিপদীর পর উল্লিখিত হয়েছে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস এই কাব্যে ধ্রুবপদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> এগুলি থেকে গীতি নাট্যময় সাহিত্যটি কেমন করে উপস্থাপিত হত তার আভাস পাওয়া যায়।[৬৪]

নাট্যকার সেলিম আল দীন এই কাব্যে ধ্রুবপদের ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> একাব্যে সুনির্দিষ্টভাবে ধ্রুপদ অর্থাৎ ধুয়ার ব্যবহার দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ আখ্যান পরিবেশনায় সুনিশ্চিতভাবে দোহারের ভূমিকা বিদ্যমান। কাজেই বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির দুটি প্রধান উপাদান—গায়েন ও দোহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' লভ্য।[৬৫]

একজন দোহার একটি গানের উপস্থাপনে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তা যে কোনও পালার উপস্থাপনে চোখে পড়ে। ধ্রুবপদ এবং তা উপস্থাপনে দোহারের অস্তিত্ব এটাই প্রমাণিত হয় যে এই কাব্য নিছক পাঠের জন্য রচিত হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত অন্যান্য কাব্যসমূহ, যেখানে ধ্রুবপদ পাওয়া যায় সেখানেও এই যুক্তি খাটে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'দানখণ্ড'-এর একটি গীতে চারবার ধ্রুবপদ এসেছে। লক্ষ করার বিষয় হল ধ্রুবপদগুলি রাধাকৃষ্ণের সংলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই অংশে কবলমাত্র ধ্রুবপদ ও ভনিতা যুক্ত পদ উল্লেখ করা হল—

> বিচারিয়াঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে। কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদারে মনে।। ধ্রু।।
> সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী। পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে জাণী।। ধ্রু।।
> বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর। বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর।। ধ্রু।।
> এঅ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।।
> আহ্মার পোশাক রাধা আইস সত্বরে। নহেত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের অন্তরে।। ধ্রু।।[৬৬]

উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপধর্মী ধ্রুবপদগুলির সমাবেশে নাট্যরস ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে দানলীলায়। কবির ভনিতার পরে ধ্রুবপদটির অস্তিত্ব বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। শেষোক্ত ধ্রুবপদটি কবির ভনিতার পরে যুক্ত হওয়ায় মূল গায়েন ও দোহারের যুগ্ম উপস্থিতি এবং উপস্থাপনমাধ্যম দু'টি দিকই চমৎকাতভাবে ফুটে উঠেছে। মূল গায়েন পদটি গেয়ে যাওয়ার পর ধ্রুবপদটি দোহারেরা বারবার দর্শক-শ্রোতার মাঝে গেয়ে যেতেন । এভাবে দানলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশে ধ্রুবপদ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বর্ণনাত্মক পদের চেয়ে সংলাপধর্মী পদেরই প্রাধান্যই বেশি লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ড. মণীন্দ্রলাল কুন্ডুর মন্তব্য উল্লেখ্য—

> প্রতিটি খণ্ডেই রাধার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সজ্ঘাত, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, রাধা-কৃষ্ণ ও বড়াই উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীর ক্ষিপ্রগতিশীলতা, কৃষ্ণের প্ররোচনা ও রাধার প্রত্যাখ্যানে উৎকণ্ঠা, কার্য-এর চমৎকারিত্বে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সর্বাংশেই নাট্যগুণান্বিত।[৬৭]

মনে রাখতে হবে সেকালের সংলাপ এযুগের বিশুদ্ধ সংলাপরীতির মত ছিল না। গানে-গানে ছন্দের হিল্লোলে তাতে নাট্যরসের স্ফীতি ঘটানোর চল ছিল। সংলাপ বা উক্তি-প্রত্যুক্তির বিস্তৃত সমাবেশ ও নাট্যমূলক প্রয়োগকৌশল দেখানোর উপযোগিতা থাকায়, এর উপস্থাপন যে কেবলমাত্র গায়নকেন্দ্রিক হতে পারে না; তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্বিক সঙ্কট, দ্বন্দ্ব ও কাহিনির অগ্রগতি –সব মিলিয়ে এর আঙ্গিক হয়ে উঠেছে অসাধারণ নাট্যমূলক।

মঙ্গলকাব্য

আনুমানিক খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। 'মঙ্গল' কথাটি কল্যাণময় গার্হস্থ্য উৎসবানুষ্ঠান বোঝাতে, 'মঙ্গলরাগ' নামে, কখনও আবার উৎসব-অনুষ্ঠানে দেবলীলাগীতি অর্থে মঙ্গল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। 'মঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক না কেন, মঙ্গল কথাটি যে উৎসব অনুষ্ঠানে অনেকের উপস্থিতিতে মোচ্ছবের (বাউল-বৈষ্ণবদের মহোৎসব অর্থে প্রযোজ্য) সঙ্গে জড়িত তা একরকম নিশ্চিত

করে বলা যায়। মঙ্গলসূচক উৎসবে নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহযোগে মঙ্গলকাব্যের নাট্যময় উপস্থাপন হওয়াটাই স্বাভাবিক। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই এই অভিনয়প্রবণতা, সুরসংযুক্ত আবৃত্তির দ্বারা রস-সঞ্চারপ্রয়াস বাঙালীর নাট্যকৌতুহলের সাক্ষ্য দেয়। ইহার সঙ্গে নৃত্য ও গান নাট্যরসস্ফুরণের সহায়তা করেছে।[৬৮]

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে সরস কাহিনির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তাতে অভিনয় না করে কেবলমাত্র বিশেষ সুরের আরোপ করে পাঠ করা কতটা সম্ভব ছিল? বিশেষভাবে গান এবং নৃত্য যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে সেখানে অভিনয় উপযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। বাংলার প্রাচীন নাট্যকলা এমত এক সাবলীল পন্থায় সকল সাহিত্যিক সংরূপে নিজেকে বিস্তারিত করেছিল। মঙ্গলকাব্য প্রাচীন সেই নাট্যধারাকে সর্বতভাবে সজল রেখেছে।

মঙ্গলকাব্য পাঁচালি বা পাঞ্চালী জাতীয় রচনা। ফর্ম হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। পাঁচালির জনপ্রিয়তাও কিছু কম ছিল না। ড. সুকুমার সেন মঙ্গলকাব্যের ফর্ম সম্পর্কে বলেছেন—

> পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম গীতিকবিতা, দ্বিতীয় পৌরাণিক গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা, তৃতীয় অ-পৌরাণিক গেয় কবিতা-আখ্যায়িকা। শেষ দুই ধারার রচনার রূপ বা ফর্ম প্রায় একই রকম এবং সে ফর্মের নামও এক, "পাঞ্চালী"। দেবতার আখ্যানময় পাঞ্চালী নায়ক-দেবতার নামের পরে "মঙ্গল" কথাটি যুক্ত থাকে (কখনও কখনও "বিজয়", ক্বচিৎ "মঙ্গল" ও "বিজয়" দুইই)।[৬৯]

নাটগীতি বা গীতিনাট্যমূলক আখ্যায়িকা *গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর পাশাপাশি পাঁচালির ফর্মে একের পর এক অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য লেখা হতে থাকে। সেই সময় সমাজে প্রচলিত ছড়া ও ব্রতকথা বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণে পরিবেশিত হত। ধীরে ধীরে ছোট-বড় বিভিন্ন গল্প-কাহিনি পাঁচালির ফর্মে এক বৃহৎ আখ্যায়িকার সম্মিলিত রূপ নেয়। এক্ষেত্রে নাট্যকার সেলিম আল দীনের মন্তব্যটি উল্লেখ্য—

> সকল ব্রতগীতে ও ব্রতকথায়, আনুষঙ্গিক পরিবেশনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আরাধ্যের আকার-আকৃতি, চারিত্র্যলক্ষণ প্রকাশিত হতো। এই কল্পিত রূপের সঙ্গে লৌকিক ও কবিকল্পনার সূত্র যুক্ত হয়ে তা ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ মঙ্গল পাঁচালির আকৃতি লাভ করে।[৭০]

'পাঁচালি' ফর্মটির মধ্যে গল্প বলার ও অভিনয় উপযোগিতার পরিসর যথেষ্ট ছিল বলেই এর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপনরীতির দিকে খেয়াল করলেই এর সত্যতা প্রকাশ পাবে। পাঁচালিকে কেন লোকনাট্য বলা যাবে না তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নাট্যকার সেলিম আল দীন বলেছেন—

> মধ্যযুগের পাঁচালি নিরবলম্ব মৌখিক রীতির লোকনাট্য নয়, কারণ তা উচ্চকোটির লেখ্য কাব্যেরও রীতি। সাধারণ গ্রামীণ আসর থেকে রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত আসর পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, কেন সমগ্র মধ্যযুগে পাঁচালি-রীতিটিই এরকম সুবিস্তৃত রূপে অনুসৃত হয়েছিল। এর উত্তরে শুধু এটুকুই বলা যায়, আমাদের শিল্পরস পিপাসায় সহস্র বছর ধরে অদ্বৈত রুচিই প্রবল। পাঁচালিতেও তারই সংশ্লেষণ ঘটেছে। পাঁচালি, একই সঙ্গে কাব্য, আখ্যান, নৃত্যগীত এবং অভিনয়ের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরূপ।[৭১]

লোকনাট্যের কথা এর আগেও বলা হয়েছে। কেবলমাত্র পাঁচালির ক্ষেত্রেই নয় নাটগীতি, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি সংরূপের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। শিল্পের অদ্বৈত রূপ সর্বত্র বিরাজমান। কেবলমাত্র সংলাপময় নাটক খুঁজলে তা মিলবে না। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষেরা এই উপস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশেষত তুর্কি আক্রমণের পর হিন্দুসমাজ সঙ্কটাপন্ন হলে ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলকাব্যের লৌকিক (যেহেতু অনার্য দেব-দেবী, তাই লৌকিকতার আরোপ হয়েছে) দেবদেবীকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সম্মেলনের সুর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

লৌকিক ও পৌরাণিক ধাঁচের দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের সংখ্যা কম নয়। মঙ্গলকাব্যের এক একটি শাখায় বহু কবি একই বিষয় অবলম্বন করে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্য রচনা করেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী দেবীদেবতাকে নিয়ে একটি বা দু'টি মঙ্গলকাব্যের কবিও দেখা গেছে। কোনও কোনও মঙ্গলগানে খণ্ডকাব্য বা ব্রতকথার গুণ থাকা সত্ত্বেও তা মঙ্গলকাব্য রূপেই পরিচিত হয়েছে। আবার অনেকক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কাহিনি ছাড়াই বা অন্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনির নকল করে এক বৈচিত্র্যহীন রচনার প্রবণতাও দেখা গেছে। এই দুই শ্রেণির কাব্যকে প্রধান ও অপ্রধান ভেদে সাহিত্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি হল— *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল* ইত্যাদি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি হল— *শিবমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল* প্রভৃতি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে লেখা। তবে নাট্যরসের স্ফূরণ উভয়ক্ষেত্রেই রয়েছে।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসাপূজার প্রচলনের কাল নির্দিষ্ট করে বলেন— খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা-পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।[৭২] তিনি আরও বলেছেন যে, বিশেষভাবে বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া অসংখ্য মনসামূর্তি পাওয়া গিয়েছে যা খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত। তিনি দিনাজপুর জেলার মিরাইল গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপি দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর বলে নির্দেশ দিয়েছে।[৭৩] মনসা ও চণ্ডীর পূজা চৈতন্যের আবির্ভাবের আগেও যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের আদি খণ্ডে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণনামভক্তিশুন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।[৭৪]

নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম জনপ্রিয় হওয়ার আগে বাংলার মানুষ বিষহরি (মনসা) ও চণ্ডীর পূজা ও জাগরণ পালা গাইত। বেশ জনপ্রিয় নাট্যমাধ্যমরূপে যে মঙ্গলকাব্যের পালা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মনসামঙ্গলের আদি রচয়িতা কানাহরিদত্ত (খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক)। *পদ্মাপুরাণ*-এ 'স্বপ্নাধ্যায় পালা'-য় কবি বিজয়গুপ্ত আদিকবি কানাহরিদত্তের পরিবেশন-রীতি নিন্দার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। অংশটি উল্লেখ্য—

সর্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।।
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভান্ডে বোলে চালে।।
গীতে মতি না দেয়ে কেহ ভাবে বোলে চাল।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল।।
মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত।।[৭৫]

এখানে 'জোড় গাঁথা' শব্দের ব্যবহারে অনুমিত হয় যে, জোড় বা সুসংবদ্ধ রচনার পরিবর্তে হরিদত্ত লৌকিক নাট্যরীতিতে কাহিনি পরিবেশন করতেন। ছন্দবদ্ধভাবে রাগরাগিণীর ব্যবহার তখনও প্রচলিত

হয়নি। গানের থেকেও বেশি 'বোলে বালে চাল' অর্থাৎ সংলাপ ও অঙ্গাভিনয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তাৎক্ষণিক পদ রচনার অবকাশ এই ধরনের উপস্থাপনে থেকে যায়। মঙ্গলকাব্য উপস্থাপন যে এককভাবে করা হত না সেই ইঙ্গিতও এই অংশে পাওয়া যায়। 'গীতে মতি না দেয় কেহ' অংশে 'কেহ' শব্দটি দলগত পরিবেশনের দিকে ইঙ্গিত করে। মঙ্গলকাব্যগুলি উপস্থাপনার বিশেষ রীতি সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> কিন্তু মঙ্গলগান একজন মাত্র মূল গায়েন আসরে দঁড়াইয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গাহিয়া যাইত, দুই চারিজন আসরে বসিয়া ধূয়া ধরিত মাত্র। মঙ্গলকাব্যের লাচাড়ী বা নাচাড়ী অংশ যদি নৃত্যসম্বলিত গীত অংশ বলিয়াই মনে করা হয়, তাহা হইলেও এই নৃত্যও মূল গায়েনই করিত; অন্য কোন চরিত্র্য তাহাতে অংশগ্রহণ করিত না।[৭৬]

অর্থাৎ একক নয়, বহুজন মিলিত একটি দলগত উপস্থাপনের কথাই তিনি বলছেন। মঙ্গলগানের উপস্থাপনে মধ্যযুগীয় পরিবেশনরীতি লক্ষ করা যায়। একজন মূল গায়েনের উপরেই সমস্ত পালার দায়িত্ব থাকত। পদাবলী ও লীলাকীর্তনের উপস্থাপনেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। দলে অন্যান্য সদস্যেরা থাকলেও মূল গায়েনই প্রধাণত নৃত্য ও গীত করেন। মঙ্গলকাব্য উপস্থাপনের সঙ্গে গীত-নৃত্য-বাদ্য, আহার্য ও অভিনয়ের সম্পর্কের কথা সুকুমার সেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাক্ত করেছেন। তাঁর মতটি এখানে উল্লেখ্য—

> যেখানে মূল গায়ন (বা 'ওঝা') হাতে চামর মন্দিরা নিয়ে ও পায়ে নূপুর দিয়ে গান করত, প্রয়োজনমত অল্পস্বল্প নাচত ও অভিনয় ('ভাবকালি'=ভাবুকত্ব, আধুনিক 'ভাও বাতলানো') দেখাত। দীর্ঘ বর্ণনাময় অংশগুলি (শিকলি) মূল গায়েন সুরে আবৃত্তি করে যেত, গীত অংশগুলি ('নাচাড়ি') অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে ভাবকালি দেখিয়ে গাইত। সহকারী গায়েনরা ('পালি' বা 'দোহার') ধুয়ার তান ধরে যেত এবং মাঝে মাঝে অধিকারী বা মূল গায়নকে বিশ্রাম করার অবসর দিত। আর থাকত মার্দঙ্গিক এবং কখনো কখনো বাংশিক ও বীণাবাদক।[৭৭]

এখানে আহার্যের অনুষঙ্গ চামর, মন্দিরা, পায়ে নূপুর এর প্রসঙ্গ এবং নৃত্যময় অঙ্গাভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র রূপে মৃদঙ্গ, বাঁশি ও বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে একটি দলের সম্মিলিত অভিনয়ের কথা সুকুমার সেনের বক্তব্যে স্পষ্ট। এই দলগত অভিনয় আজও মনসার বিভিন্ন পালায় লক্ষ করা যায়। মনসার কাহিনি কেবলমাত্র পালা উপস্থাপনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন পটচিত্রে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর বর্ণনামূলক গানের মাধ্যমে উপস্থাপন এখনও জনপ্রিয়।

মনসামঙ্গল কাহিনির বহু স্থানে বেহুলা, চণ্ডী ও মনসার নৃত্যগীত প্রসঙ্গ রয়েছে। মূলগায়েন দ্বারা আসরে নৃত্যগীতের উপস্থাপন অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ' পালায় নটী ও নর্তকীদের কথা পাওয়া যায়—

> সাত হাজার নটী চলে করিয়া নানা বেশ।
> এগার হাজার যোগী চলে কহিতে বিশেষ।।
> সন্ন্যাসী বৈষ্ণব চলে নর্ত্তকী সূচক।
> কান্ধে ঝুলি চলিয়াছে রাজার গণক।।[৭৮]

সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নর্তকী ও নটীদের সমাগমের কথা জানা যাচ্ছে। এছাড়া নৃত্যপ্রিয় নটরাজের সম্মুখে বেহুলার নৃত্য প্রসঙ্গটি আসরে নৃত্যের মাধ্যমে নাট্যময় উপস্থাপনের দিকেই নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

> বুঝিয়া শিবের মন বাউলার কৌতুক।
> আরম্ভিল নৃত্যগীত শিবের সম্মুখ।।
> মধুর স্বরে গায়ে গীত পায়ে নাট পুরে।।
> হাতে বাদ্য বাজায়ে বেউলা মুখে গায়ে গীত।
> নানা বিধি গাহে গীত শুনি সুললিত।।[৭৯]

মূল গায়েন দোহার ও বাদ্যকার সহযোগে এই পালার অভিনয়কালে পায়ের নূপুর (নাট পুর), হাতের বাদ্যের তালে তালে সুললিত গীত গাইতেন। আদিকবি মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল-এ রয়েছে— নাটুয়ায়ে নাট করে গায়ানে গায় গীত।।[৮০] কাব্যাংশটি থেকে সমাজের গায়েন ও নাটুয়াদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তাদের অস্তিত্ব না থাকলে কবির পক্ষে সুনিপুন বর্ণনা করা কখনোই সম্ভব ছিল না।

বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* গ্রন্থে নৃত্যশালার পরিচয় পাওয়া যায়—

> মোর পুত্র ধনপতি গুণের তরঙ্গ।
> নৃত্যশালা আছে তার চারিটা মৃদঙ্গ।।
> তার একটি মৃদঙ্গ লইয়া দিব তোরে।
> নৃত্য গিয়া কর তুমি শিবের গোচরে।।[৮১]

উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে নৃত্যশালায় বাদ্যের সহযোগে নৃত্যের মহড়া দেওয়ার রীতি সেই সময় প্রচলিত ছিল। নৃত্যের জন্য নির্মিত ঘরে বাদ্যযন্ত্র রাখার ব্যবস্থা থাকত। মনে রাখতে হবে আটদিন ধরে মঙ্গলগান গাইবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। দীর্ঘ সময় ভক্তমণ্ডলীর মনযোগ আকর্ষণ করে রাখাটা কেবলমাত্র

গীতের মাধ্যমে কখনোই সম্ভব ছিল না। নৃত্যনাট্যময় উপস্থাপনের দিকটিও উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলা জরুরি ছিল। পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে বিশেষভাবে পদাবলী কীর্তনের জনপ্রিয়তায় যেন মঙ্গলকাব্য ম্লান না দেখায় সেদিকে নজর রাখাটাও দলের অধিকারির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের উপস্থাপন কেমন ছিল কাব্যগুলিতে তার পরিচয় সামান্য হলেও পাওয়া যায়। দলগত উপস্থাপনের পরিচয় বিজয়গুপ্তের কাব্য থেকে আগেই দেখানো হয়েছে। মানিকদত্তের *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের উপস্থাপন সম্পর্কিত বিবরণ কৌতুহলোদ্দীপক। সেখানে আছে যে—

তিনশত বত্তীশ নাচাড়ী রচিত হইল গান।
পদ দিশা তাথে অনেক করিল মূর্ত্তিমান।।
তাম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।[৮২]

এখানে নাচাড়ী, পদ ও দিশা তিনটি পরিবেশনা সংক্রান্ত পদ পাওয়া যাচ্ছে। এতে 'মূর্তিমান' শব্দের মাধ্যমে গানের বিমূর্ত থেকে মূর্ত হওয়া অর্থাৎ অভিনয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া মানিক দত্তের সম্প্রদায় ('সম্প্রদা') বা দলের কথা এখানে আছে। বয়ান (একজন) বা বাদ্যকর, পালী (দুজন) বা দোহার ও মূল গায়েনসহ তিনচারজন পরিবেশনকারীর উল্লেখ রয়েছে। অন্যত্র বাদ্যযন্ত্র রূপে মৃদঙ্গের উল্লেখ (কেহু বা মৃদঙ্গ বায়[৮৩]) পাওয়া যায়। পালা উপস্থাপনের স্থান ও সময়ের পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ্য—

দুর্গার মণ্ডপে রাজা পূজা কর তুমি।
সম্প্রদা সহিতে যখন গান করি আমি।।
রাজাএ করিল পূজা প্রতি ঘটে জল।
মানিক দত্ত করে গান ভোবানীর মঙ্গল।।
মানিক দত্ত য়াসি কৈল দেহরাতে গান।
অষ্ট দিবসের গান হৈল সমাধান।।[৮৪]

অর্থাৎ দুর্গামণ্ডপে ঘট সাজিয়ে আট দিন ধরে পালা উপস্থাপন করা হত। 'সম্প্রদা' অর্থাৎ সম্প্রদায়ের বা দলের সম্মিলিত উপস্থাপনে কলিঙ্গ নগরে ভবানীর মঙ্গল গান প্রচার করেন মূল গায়েন মানিকদত্ত। এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে মঙ্গল গান করার জন্য বিশিষ্ট দল ছিল। এরূপ একটি দল মানিক

দত্তের ছিল বলে মনে হয়। বললে অত্যুক্তি হয় না যে এই দলগুলি অনেকাংশে পেশাজীবী ছিল। এক্ষেত্রে সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল-গান বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লোকে টাকা খরচ করে দূর দেশ থেকে ভাল গায়ন আনত।[৮৫]

বায়না করে গানের দল আনা হত। এরূপ পেশাজীবী গানের দল স্বভাবতই উপস্থাপনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিত। দলগত উপস্থাপনে নামকরা দলের পর্যায়ভুক্ত হতে গেলে স্বাভাবিকভাবে পালা উপস্থাপনের উৎকর্ষসাধন করতে হয়। এক্ষেত্রে সংলাপধর্মী গীত-বাদ্যের প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। পালা পরিবেশনে একইসঙ্গে নাট্যবৈশিষ্ট্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনিতে লোকায়ত, অপ্রধান, অপৌরাণিক দেবদেবীর মর্ত্যে পূজা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি দেবদেবীই দেবসমাজে (ধর্মমঙ্গল ব্যতীত) শিবকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা পান। এখানে লক্ষ করার বিষয় মনসা, চণ্ডী, অন্নদা প্রত্যেক দেবীকে নানাবিধ অলৌকিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়, ষড়যন্ত্র, আশীর্বাদ, পুরস্কারের অবতারণা করে পূজা পেতে হয়েছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব জোড়ালো হবার কারণে নাট্যসংলাপময় অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলে চাঁদ-সনকা, চাঁদ-মনসা, শিব-পার্বতী-মনসা, মনসা-শিব, বেহুলা-মনসা প্রভৃতি চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ কাহিনির অভিনয় উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলেছে। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা, খুল্লনা-লহনা প্রভৃতি চরিত্রের দ্বন্দ্ব নাট্যগতিকে তরান্বিত করেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির ক্ষেত্রেও নাট্যদ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যবৈশিষ্ট্য রূপে প্রতীয়মান।

মঙ্গলকাব্যে কাহিনির উৎকর্ষবিধানে যে সব খল চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তাদের ক্রিয়াকলাপ অভিনব নাট্যপরিস্থিতি তৈরিতে সাহায্য করেছে। *অন্নদামঙ্গল*-এ মুরারী শীল, ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা দাসী; *মনসামঙ্গল*-এর দেবী মনসা; *ধর্মমঙ্গল*-এ মহামদ ও ইছাই ঘোষ প্রভৃতি চরিত্রগুলি তাদের শঠতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মঙ্গলগীতে বর্ণিত কাহিনিকে আরও বেশি বাস্তব এবং অভিনয় উপযোগী করে তুলেছে।

মঙ্গলকাব্যে বারমাস্যা ও ষণ্মাস্যার প্রচলন লক্ষণীয়। এতে যথাক্রমে বারো ও ছয় মাসের দুঃখ-দুর্দশা পূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিকণা চক্রবর্তীর মতে—

> সাধারণত বারমাস্যায় বেদনার প্রকাশ, সুখের বারমাস্যা কম। প্রবাসী পতি ঘরে ফিরলে নারী তার প্রোষিতভর্তৃকা জীবনের সুখ-দুঃখ-বিরহে জড়ানো বারো মাসের কথকতা প্রিয়তমের গোচরে উজার করে দেয়, কখনও বা স্বামী সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে নারী তার স্বামীকে সুখের বারমাসীতে আটকাতে চায়।[৮৬]

ধনপতি ও বেহুলাকে দেখা যায় দেবতাদের সামনে ছয় মাসের দুঃখ কথার ষণ্মাস্যা নিবেদন করতে। এই বারমাস্যার উজ্জ্বলতম নিদর্শন কবিকঙ্কন মুকুন্দ রচিত 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' অংশটি। কবি বারমাস্যাটিকে মানব মনস্তত্ত্বের জারকরসে জারিত করে তাকে নবরূপ প্রদান করেছেন—

> পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখ বাণী।
> ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী।।
> ভেরান্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে।
> প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।[৮৭]

এই বর্ণনাত্মক ভঙ্গী পালা পরিবেশনে আরও জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। চমৎকার নাট্যপরিস্থিতি তৈরি হয়। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে সুন্দরের প্রতি বিদ্যার বারমাস্যাও অসাধারণ নাট্যগুণে পরিপূর্ণ। বলাই বাহুল্য আধুনিক কালের সূচনালগ্নে বাঙালির নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করতে বিদ্যাসুন্দর পালা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মঙ্গলকাব্যের মানবিক ও বাস্তব চরিত্রগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নাট্যোপযোগিতা তরান্বিত হয়েছে। মনসা, শিব, চণ্ডী, অন্নদা প্রভৃতি দেবদেবী অনেক বেশি মানবিক গুণান্বিত। অন্যদিকে খল চরিত্রগুলি সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। দৈনন্দীন জীবনযাপনের প্রকৃষ্ট ছবি মঙ্গলগীতগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের একটি বড় বৈশিষ্ট্য বাস্তবতা। মঙ্গলকাব্যগুলির বাস্তবিকতা মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় অধিক।

অনুবাদকাব্য— *শ্রীরাম পাঁচালি, মহাভারত* ও *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*

মধ্যযুগে পাঁচালি পরিবেশনারীতিতে মঙ্গলকাব্যের মতই *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর আখ্যান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সংস্কৃত *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর গল্প সমগ্র দেশব্যাপী প্রসারিত থাকলেও বিশেষভাবে

বাঙালি মানসকে পরিতৃপ্ত করতে এই দুই কাব্যের সৃষ্টি আবশ্যক ছিল। *মহাভারত* ধর্মীয় গ্রন্থ রূপে পঠিত হত এবং কথকতার ভঙ্গীতে পরিবেশিত হত। এই সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকার ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যে। তাঁর মতে— বাঙ্গালায় রামায়ণ গেয় পাঞ্চালী কাব্য, মহাভারত "পাঞ্চালী" ছাপ পাইলেও একান্তভাবে পাঠ্য কাব্য।[৮৮] রাম-সীতার প্রেমমূলক আখ্যান কৃত্তিবাসের (জন্ম ১৩৯৮-১৪০০খ্রি.) *শ্রীরাম পাঁচালি,* যার নামের সঙ্গে পাঁচালি যুক্ত। সুকুমার সেনের মতে— কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে।[৮৯] অর্থাৎ তিনি পাঠ নয়, গীত হওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর মত জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত আখ্যান যে গায়ন রীতিতে উপস্থাপিত হত তাতে অভিনয় কখনোই বাদ থাকতে পারে না। নাট্যকার সেলিম আল দীনের বক্তব্যে সেই যুক্তিই ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন— পক্ষান্তরে 'রামায়ণ' নৃত্যগীতের মাধ্যমে অভিনেয় পাঁচালি।[৯০] তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নৃত্যের মাধ্যমে এই গীত ও অভিনয় চরম উৎকর্ষ লাভ করত। আখ্যানটি জনপ্রিয় ছিল বলেই হয়তো উনিশ শতক পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কাব্যে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পালাকার ও কবিদের হাতে পরিবর্তিত হতে হতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাঁচালিকাব্যের অভিধা থাকা সত্ত্বেও এর কাল নিয়ে যুক্তি তর্কের অবকাশ রয়েই গেছে। বোধ হয় এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'কীর্ত্তিবাস' ভনিতা পাওয়া যায়। অনুবাদের সময় কবি অনেকক্ষেত্রেই মূলানুগ থাকতে পারেননি। 'তরণীসেন বধ', 'মহীরাবণ অহিরাবণ বধ' প্রভৃতি আখ্যান এতে যুক্ত করা হয়েছে।

রামায়ণ-এর পরিবেশনরীতি সেই যুগে কেমন ছিল কাব্যে তার আভাস পাওয়া যায়। 'কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড'-এর একটি পদে কবি তাঁর কাব্যকে 'মঙ্গল পাঁচালি' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

> কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
> রচেন কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে প্রথম শিকলী।।[৯১]

পাঁচালি পরিবেশন করার এক বিশেষ রীতি হল 'শিকলী'। কৃত্তিবাস নিজের কাব্যকে কখনও 'গীত' কখনও 'গান' রূপেও আখ্যা দিয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের মতে— কবি নিজে রামায়ণ গাইতেন।[৯২] তিনি টীকা অংশে জানিয়েছেন—

> রামায়ণ গান করিতেন বলিয়াই কি কৃত্তিবাস "ওঝা"? কিন্তু এ অর্থে শব্দটির বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই, অসমিয়ায় আছে।[৯৩]

অনুবাদ কাব্যে যেমন মূলগায়েনের অস্তিত্ব রয়েছে তেমনি মঙ্গলকাব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কবির কাজ কীর্তনের মূলগায়েনের মতই। *গীতগোবিন্দ* বা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এও তাই দেখা গেছে। মূলগায়েন দ্বারা এরূপ বিশেষ রীতির উপস্থাপন প্রায় সর্বত্র ছিল। তফাৎ কেবল উপস্থাপনের ভঙ্গীতে। নাটগীত, গীতিনাট্য, লীলানাট্য অথবা পাঁচালির আকারে আসরে আসরে পরিবেশিত হত। কৃত্তিবাসী *রামায়ণ*-এর 'উত্তরকাণ্ড'-এ নাটগীতের প্রসঙ্গটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। অংশটি উল্লেখ্য—

নাট্যগীত দেখি শুনি অতিকুতুহল।
কেহ বেদ পড়ে কেহ পড়ায়ে মঙ্গল।।
নানা শুভ নাট্যগীত হিমালয় ঘরে।
পরম আনন্দে লোকে আপনা পাশরে।।[৯৪]

একই অংশের পাঠান্তর (নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে[৯৫]) দেখে ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে—উদ্ধৃত অংশে মঙ্গলগান ও নাটগীতিকে একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।[৯৬] যদিও 'শুভ' অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দের ব্যবহার হয়েছে কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু সমাজে দু'টি উপস্থাপনাকেই যে সমান গুরুত্ব দেওয়া হত সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

রামায়ণ বা *মহাভারত*-এর মত এত বড় আখ্যানকে উপস্থাপন করাটা কীভাবে সম্ভব তা বুঝতে বেশ অসুবিধা হত যদি না মঙ্গলকাব্যের আটদিন ধরে টানা উপস্থাপনার কথা জানতে পারা যেত। মনসা ও চণ্ডীর পালা আটদিন এবং *ধর্মমঙ্গল* বারো দিনের পালায় পরিবেশন করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্ভবত জনপ্রিয় পালাগুলি বেছে উপস্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* গ্রন্থে 'রামায়ণ নাটকাভিনয়' অংশটি *রামায়ণ* অভিনয়ের প্রাচীন রূপটির বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কিছু অংশ উল্লেখ করা হল—

দশরথ রূপে এক নটবর বেশে।
কৌশল্যা কেঁকই কেহো সুমিত্রার বেশে।।[৯৭]

অংশটি 'কেদার রাগ'-এ গাওয়া হয়েছে। দৈত্য রাজসভায় অভিনিত সমগ্র *রামায়ণ*-এর কাহিনি যেন নৃত্যনাট্যের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। আর্যেরা অনেক সময়ই অনার্যদের দৈত্য রূপে চিহ্নিত করতেন। এক্ষেত্রে অনার্যদের মধ্যেও *রামায়ণ* পালাভিনয়ের প্রচলন থাকার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। গানের শেষ অংশটি থেকে নৃত্যময় উপস্থাপনের সুন্দর বিবরণটি উল্লেখ্য—

হেন রামায়ণ নট নাচিল নর্ত্যকে।
নাটে মোহিত কৈল সকল দৈত্যকে।।
এক নাচ নাচি নর্তক নাচে নাচ আর।
অজস্মরমতি কথা গঙ্গার অবতার।।
ধ্রুপদ পঞ্চাস নাট দাক্ষিনাট্য জত।
জত নাচ নাচে নর্ত্তক কহিব সে কত।।
অসুর মহিয়া তথা রহে নটগনে।
গুনরাজখান বলে গোবিন্দ চরনে।।[৯৮]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নৃত্য-গীতমূলক চরিত্রাভিনয়ে *রামায়ণ*-এর কাহিনি উপস্থাপিত হওয়ার নিদর্শন মালাধর তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত নারীর বেশভূষা ধারণ করে 'নর্তক' বা 'নাট'দের নৃত্যময় অভিনয় উপস্থাপন ছিল এক অভিনব পন্থা। *চর্যাপদ*-এ 'বিসমা' ভঙ্গিমায় পুরুষকে নৃত্য এবং নারীকে গান করতে দেখা যায়। এখানে নারীর ভূমিকায় পুরুষদের অভিনয় দেখা যাচ্ছে। চৈতন্য-পূর্ব উপস্থাপনভঙ্গি কেমন ছিল তা রাজসভার পরিমণ্ডলে উপস্থাপিত *রামায়ণ* নাটপালার প্রচলন দেখে আন্দাজ করা যায়। পরবর্তীকালে *চৈতন্যভাগবত*-এ এরূপ অভিনয়ের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিশেষত চন্দ্রশেখরের বাড়িতে যে চরিত্রাভিনয় ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল তার অস্তিত্ব সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল বলেই মনে হয়।

বাংলায় প্রথম *মহাভারত* অনুবাদক পরমেশ্বর দাস।[৯৯] কবীন্দ্র পরমেশ্বর ছাড়াও শ্রীকরনন্দী, সঞ্জয়, নিত্যানন্দ ঘোষ এবং কাশীরাম দাস *মহাভারত*-এর কাহিনি কখনও পাঁচালি কখনও বা কাব্যের আকারে রচনা করেছেন। *মহাভারত* প্রধানত পাঠ্যকাব্য হওয়ায় তা আসরের শিল্প ধরা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুরাণ পাঠের অংশ রূপে এই কাব্য পাঠ করা হত কথকতার ভঙ্গিতে। এক্ষেত্রে নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতটি উল্লেখ্য—

> পরবর্তীকালে একই অর্থে 'কথক' কথাটাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথকঠাকুর— যিনি মহাভারত বা পুরানাদি পাঠ করেন। এই পাঠকে 'কথকতা'ও বলা হয়ে থাকে। 'কথকতা' সকল কালেই একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আধুনিক কালের থিয়েটারে পাঠ-অভিনয় নাট্য পরিবেশনার একটি স্বীকৃত পন্থা।[১০০]

এখনও ভাগবত পাঠের আয়োজন হলে এই কথকতায় গানের অংশ জুড়ে দিয়ে শিল্পের সুষমা প্রদান করা হয়ে থাকে। সেযুগেও নিরস, একঘেয়ে পাঠের সঙ্গে গীত যুক্ত হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। গীতিনাট্য রূপে পরিবেশনের জন্য বোধ হয় পাঁচালির আকারে *মহাভারত*-এর রচনা হয়েছে।

সঞ্জয়ের *মহাভারত* গীত ও পাঁচালি —দুইয়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে সংস্কৃতে রচিত শ্লোক বাংলা পয়ার ছন্দের আদলে গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদকে লাচাড়ি বলার উদাহরণ মেলে—

সঞ্জয় যে কবিবর অতি বিচক্ষণ।
হেনকালে বোলে কিছু লাচাড়ি যোজন।।[১০১]

আগেই বলা হয়েছে লাচাড়ি শব্দটি নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত। যদিও কথকতার ভঙ্গিমায় নৃত্যের অনুষঙ্গ বেমানান তবু এক্ষেত্রে নাচের প্রসঙ্গ থাকায় কথাটি বিশেষ সুর রূপে বিবেচনা করাই শ্রেয়। সঞ্জয় তাঁর কাব্যকে 'ভারত সঙ্গীতা'[১০২] বলে উল্লেখ করেছেন যা সংগীত পরিবেশনের ইঙ্গিত রূপে ধরা যেতে পারে। 'বিরাট পর্ব'-এ অর্জুনের বৃহন্নলার সাজ প্রসঙ্গে 'নাটুয়া' (তারপরে অর্জুন যে হইল নাটুয়া।[১০৩]) কথাটি পাওয়া যায়। আবার নৃত্যশালার (নৃত্যশালা ঘরে ভীম আইল সেই ক্রমে।।[১০৪]) উল্লেখ এই পর্বের 'ভীমের কীচকবধ' অংশে পাওয়া যায়। অর্জুনের নৃত্য উপস্থাপন অংশটিও বেশ চমৎকার—

এখানে অর্জুন আইল সভার বিদিত।
অঙ্গভঙ্গ করিয়া গায় নানা গীত।।[১০৫]

রাজসভায় আয়োজিত 'নৃত্যের পরিচয়' অংশটিতে সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। নৃত্যশালা, নাটুয়া এবং এই উপস্থাপন প্রসঙ্গ প্রমাণ করে সেযুগের নৃত্যগীতাভিনয় বেশ জনপ্রিয় ছিল। *মহাভারত*-এর কাহিনি *রামায়ণ*-এর মত সরল নয়। *মহাভারত*-এ মানবিক সম্পর্কের জটিলতা রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়, কূটনীতি, রাজনীতি, নিরন্তর যুদ্ধের বর্ণনা কোমল স্বভাবের বাঙালির মনকে ততটা আকর্ষিত করেনি যতটা করেছিল *রামায়ণ*-এর সহজতা। চরিত্রের কোমলতায় বাঙালিয়ানা খুঁজে পেয়ে মেতেছে বঙ্গসমাজ। কৃষ্ণের কূটনীতিজ্ঞ, রণনিপুণ, সম্রাট সত্ত্বার পরিবর্তে গোয়ালা প্রেমিক সত্ত্বা বাঙালি হৃদয়কে জয় করেছিল। *মহাভারত*-এর আখ্যান থেকে কৃষ্ণকথা বেছে নেওয়ার মধ্যে যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাতে বাঙালির নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়।

চৈতন্য-পূর্ব কৃষ্ণকথামূলক অনুবাদকাব্য মালাধর বসু রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (১৪৭৩-১৪৮০খ্রি.) গ্রন্থ। *ভাগবত*-এর কৃষ্ণলীলাসংবলিত দশম ও দ্বাদশ স্কন্ধের সরল অনুবাদ এই কাব্যে রয়েছে। এর পরিবেশনরীতি সম্পর্কে স্বয়ং মালাধর বলেছেন—

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।[১০৬]

এর একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়—

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি।।[১০৭]

অর্থাৎ *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* কাব্যের আঙ্গিক ও পরিবেশনরীতি পাঁচালি রূপেই বিবেচনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তা ছন্দবদ্ধ রূপে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করার রীতি প্রচলিত ছিল যা 'গীত ছন্দে গাহি' কথাটা থেকে বোঝা যায়। *রামায়ণ*-এর উপস্থাপন সম্পর্কে জানার পর এ সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে গীতের সঙ্গে নৃত্যের যোগে আস্বাদ্যমানতা বৃদ্ধি করতে পাঁচালি ছিল বিশেষ সহায়ক। নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতে— 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' পরিবেশনয়ারীতি আসরকেন্দ্রিক পাঁচালি-নাট্যের ধারায় বিচার্য।[১০৮] এই কাব্যে দৈত্যদের সভায় *রামায়ণ* নাট্যাভিনয়ের সুবিস্তৃত বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে, যা থেকে সেকালের নাট্যের রীতি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে *কৃষ্ণমঙ্গল* রচনার ক্ষেত্র তৈরি হয় চৈতন্যের আত্মপ্রকাশে। ষোড়শ শতকে *কৃষ্ণমঙ্গল* এর যে সব কীর্তিমান কবিদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন— যশোরাজ খান, পরমানন্দ, গোবিন্দ আচার্য, রঘুনাথ পণ্ডিত (*কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী*), দ্বিজ মাধব, শ্যামদাস (*গোবিন্দমঙ্গল*), কৃষ্ণদাস, মাধবাচার্য ইত্যাদি। ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানে কালিয়দমন একটি আবশ্যক অংশ। কৃষ্ণের বীর ও প্রেমিক সত্ত্বার যুগ্মরূপের আস্বাদ দিয়েছে এই কাব্যটি। সকল সমাজের মানুষের দ্বারা আদৃত হয়েছিল *কৃষ্ণমঙ্গল* জাতীয় কাব্য। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পাঁচালির মাধ্যমে পদাবলীর গীতিরস প্রদানের এক বিশেষ রীতির প্রচলন হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা কালীয়দমন নাট্যের উৎপত্তিতে সাহায্য করেছিল। এপ্রসঙ্গে নাট্যকার সেলিম আল দীনের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> চৈতন্যদেবের সময়েই কালীয়দমন নাটের একটি বিশেষ রীতি 'ডঙ্ক' নামে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' প্রাপ্ত নাট্যপ্রসঙ্গে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। নব্যপাঁচালি ও 'ডঙ্ক' নাট্যের দুটি স্তর অতিক্রমপূর্বক পরবর্তীকালে এ শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব ঘটেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।[১০৯]

পাশাপাশি চলতে থাকা দু'টি উপস্থাপন মাধ্যম— পদাবলী কীর্তন ও পাঁচালি থেকে জনপ্রিয়তার নিরিখে দেওয়া নেওয়া চালাতে কোনও বাঁধা ছিল না; তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এখনকার পদাবলী কীর্তনের আসরে অনেক সময়ই বাউল গান বা জনপ্রিয় হিন্দি ভজনকে উপস্থাপনার অংশ (প্যারডি) রূপে মেনে নিতে পালা-উপস্থাপনকারি বা ভক্তের অসুবিধে হয় না। ঠিক সেভাবেই হয়তো পদাবলী ও পাঁচালির মিলিত আস্বাদ নিতে ভক্তবৃন্দ কুণ্ঠাবোধ করেনি।

চৈতন্যজীবনী ও লীলানাট্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তুর্কি আক্রমণের পর হীনবল বাঙালি বিরোধিতা, প্রতিরোধের স্বপ্নপূরণ হতে দেখে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে। রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবয়বধারী ব্যতিক্রমী বাঙালি চরিত্র ধর্মীয় সত্ত্বার অধিকারী হয়েই থেমে থাকেননি; কীর্তন সংস্কৃতিকে মজ্জাগত করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলার মানুষের ভক্তির যোগসূত্র তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। বাংলা নাটকের ইতিহাসের দিক্‌নির্ণয়ে তিনি প্রধান কাণ্ডারীরূপে জাজ্বল্যমান। একজন নাট্যব্যক্তিত্ব রূপে তাঁর পরিচয় রয়েছে চরিতসাহিত্যে। নাট্যকার সেলিম আল দীন, চৈতন্যদেবের নাট্যব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন—

> স্বয়ং চৈতন্যদেব নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অদ্বৈত রামকৃষ্ণ সাধনার পথে লক্ষ করি বিচিত্র পুরাণ ও লোককথাকে তিনি নাট্যে এনেছেন। অশ্রু-কম্প-পুলক-হর্ষে কখনও এক হয়ে গেছেন চরিত্রের সঙ্গে। চৈতন্যদেব শুধু যে নাট্যে অভিনয় করেছেন তা নয়, একালের সতর্ক বিচারে দেখা যাবে তিনি সামগ্রিক অর্থে তাঁর অভিনীত নাটকের নির্দেশকও ছিলেন।[১১০]

বৈচিত্রময় কীর্তনের প্রচার ও প্রসারে কাজটি চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সংগঠিতরূপে সঞ্চালন করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*, কৃষ্ণদাসকবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* এবং লোচনদাস ও জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে সেকালের উপস্থাপনরীতি লিপিবদ্ধ করা আছে। এর বর্ণনা অনেকটাই প্রথম অধ্যায়ে 'বঙ্গে কীর্তনের প্রচলন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। নবদ্বীপে কাজীদলন, নীলাচলে রথাগ্রে দলবিভাজিত কীর্তন এবং শ্রীবাসের গৃহে অথবা চন্দ্রশেখরের বাড়ির উঠোনে নৃত্যনাট্যের সুন্দর বিবরণ কিয়দাংশে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই আলোচনা কিছুটা বিস্তারলাভ করবে। বিশেষত মঙ্গল-পাঁচালি

জাতীয় রচনার পাশাপাশি পদাবলী সাহিত্য বা কৃষ্ণকথামূলক লৌকিক ও পুঁথিগত আখ্যানের প্রচলন সমাজে কেমনভাবে করা হত তা দেখাটাও ভীষণ জরুরি। পদাবলী কীর্তনের একচ্ছত্র আধিপত্যে চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের ভূমিকা কেমন ছিল তা ক্রমশ পরিষ্কৃত হয়ে উঠবে।

গয়া থেকে ফিরে এসে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে অনেকটা ভগ্নব্যক্তিত্বের (split personality) আভাস দেখা দেয়। তিনি কৃষ্ণপ্রেমাতুর হয়ে হাসেন, কাঁদেন, মূর্ছা যান; কখনও বা স্ত্রী ও মাকে তেড়ে মারতে যান। আবার কখনোও স্বভাব বিরুদ্ধ প্রশান্ত, বিনয়ী, ভদ্র, প্রবীণদের সাহায্য করতে আগ্রহী যুবকে পরিণত হন। এরকম তীব্র ভাবোন্মাদ অবস্থার পরিচয় শেষজীবনে নীলাচলেও দেখা গেছে। এমন অবস্থায় প্রবীণ বিজ্ঞ অদ্বৈত আচার্যকে ডাকা হলে, তিনি শ্রীচৈতন্যের এই অবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করে ভক্তিভাব প্রচারের সমর্থ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। অদ্বৈত আচার্য ও তাঁর ভাই শ্রীরাম পণ্ডিতের কীর্তনের দলে চৈতন্যদেবকে যুক্ত করা হলে ঘরে-বাইরে কীর্তন বেশ জমে ওঠে। এখান থেকেই মহাপ্রভুর কীর্তনের পদযাত্রা শুরু। নন্দন আচার্যের ঘরে নিত্যানন্দের আগমন এবং চৈতন্যের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় অংশ *চৈতন্যভাগবত*-এ নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নবদ্বীপে কখনও শ্রীবাসের ঘরে অথবা মেসো চন্দ্রশেখরের বাড়িতে কখনও আবার নিজ গৃহে অন্তরঙ্গদের (শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি) নিয়ে দরজা বন্ধ করে নামকীর্তন করতেন। *চৈতন্যভাগবত*-এ বর্ণিত আছে—

প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্যজন।।[১১১]

একসময় মহাপ্রভুর মনে হয় এই কৃষ্ণনাম জগৎ সংসারে ছড়িয়ে দিতে হলে সংকীর্তনকে দ্বারমুক্ত করতে হবে, কোনও কাজীর রক্তচক্ষুকে ভয় করলে চলবে না। এই নির্দেশ *চৈতন্যভাগবত*-এ রয়েছে—

সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম করে কোন জন।।[১১২]

এরপর নগরকীর্তন করে কাজীদলন অংশে পদার্পণ করা হয়। সেই থেকেই নদের নিমাই এক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন ।

চৈতন্যদেব শুধুমাত্র কীর্তন করেই ক্ষান্ত হননি নিজেকে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গেও যুক্ত করেছিলেন। চৈতন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা লীলানাট্য নামে প্রচলিত হয়। মনে রাখতে হবে, সেই সময়ে 'লীলা' এবং 'নাট্য' একই অর্থে ব্যবহৃত হত। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা সেই অর্থে নাট্য। বৈষ্ণবদের কাছে কখনও কখনও রামলীলা হয়ে ওঠে কৃষ্ণলীলার নামান্তর মাত্র। সমাজে পাঁচালির সংরূপে রামায়ণ বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বৈষ্ণবরা রামকে বিষ্ণুর অবতার রূপে দেখেছেন। রামনামে প্রকারান্তরে কৃষ্ণের মাহাত্ব প্রকাশিত হত। বৃন্দাবনদাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ নিত্যানন্দের রামলীলা এবং কৃষ্ণলীলা উপস্থাপনার নিটোল বর্ণনা পাওয়া যায়। এর উপস্থাপন পাঁচালির মত ছিল না। পাঁচালিতে মূলগায়েনের একচ্ছত্র আধিপত্য। গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে মূলগায়েনই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু লীলানাট্যে থাকত চরিত্রাভিনয়। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে রূপসজ্জা এবং পরিপূর্ণ চরিত্রাভিনয়ের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যা লীলানাট্যের চরিত্রাভিনয়ের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। লীলানাটকের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তা আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ পরবর্তীকালে লীলাকীর্তনে এই সংরূপটির প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিলীলার অষ্টম অধ্যায়ে লীলানাট্যের বিপুল বর্ণনা পাওয়া যায়। কিশোর নিত্যানন্দের নাট্যলীলার বর্ণনা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

হেনমতে আপনা লুক্কাঞা নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ।।
শিশুগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।[১১৩]

নিত্যানন্দ জন্মাবধি কৃষ্ণভক্ত। খেলাচ্ছলে একেক দিন একেক রকমের কৃষ্ণলীলাভিনয় করেন তিনি। তাঁর নাট্যলীলার সঙ্গী শিশু ও কিশোর বালক। তবে এই 'ক্রীড়া' শিশুসুলভ আচরণ একেবারেই নয়। কারণ—

সবে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমত জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা।।[১১৪]

এই লীলাভিনয়ে ভাগবত পুরাণের কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের মাধ্যমে লীলানাট্য করার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এতে মহড়া নির্দেশনা, মঞ্চ, মঞ্চসজ্জা,

রূপসজ্জা ও পোশাকের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কৃষ্ণের জন্মলীলা উপস্থাপনের কিছু অংশ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

পৃথিবীর রূপ কেহ করে নিবেদন।।
তবে পৃথ্বী লঞা সবে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ঊর্ধরায়।।
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্ধ করি বোলে।
জন্মিবাঙ আমি গিয়া মথুরা গোকুলে।।
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বাসুদেব-দৈবকীর করায়ে বিয়া।।
বন্দিঘর করিয়া অনন্ত নিশিভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে।।
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে।।
কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠে তার বুকে।।[১১৫]

কৃষ্ণজন্ম প্রসঙ্গটি ভাগবত আশ্রয়ী। লীলানাট্যের প্রারম্ভে নিত্যানন্দের 'পৃথ্বী'রূপ সৃজন মঞ্চ উপকরণ রূপে ভাবা যেতে পারে। কৃষ্ণজন্মের কালগত সাযুজ্য বজায় রেখে নিশাভাগে অভিনয়ের মাধ্যমে বাসুদেব-দৈবকীর বিবাহ করানো ('করায়ে বিয়া') হয়। যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করতে এই প্রয়াস করা হত বলেই মনে হয়। এরপর 'বন্দিঘর' অর্থাৎ কারাগারে কৃষ্ণজন্মের অভিনয় প্রদির্শিত হয়। এক্ষেত্রে 'কৃষ্ণ জন্ম করায়েন' কথাটি থেকে নিত্যানন্দের নির্দেশনায় কারাগার এবং চরিত্রদের সাজিয়ে ('কোন শিশু সাজায়েন পুতনার') অভিনয়ের ব্যাপারটি কীভাবে সংঘটিত হত তার যৌক্তিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের নির্দেশিত লীলানাট্যে চরিত্রানুগ রূপসজ্জা গ্রহণের প্রচলন ছিল। রূপসজ্জার এক বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ্য—

কোন শিশু নারদ কাছয়ে দাড়ি নিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া।।
কোনদিন কোন শিশু অক্রুরের বেশে।
লৈয়া যায় রামকৃষ্ণে কংসের আদেশে।।[১১৬]

নারদের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে দাড়ি এবং চরিত্রানুগ বেশভূষা বা সাজ ('অক্রুরের বেশে') ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষ্ণলীলানাট্যে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় 'রামকৃষ্ণ' শব্দটি যা মিলিত সত্ত্বা অর্থাৎ বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরিচায়ক। বিভিন্ন দিনে পৌরাণিক কাহিনির আশ্রয়ে নিত্যানন্দকে কৃষ্ণকথা বিষয়ক লীলানাট্যের ব্যাবস্থাপনা করতে দেখা যায়। এই ভাবে জন্ম, ননীচুরি, গোষ্ঠ, বকাসুর-অঘাসুর বধ,

গোবর্ধনধারণ, গোপীর বসন হরণ, মথুরাগমন, কংসবধ, বামন অবতার ইত্যাদি লীলার অর্থাৎ নাট্যের আয়োজন চলে। অভিনয়ের পর দেখা যায়—

কংস বধ করিয়া চলয়ে শিশু সঙ্গে।
সর্বলোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে।।
এইমত যত যত অবতার লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা।।[১১৭]

এখানে 'রঙ্গে' অর্থাৎ 'রঙ্গ' শব্দটি অভিনয়ার্থে ব্যবহারের চল ছিল বলেই মনে হয়। নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে নাটকের ক্ষেত্রে যে 'অবস্থানুকৃতি' –র কথা বলা হয়েছে তা এখানে 'অনুকরণ' কথাটির সঙ্গে মিলে যায়। প্রতিটি লীলার অনুকরণে লীলানাট্যের উপস্থাপন পদ্ধতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল।

চৈতন্যভাগবত-এর মধ্যখণ্ডে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরবৃন্দের দ্বারা পরিবেশিত 'অঙ্কের বন্ধনে' কৃষ্ণচরিত লীলানাট্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। নবদ্বীপ সেই সময় নামকীর্তনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভি শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় মাথুর পর্যায়ের অভিনয় আয়োজন শুরু হয়। সাহিত্য সমালোচক ড. সুকুমার সেন এই চরিতাভিনয়কে নাটক আখ্যা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ্য— একদিন বিশ্বম্ভরের খেয়াল হল 'কৃষ্ণচরিত' নাটক অভিনয় করবার।[১১৮] অন্যত্র *বিশ্বভারতী পত্রিকা* য় তিনি বলেছেন—

> শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাটগীতাভিনয় করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তার যে উল্লেখ পাই তাতে বোঝা যায় যে তিনি রুক্মিণীহরণ ও বড়ু চণ্ডীদাসের অনুযায়ী রাধাবিরহ অভিনয় করেছিলেন।[১১৯]

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে রুক্মিণীহরণ এবং রাধাবিরহ লীলা নাট্যাকারে উপস্থাপিত হয়েছিল। ড. সুকুমার সেন এই অভিনয়কে নাটগীতাভিনয় বা নাটগীত রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে এরূপ অঙ্ক বিভাজিত পরিকল্পিত নাট্যাভিনয়কে কী নাটগীতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে? তা সে সংরূপ যাই হোক না কেন, অঙ্কের বন্ধনে পরিচালিত এই প্রকারের নাট্য উপস্থাপনের প্রচলন সমাজে অবস্যই ছিল। বাঙালির নাট্যপিপাসা তৃপ্ত করার একটি জনপ্রিয় কৌশল ছিল লীলাজাতীয় নাটক। লীলানাটকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে আছে। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাওঁ অঙ্কের বন্ধানে।।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জ কর গিয়া।।

শঙ্খ কাঁচলী পাটশাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য সজ্জ কর সভাকার।।[১২০]

চৈতন্যদেব বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব পণ্ডিতকে আদেশ করলেন নাটকের উপযোগী সাজসজ্জা এবং আসরের যাবতীয় জিনিসপত্র (props) জোগাড় করতে নির্দেশ দিলেন। চরিত্রানুগ রূপসজ্জার কথা বলেছেন বৃন্দাবনদাস। রূপসজ্জার নির্দেশ এরূপ—

গদাধর কাছিবেন রুক্মিণীর কাছ।
ব্রহ্মানন্দ তালবুড়ী সখী সুপ্রভাত।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।।
শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।
দেউড়িয়া হাড়ি মুঞি বলয়ে শ্রীমান।।
অদ্বৈত বলয়ে কে করিব পাত্র-কাছ।
প্রভু বোলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।।[১২১]

অর্থাৎ, গদাধর সাজবেন 'রুক্মিণী', ব্রহ্মানন্দ 'তালবুড়ী', হরিদাস 'কোতোয়াল', নিত্যানন্দ 'বড়াই', শ্রীবাস 'নারদ', শ্রীরাম 'স্নাতক' এবং শ্রীমান একজন পাহারাদারের চরিত্র অভিনয়ের নির্দেশ পেলেন। কৃষ্ণের ভূমিকায় গৃহদেবতা গোপীনাথ সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। মহাপ্রভু সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করার প্রয়োজন বোধ করেননি। সেইমতো তিনি অদ্বৈত আচার্যকে নির্দেশ দেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে লক্ষ্মী সাজবেন বলে অঙ্গীকার করেন—

লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর।।[১২২]

যেহেতু বড়াই চরিত্রে নিত্যানন্দ অভিনয় করবেন তাই লক্ষ্মী অর্থে রাধার বেশ ধারণের কথা বলা হয়েছে। চৈতন্যদেব কখনও 'রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন', কখনও রাধার ভাব, কখনও বা জগদ্ধাত্রীর ভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সেই অঙ্ক নৃত্যে বিশ্বম্ভর একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। দৃশ্য বিভাজন নয় বরং অঙ্কের বিভাজনে নাট্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থের 'নদীয়া খণ্ড'-এ ৬৯ সংখ্যক পদে চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়—

একদিন গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনে নাচে।
নটবর বেশে অকিঞ্চনে প্রেম জাচে।।

খেনে শিখি পুচ্ছ চুড়া গলে গুঞ্জা দাম।
খেনে গৌরচন্দ্র খেনে মেঘারম্ভ শ্যাম।।
যে যে ভাবে নাচে তা বুঝিতে শক্তি কার।
ভাবাবেশে কত কত অশেষ বিকার।।
ব্রহ্ম হর ইন্দ্র চন্দ্র দেখে অন্তরীক্ষে।
জয় জয় হরিধ্বনি শুনি কত লক্ষে।।
তুম্বুর নারদ গান শ্রীবাস পণ্ডিত।
মুকুন্দ আলাপে নিত্যানন্দ আনন্দিত।।
সর্বলোকে হরি বলান ঠাকুর হরিদাস।
অদ্বৈত গোসাঞি দেখি বাড়িল উল্লাস।।
বিষ্ণুভাব দেখিআ নারদ শ্রীনিবাস।
নৃসিংহ ভাব দেখি প্রহ্লাদ হরিদাস।।
রঘুনাথ ভাব দেখিয়া চন্দ্রচূড়।
মুরারি গুপ্তের দেখ দিঘল লেঙ্গুড়।।
গৌরাঙ্গ কানাঞি নিত্যানন্দ বলরাম।
শ্রীরামদাস সুন্দরানন্দ শ্রীদাম সুদাম।।
কৃষ্ণভাবে নাচে গৌর অপার মহিমা।
গদাধর জগদানন্দ রাধা সত্যভামা।।
রাধা গদাধর আর গোবিন্দ গরুড়।
মুকুন্দ বাসুদেব দত্ত রুক্মিণী অক্রূর।।
মোহিনীর বেশ ধরি নাচে গৌরচন্দ্র।
তা দেখিআ বিস্ময় অদ্বৈত নিত্যানন্দ।।
প্রকৃতির ভাব দেখি বাসুদেব চমৎকার।
লক্ষ্মী রূপাধিক হইল শচীর কুমার।।
সপ্ত প্রহর প্রভু রহিলা অচৈতন্যে।
দেখিআ প্রমাদ সভে মানিল সামান্যে।।
অদ্বৈত মুরারি গুপ্ত কান্দে বিদ্যানিধি।
দেখিয়া অদ্বৈতচন্দ্রে লাগিল সমাধি।।[১২৩]

চৈতন্যের অজ্ঞান হয়ে পড়ার ঘটনায় বা রূপসজ্জার বিবরণে কিছুটা অতিকথন ও অতিরঞ্জন যে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এতে ভক্তিরস উজ্জ্বল হলেও, সত্য ঝাপসা হয়ে গেছে। সে কারণেই হয়তো ঐতিহাসিক দিক থেকে বৃন্দাবন্দাসের *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব চৈতন্যদেবের নির্দেশমত যে নিখুঁত রূপসজ্জার ব্যবস্থা করেন তা বৃন্দাবন্দাস একজন দর্শকের দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় মঞ্চ সম্পর্কিত তথ্যও উঠে এসেছে। তিনি বলছেন—

সেই ক্ষণে কথুয়ার চান্দয়া খাটিয়া।
কাছ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া।।

লইয়া সকল কাছ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান।।[১২৪]

'কথুয়া' অর্থাৎ মোটা কাপড়ের চাঁদোয়া বা সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা হল অভিনয়স্থলের উপর। চাঁদোয়ার আকৃতি সাধারণত চৌকন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের আঙিনায় মঞ্চ বেঁধে অভিনয় উপস্থাপনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়নি। নাট্যকার সেলিম আল দীন যদিও উঁচু বাঁধানো মঞ্চের কথা বলেছেন তবু এত তাড়াতাড়ি মঞ্চ প্রস্তুত করাটাও সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। আর আঙিনায় নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক দর্শকের জন্য উঁচু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন পড়ে না। উঠোনে চৌকোনাকৃতি মাটি বা গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিয়ে মঞ্চ তৈরি করাটা এই স্বল্প সময়ে সম্ভব হতে পারে এবং স্থান-কালের প্রেক্ষিতে তা যৌক্তিকও বটে।

রঙ্গমঞ্চ সজ্জিত হলে নাটকাভিনয়ের প্রথম অঙ্ক রুক্মিণীর স্বয়ম্বর শুরু করার আগে সুকণ্ঠ মুকুলদত্ত নামগান করে নাট আরম্ভ করলেন—

কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ।।
প্রথম প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁপ করি বদন-বিলাস।।
মহাপাগ শিরে শোভে ধটী পরিধান।
দেখিয়া সভার হৈল বিস্ময় গেয়ান।।
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষীর বেশে জগতের প্রাণ।।
হাথে নাড়ি চারিদিগে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সভায়ে জাগায়।।[১২৫]

মঙ্গলসূচক কীর্তনের পর মঞ্চে হরিদাস প্রবেশ করলেন নাট্যবিষয়ক পূর্বকথা বিবৃত করার জন্য। তাঁর মাথায় 'মহাপাগ' অর্থাৎ পাগড়ি, পরণে 'ধটি' বা কৌপীন, মুখে গোপ (নকল), হাতে 'নড়ি' অর্থাৎ লাঠি। তাঁকে দেখে সকলে (সেখানে উপস্থিত দর্শক ভক্তবৃন্দ) হেসে উঠেছেন— হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।[১২৬] তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 'বৈকুণ্ঠের কোটাল' পরিচয় দেন। প্রভু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এখানে সকলকে ভক্তি বিলিয়ে দিতে এসেছেন। তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে দিতে এসেছেন বলেই গোঁফে মোচড় দিয়ে

তাঁর সহকারী কোটাল মুরারী গুপ্তকে নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। রূপসজ্জার এমন নিখুঁত বর্ণনা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল।

রূপসজ্জার বর্ণনা এখানেই শেষ নয়। এরপর মঞ্চে নারদের বেশে শ্রীবাস প্রবেশ করেন। চৈতন্যভাগবত রচনাকার বর্ণনা দিচ্ছেন—

মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্বগায়।
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারি দিগে চায়।।
রামাই পন্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমন্ডলু পাছে করিলা গমন।।
বসিতে দিলেন রাম পন্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন।।[১২৭]

নারদের সর্বাঙ্গে মাঙ্গলিক চিহ্ন তিলকের ফোঁটা দেখা যায়। মুখে লম্বা সাদা দাঁড়ি, কাঁধে বীণা, হাতে কুশ। শ্রীবাসের কাঁধেও রয়েছে বীণা, হাতে কমণ্ডলু। নারদের বেশ দেখে সবাই অবাক, কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি, এমনকি তাঁর স্ত্রী মালিনীও নয়। চৈতন্যদেব অভিনীত নাট্যে চরিত্রানুগ বেশভূষা কতটা নিখুঁত ছিল তা বৃন্দাবনদাস স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতেই এই বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় নারদের মধ্যে পৌরাণিক গাম্ভীর্যের পরিবর্তে লৌকিক ভাঁড়ের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে উঠেছে। নাট্যমাধ্যমটির জনপ্রিয়তা যে সেই সময় বেশ ভালোরকম ছিল তা বেশভূষার নিপুণ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। এর থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে সেই সময় ধ্রুপদী নাট্যধারার সমান্তরালে লোকায়ত নাট্যধারার অস্তিত্ব ছিল এবং চৈতন্যদেব সেই ধারাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেনন তাঁর নাট্যে। তিনি সমাজসংস্কারের জন্য যেভাবে পুরাণকে ভেঙে নিজ দর্শনের পরিপোষক করে তুলেছিলেন সেভাবে নাট্যের ক্ষেত্রেও মৌলিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানুষের কাছে চৈতন্যদেবের মতই সহজে ধরা দিয়েছে তাঁর নাটক। সেক্ষেত্রে উপস্থাপনভঙ্গী ধ্রুপদী রাখলে যে চলবে না তা হয়তো বিশ্বম্ভর বুঝেছিলেন বলেই হয়তো এমন উপস্থাপনভঙ্গীর ব্যবহার করেছিলেন। অভিনব অথচ নিখুঁত অভিনয়ে দর্শকেরা বেশ আনন্দিতই হয়েছিল। শ্রীবাসের অভিনয়ে আবেগাপ্লুত শচীমাতার মূর্ছাহত হওয়া এবং বিমুগ্ধ দর্শকের বিবরণ থেকে তা জানা যায়।

এরপর লক্ষ্মীর বেশে স্বয়ং নাটকের পরিচালক চৈতন্যদেব মঞ্চে প্রবেশ করেন। তিনি নেপথ্যগৃহে চরিত্রানুযায়ী সাজ করছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর।।
আপনা জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্বভের সুতা হেন আপনারে বাসে।।[১২৮]

এখনে 'গৃহান্তরে' অর্থাৎ আলাদা নেপথ্যগৃহে বা সাজঘরের ইঙ্গিত রয়েছে। চরিত্রেরা সেই সাজঘর থেকে মঞ্চে আসছেন এবং তা দেখে দর্শকেরা চমকিত ও অভিভূত হচ্ছেন। সাজঘরটি মঞ্চ থেকে দেখা যাচ্ছিল না বলেই হয়তো দর্শকেরা চমকিত হচ্ছিল।

এরপর নাট্যে রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন চৈতন্যদেব নাচতে নাচতে *ভাগবত*-এর শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁর অভিনয় ও ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে অন্যান্য অভিনেতারাও নাচতে লাগলেন। এভাবে প্রথম অঙ্কের শেষ ও দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনা দেখানো হয়েছে। অংশটি উল্লেখ্য—

প্রথমা প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পরবেশ।।
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে।।[১২৯]

'প্রহর' অর্থে যদি অঙ্ক বোঝানো হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে মঞ্চে অভিনেতা গদাধর প্রবেশ করছেন। এরপর দীর্ঘ সংলাপময় উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক অংশ *চৈতন্যভাগবত*-এ বর্ণিত হয়েছে। নাট্যবৈশিষ্ট্য সমন্বিত সেই অংশ উল্লেখ্য—

হাতে নাড়ি কাখে ডালী নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।।
ডাকি বোলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা।।
শ্রীবাস বলয়ে দুই কাহার বনিতা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে কেনে জিজ্ঞাস বারতা।।
শ্রীবাস বোলয়ে জানিবারে ত জুয়ায়।
হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়।।
গঙ্গাদাস বলে আজি কোথায় রহিবা।
ব্রহ্মানন্দ বলে তুমি স্থান খানি দিবা।।

গঙ্গাদাস বোলে তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য নাহি ঝাট তুমি নড়।।
অদ্বৈত বোলয়ে এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃসম পরনারী কেনে দেহ লাজ।।
নৃত্যগীতপ্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচহ ধন পাইবা প্রচুর।।
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর-প্রেম-পরকাশে।।
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।।
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে কোন জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন।।
প্রেমে নদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে।।
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি।।
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।।
যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্যপ্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে।।
হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণবমন্ডল।
সর্বগণ হইল আনন্দ কোলাহল।।
চৌদিগে শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন।।[১৩০]

দুগ্ধ-দধির ভার নিয়ে মথুরা যাওয়ার সময় রাধা ও সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বচসায় অসাধারণ নাট্যপরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নৃত্যপরিবেশনে নিপুণতা একদিকে যেমন অভূতপূর্ব শিল্পসৌষ্ঠব তৈরি করেছে তেমনি অন্যদিকে এই নৃত্যভঙ্গিমা আয়ত্ত করতে যে অভ্যাসের প্রয়োজন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ততপক্ষে গদাধর বেশ অভিজ্ঞ নর্তক ছিলেন বলেই মনে হয়। নাট্যে উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক অংশ চলাকালীন অনুচরগণ ‘সময়-উচিত গীত’ গাইছিলেন। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুসারে গান করার কথা বলা হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুসারে পদাবলী কীর্তন বিশেষ উপযোগী বলেই মনে করা যায়। এই ধরনের উপস্থাপন কৌশল লীলাকীর্তনে অহরহ ঘটতে দেখা যায়। অনুমান করা যায় যে চৈতন্যদেবের নাট্য পরবর্তীকালে লীলাকীর্তনের সংরূপ গঠনে বৈষ্ণবদের বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব পরিচালিত নাট্যে অভিনয় একেবারে জমে উঠেছে। গোপিকা রাধার বেশে গদাধর নৃত্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। ঠিক সেই সময় রঙ্গমঞ্চে বড়াই বেশধারী নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্যাশক্তি রূপে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ ঘটে। বৃন্দাবন্দাস বলছেন যে—

আগে নিত্যানন্দ প্রভু বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে ভাষে।।
মন্ডলী হইয়া সর্ব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা।।[১৩১]

অপূর্ব মোহনীয় রূপে সজ্জিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেকে দেখে দর্শকমণ্ডলী চিনতেই পারছিলেন না। তাঁর অসাধারণ নৃত্যে তিনি নিজেই স্থির থাকতে পারছেন না। একই সঙ্গে সীতা, পার্বতী, কমলা, ভাগীরথী ও মহামায়ার ভাবে অভিভূত চৈতন্যের বর্ণনা বৃন্দাবনদাস কাব্যিক সুষমায় ব্যক্ত করেছেন। আদ্যাশক্তির মধ্যে এত রূপের অস্তিত্ব দেখে অনুমান করা যায় যে বৈষ্ণবদের যে অচিন্ত্যভেদাভেদের তত্ত্ব রয়েছে তা এই নাট্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল দেবীর এক সত্ত্বায় পরিণতির দিকটি নাটকে চৈতন্যের বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে মেলানো যায়। শেষ পর্যন্ত জগদ্ধাত্রীর ভাবই নাটকে স্থিত হইয়েছিল। এরপর সকলকে মাতৃভাবে অভিষিক্ত করে বিষ্ণু সিংহাসনে বসলেন। অভিনেতা ও দর্শক বাৎসল্য রসে স্নাত হলেন। রাত পোহালো এবং ভোরের আলোয় নাটক সমাপ্ত হল।

মনে রাখতে হবে নবদ্বীপ ছিল একসময় সংস্কৃত শিক্ষার আখড়া। চৈতন্যদেব স্বয়ং ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষক। অন্যান্য অভিনেতারাও ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। নাট্যশাস্ত্রের নাট্যবৈশিষ্ট্য তাঁদের কাছে অজানা ছিল না। চৈতন্যদেব পরিচালিত এই অভূতপূর্ব নাট্যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ছোঁয়া থাকাই স্বাভাবিক। ড. সুকুমার সেন এই নাট্যাভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> বিশ্বম্ভরের এই এক্সটেম্পোর নাট্যাভিনয়ের বিবরণ দিয়ে গেছেন বৃন্দাবনদাস। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এর আগে আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুসারে নাট্যাভিনয়ের কোনো সত্য বিবরণ পাওয়া যায়নি।[১৩২]

এই নতুন নাটকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রানুসারে রীতিনীতি পালন করা হলেও বিষয় কিন্তু লৌকিক কৃষ্ণকথাই ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনেও তা ঘটতে দেখা যায়। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে আছে—

লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি।।[১৩৩]

লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কৃষ্ণকথার যথাযোগ্য সম্মান করা হয় এই নাটকে। সংরূপের দিক থেকেও অন্যথা ঘটেনি। উভয় নাট্যসংরূপের মিশ্রন চৈতন্যদেব পরিচালিত নাট্যে বেশ ভালোভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

চৈতন্যদেবের নাটক উপস্থাপনায় দোহারদের ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

জগৎজননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।।[১৩৪]

চৈতন্যদেব 'জগৎজননী-ভাবে' ভাবিত হয়ে নাচেন এবং তার পরিকরবৃন্দ উচিত সময়ে প্রয়োজনমাফিক গান পরিবেশন করেন। দোহার যেমন লীলানাট্যের মধ্যে একক ও সমবেত গান করে পালা এগিয়ে নিয়ে যান ঠিক একই বৈশিষ্ট্য এই নাটক উপস্থাপনকালেও পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের অভিনয়ে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বৃন্দাবনদাস। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

হেন নাচাইতে কেহো নারে কোনজন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ।।
কখনো বোলয়ে বিপ্র কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝায়ে যেন বিধর্বের বালা।।
নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন দেখিয়ে তখন।।
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝিয়ে প্রকাশ।।
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে।।
ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুলসুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে।।
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহাকোটি যোগেশ্বরী।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে।।[১৩৫]

পরিস্থিতি অনুসারে অভিনেতাদের অঙ্গসঞ্চালন করতে দেখা যাচ্ছে। কেবলমাত্র নৃত্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। মহাপ্রভুর ধ্যানে বসার অভিনয়ে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া তিনি কান্না ও

অট্টহাসির মাধমে সময়ানুগ ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। নাট্যে দর্শকেরাও অভিনয়ের অংশ হয়ে উঠছেন। শ্রীচৈতন্যের মাতৃবেশে স্তনদানের দৃশ্যে অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে অভূতপূর্ব নাট্যরসের উদ্গার ঘটেছিল। এই প্রক্রিয়ায় দর্শক হয়ে ওঠেন নাটকের অংশ। এই পদ্ধতি লৌকিক নাটকে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব যে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

চৈতন্যদেবের নাট্য উপস্থাপনায় আলোর ব্যবহার কেমন ছিল সে ইঙ্গিত সামান্য হলেও পাওয়া যায়। *চৈতন্যভাগবত*-এ বলা হয়েছে যে—

নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত।।
সম্মুখে দেউড়ি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।
চতুর্দিগে হরিদাস করে সাবধান।।[১৩৬]

সারা রাতব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা মশালের মাধ্যমে করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে চৈতন্যদেব চাতুর্যের সঙ্গে পালা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই পালার মাধ্যমে তিনি সকল বেদ, পুরাণ, লৌকিক আখ্যান, দেবীদেবতা, বিধিবিধানকে এক করে দেখানোর চেষ্টা করেন। চৈতন্যদেব, গদাধর ইত্যাদি অভিনেতা নৃত্যপটু ছিলেন। তাছাড়া দলে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে কীর্তন উপস্থাপন আগেও নীলাচলে রথযাত্রা ও কাজীদলনে দেখা যায়। লীলানাটকে নৃত্য করার সময় পূর্বস্মৃতি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলেই মনে হয়।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে চৈতন্যদেবের লীলানাটক প্রচলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই তথ্য প্রদানের পাশাপাশি আরেকটি দিক গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি তত্ত্বগ্রন্থরূপে কেবল পাঠ করাই হত না, তা গানের মাধ্যমে উপস্থাপিত হত। তবে এক্ষেত্রে *চৈতন্যচরিতামৃত* ব্যতীত *চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল* গীত হত। ধ্রুবপদের ব্যবহার কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় তাঁর কাব্য তত্ত্বগ্রন্থ রূপেই ছিল অধিক আদৃত। অন্য তিনজনের কাব্যেই ধ্রুবপদের ব্যবহার হয়েছে। বিশেষত লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে প্রতি পদের শুরুতেই রাগরাগিণীর সঙ্গে ধুয়ার ব্যবহার লক্ষণীয়—

তুড়ী—রাগ

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত গো গাইবে গৌরালীলা।।
কে কে আগে জাইবে গো,
গোরাগুণ গাইবে গো,
চল যাই পানী সাহিবারে।
হিয়া উথলে চিত কেবা পারে ধরিবারে।। ধ্রু।।[১৩৭]

ধ্রুবপদের ব্যবহার ছাড়াও রাগরাগিণীর প্রয়োগ *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্যে করা হয়নি। কিন্তু জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*-এ আছে—

ইবে শব্দ চামরসঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে।।[১৩৮]

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থটি গীত না হলেও অন্যান্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ গীত হত। মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় রূপটি এইসময় ব্যাপক জনপ্রিয় থাকায় এর উপস্থাপনেও তার প্রভাব বিস্তৃত। ‘চামরসঙ্গীত’ অর্থাৎ চামর দুলিয়ে পাঁচালির উপস্থাপনাকেই মনে করিয়ে দেয়। লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গীতসূচক ভনিতা পাওয়া যায়। তার একটি উল্লেখ করা হল— গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচন দাস।।[১৩৯] লোচন্দাসের কাব্য গান করে উপস্থাপনের ইঙ্গিত রয়েছে জয়ানন্দের মতই। অন্যদিকে *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের প্রায় প্রতি ভণিতায় গীত হবার উল্লেখ পাওয়া যায়—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।।[১৪০]

রাগরাগিণীর বহুল ব্যবহার দেখা যায় *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থ দু’টিতে। *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থেও পটমঞ্জরী, ধানশ্রী, মঙ্গলনাট রাগ, পাহিড়া ইত্যাদি রাগের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের নাম আদিতে *চৈতন্যমঙ্গল* ছিল। তিনটি গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মঙ্গলনাম এবং বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকায় প্রতিটি চৈতন্য-চরিতকাব্যে জনপ্রিয় মঙ্গল-পাঁচালির ধাঁচে সংগীত ও বাদ্য সহযোগে আসরে উপস্থাপিত হত।

প্রণয়মূলক আখ্যান

বাংলায় লোককথা, উপকথা, পুরাণ বা বাস্তব জীবনের চরিত্র নিয়ে উপস্থাপিত প্রণয়মূলক আখ্যান পরিবেশন করা হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার কৃত্য-ধর্মীয়-আখ্যানমূলক পাঁচালি ধারার পাশাপাশি প্রণয়মূলক পাঁচালির ধারা বাহিত হয়। ধর্মকর্ম পালনের পাশাপাশি মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনির প্রতি আসক্তি থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তুর্কি আক্রমনোত্তর বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান্তরে মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল গীতিকা নামক নাট্য আখ্যান। কাহিনির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ রক্তমাংসে গড়া নরনারীর জাগতিক প্রেমানুভূতি দিয়ে কাহিনির অবয়ব রচিত হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও উপস্থাপনভঙ্গী (mode of performance) দেশীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থীই ছিল। পাঁচালির বিভিন্ন আঙ্গিকগত উপাদান যেমন- বন্দনা, রাগরাগিণী, ধুয়া, পয়ার ইত্যাদির উপর ভর করে ছিল এর চলন।

কৃত্যমূলক পাঁচালির নৃত্যগীতাভিনয়ের অংশ প্রণয়োপাখ্যানের উপস্থাপনে গৃহীত হয়। প্রণয়কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগে শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* (চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ধাপে কিংবা পঞ্চদশ শতকের সূচনায় রচিত[১৪১]), দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খ্রি.) ও সাবিরিদ খান (১৫১৭-৮৫ খ্রি.) রচিত *বিদ্যাসুন্দর,* দৌলত উজীর বাহরামের *লাইলী মজনু* (ষোড়শ শতক), মুহম্মদ কবীর রচিত *মধুমালতী,* দৌলত কাজীর *সতীময়না* ও *লোরচন্দ্রাণী* (সপ্তদশ শতক), মাগন ঠাকুরের *চন্দ্রাবতী,* সৈয়দ আলাওল রচিত *পদ্মাবতী* (সম্ভবত ১৬৪৬ খ্রি.), *সয়ফুলমুলুকবদিউজ্জমাল* (১৬৫৮-৭০ খ্রি.), *সপ্ত* (হপ্ত) *পরকর, তোহফা* ও *সেকান্দারনামা* (১৬৭২ খ্রি.) ইত্যাদি। যদিও এই প্রণয়োপাখ্যানের অনেকগুলিই হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। পাঁচালির খোলসে প্রণয়কাব্যগুলিতে প্রাচীন বাংলার ধর্মতান্ত্রিক দৈবচেতনার পরিবর্তে এক অভিনব কাহিনির (মানব-মানবীর) আস্বাদ যুক্ত হয়। এতে দেবতার অলৌকিকত্ব নয় বরং প্রাধান্য পেয়েছে রক্তমাংসে গড়া মানুষের অনুভূতি। নাট্যকার সেলিম আল দীন এ সম্পর্কে বলেছেন—

> বাংলা আখ্যান কাব্যের ধারায় লাউ সেনের বীরত্ব, হরিশ্চন্দ্রের ধর্মসাধনা, নাথ-সিদ্ধদের আত্ম-কৃচ্ছ্রতা, কালকেতুর ভোজন ও শিকার, ফুল্লরার বারোমাস্যা, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার পাশাপাশি স্থান করে নিল জোলেখার কাম ও প্রেম, সয়ফুলের সমুদ্রযাত্রা, যুদ্ধ ও বীরত্ব, গহীন অরণ্যে মজনুর আর্তনাদ, লোররের প্রণয়াভিসার, বিবাহিত চন্দ্রাণীর অবৈধ প্রণয়। বাংলা কাব্যে পিশাচ-দৈত্য-ভূত এবং গন্ধর্ব-কিন্নরীদের পাশে সহজেই ঠাঁই করে নিল রাক্ষস-খোক্কস, জ্বীন, মায়াবী-নারী, অতিলৌকিক সী-মুর্গ্, কোহকাফের পরীরা।[১৪২]

গ্রামীণ আসরে আসরে প্রণয়োপাখ্যানগুলি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়া ষোড়শ শতকে প্রণয়মূলক গীতিকা একটি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। *মৈমনসিংহ গীতিকা* বা *পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা* বা *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* সপ্তদশ অষ্টাদশ শতক থেকে আজকের দিন পর্যন্ত অব্যাহত জনপ্রিয়তার শিখরে অবস্থিত।

পাঁচালি বা কথকতা জাতীয় আঙ্গিকের মত গীতিকাও নিতান্ত আসরের সামগ্রী। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতীরা কেবলমাত্র গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে আটকে থাকেনি। উপন্যাসে জায়গা পেয়েছে। মর্যাদা পেয়েছে শহুরে থিয়েটারে (*বুকঝিম এক ভালোবাসা* শ্রমণ চ্যাটার্জির একক অভিনয়ে উপস্থাপিত, *মহুয়া পালা* গৌতম হালদারের প্রযোজনায় 'নয়া নাটুয়া' নাট্যদল দ্বারা আয়োজিত ইত্যাদি)। থিয়েটারকে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করে চলেছে 'গ্রাম্যতার' তকমা পাওয়া সংরূপ ও কাহিনিগুলি। যদি এর মধ্যে নাট্যগুণ না থাকত বা আসরের সামগ্রী না থাকত তবে এই স্থানকালের গোলকধাঁধায় কবেই গীতিকা হারিয়ে যেত।

নাথসাহিত্য

নাথসাহিত্য বলতে যে সব রচনাকে বোঝানো হয় সেগুলি হল- *গোরক্ষবিজয়, মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীত, গোধন মাহাত্ম্য, চৌরঙ্গীনাথ, যোগীর গান, যোগী কাচ, যোগী চিন্তামণি* ইত্যাদি। *ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান গান, গোরক্ষবিজয়* প্রভৃতিকে দীনেশচন্দ্র সেন তারঁ *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে দশম-দ্বাদশ শতকের বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৩] কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথির বিচারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— কাজেই প্রাপ্ত নাথসাহিত্যকে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।[১৪৪] পালাগুলিতে সংগীত ও নৃত্যের সম্মিলনে নাট্য উপস্থাপনরীতি পরিলক্ষিত হয়।

গোরক্ষবিজয় কাব্যে গোরক্ষনাথ একজন নাট্যগীতসিদ্ধ নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গোরক্ষনাথ গুরু উদ্ধারে বেরিয়ে কদলীর দেশে নটী বেশে দাঁড়ালেন। দ্বার থেকে মৃদঙ্গের বোল শুনে মীননাথ চকিত হলেন। এরপর শিষ্য নৃত্যগীতের মাধ্যমে গুরুকে তত্ত্বকথায় মহাজ্ঞান দিলেন। প্রাচীন

বুদ্ধনাটকের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে *গোরক্ষবিজয়* কাব্যে। এই কাব্যের একটি বিশেষ অংশ তুলে ধরা হল—

নাচন্তে যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে।[১৪৫]

নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতে— বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপ নাথপন্থা।[১৪৬] সেক্ষেত্রে চর্যাপদের 'বিসমা' নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ গোরক্ষবিজয় কাব্যে সঙ্ঘটিত হতে দেখা যায়। নটীবেশ ধারণ করে পুরুষ গোরক্ষনাথের নৃত্যের যে ধরন তা এখনও বিভিন্ন পালায় দেখা যায়। যেসব পুরুষেরা নারীচরিত্রে অভিনয় করেন তাঁদেরকে স্বাভাবিক অবস্থাতেও নারীর আদবকায়দায় অঙ্গসঞ্চালন করতে দেখা ও মেয়েলি সুরে/টানে কথা বলতে শোনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। *চর্যাপদ*-এর সময় থেকে বা তার আগে পুরুষকে নারীর বেশে দেখাটা বেশ জনপ্রিয় ও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় ছিল বলেই মনে করা যায়। গোরক্ষনাথের 'ঘাঘরী' সজ্জা অর্থাৎ রাজপুত নারীর পোষাক নাটকের আহার্যের সামিল। বাদ্যযন্ত্র মাদলের কথা এই কাব্যে বারে বারেই এসেছে। এই কাব্যে নূপুরের (নেনুর) উল্লেখও পাওয়া যায়— গোর্খনাথ নাচায় নেনুর রুণুঝুণু।[১৪৭]

নাটক যে পেশা রূপে সেই সমাজে অর্থাৎ অষ্টম-দ্বাদশ শতকের আগেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। এই কাব্যেও পেশাজীবী নাটুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়—

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে
তোহ্মার মাদলে কেনে গুরু-গুরু বোলে।[১৪৮]

এখানে 'নাট কর' বলতে নাটক করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 'নাটুয়া' পদবী রূপে এখনও প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে বলতে বাধা নেই এই নাটুয়াদের পূর্বপুরুষদের পেশা একসময় ছিল নাটক করা। নটীবৃত্তিকে যে সুনজরে দেখা হত না তার ইঙ্গিতও *গোরোক্ষবিজয়*-এ রয়েছে—নাচিয়া গাহিয়া খাইতে কিসের পৌরস।[১৪৯] অথবা নাটভেস এড় তুহ্মি এ বড় কুর্সিত।[১৫০] 'নাটভেস' এর অর্থ নাট্যবেশ ও 'কুর্সিত' অর্থে কুৎসিত বোঝানো হয়েছে। নাট্যজীবীকার সঙ্গে যুক্ত নারী যে সাধারণত নিম্নশ্রেণির হতেন তা *চর্যাপদ*-এ ডোম্বীর নৃত্য প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের গান কাব্যে হীরা নটীর অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াকর্মে নাট্য-পেশাজীবীদের অবস্থান কিছুটা হলেও স্পষ্ট হবে। এই কাব্যে 'নটীর রূপসজ্জা' অংশে নটীর সাজসজ্জার বিবরণ পাওয়া যায়। হীরা নটীর খোপার বর্ণনা বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। শাড়ি, নাকের নথ, গলায় 'শতেশরী হার', হাতে 'রূপার তার', পায়ে 'বাগটি', সোনার কাঁচলি পরিহিতা এবং কপাল চন্দনচর্চিত, মুখে পান নিয়ে সে রাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাজা এলে হীরা বলে—

যেমন অদুনা রাণীক ছাড়ি আইছোঁ নটমন্দির ঘরে।
তার বন্দীর পায়ের রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে।।[১৫১]

এখানে 'নটমন্দির ঘরে' বলতে নাটক উপস্থাপনের ঘর বা প্রেক্ষাগৃহের কথা বোঝানো হয়েছে। নটীদের থাকার ব্যবস্থা এই নটমন্দিরেই যে হত তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। *গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*-এ আছে নৃত্যস্থল, নর্তকীদের বসন-ভূষণের বর্ণনা। হাড়িফা হনুমানকে নাচার জন্য জায়গা তৈরি করতে বললেন। হনুমান বন কেটে নাচ করার জায়গা করে দিল। এই বর্ণনার মাধ্যমে যে মঞ্চের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হল ভূমিসমতলে থাকা বৃত্তাকার মঞ্চ। এরপর 'হাড়ি জলন্ধর' শঙ্করের নাম জপতে জপতে 'ইন্দ্রের অপ্সরী' স্মরণ করেন—

ডাহিনে চন্দন বাটা, বাম করে সুবর্ণ ঝাঁটা,
আইলেন এক বিদ্যাধরী।।
পরনে পাটের শাড়ি, আগে দিল ছড়া ঝাড়ি,
আমোদিত করিল চন্দনে।
হাতেতে তৈলের খুরি, দ্বীপ জ্বলে সারি সারি,
আইল নব নাচলীর বেশে।
চাঁচর মাথার চুলে, করবী জাতি ফুলে,
ভ্রমর গুঞ্জরে কেশপাশে।
সীমন্তে সিন্দূরের ফোঁটা, নয়নে কাজলের ঘটা,
কর্ণে ফুল দিছে কর্ণপূর।।
অধর অরুণ আভা, মুখ যেন চন্দ্র শোভা,
দন্তগুলি যেন মোতিচূর।।[১৫২]

এক অভিনব নৃত্যনাট্যের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আলোকসজ্জার ব্যবহার লক্ষ করার মত। 'নাচনী'র বেশটি আহার্যের ব্যবহারে সে সময়ের মানুষের পারদর্শিতা নিরূপণে সাহায্য করে। একই সঙ্গে পরিবেশনরীতির সুস্পষ্ট বিবরণ এর পরেই আছে—

যোগ পাঁচালিতে গায়, নাচনী নাচিয়া যায়,
বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখয়াজ।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে, যেন তারাগণ সাজে,
নর্তকী করিল নানা সাজ।।
ঝনাঝন রণারণ, জয়ঘন্টা ঠনাঠন,
নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী।
চরণে বাজে নেপুর, শুনিতে যেন মধুর,
ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করি।।
যেন চিতে বাদ্য শুনি, চলিতে নাগরী যিনি,
চটকে যেন পূর্ণিমার শশী।
নাগরী নাগর সলে থমকে থমকে চলে,
যেন দেখি পূর্ণিমার শশী।।
...এইরূপে নাচনীতে নর্তকী গায় আমোদিতে
বঞ্চিলেন এক নিশি এথা।[১৫৩]

অবলীলায় নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহযোগে এই উপস্থাপন কোনও অংশেই নৃত্যনাট্যের থেকে কম নয়। এখানে অন্তর ও বাহিরের যুগ্ম উপস্থিতি সুকুর মামুদ তাঁর কাব্যের ক্যানভাসে এঁকেছেন। গবেষক-পাঠকের কাজ কল্পনার ডানা মেলে তা থেকে নাট্যরস আস্বাদন করা। সব মিলিয়ে মধ্যযুগীয় নাট্য উপস্থাপনরীতির বিবরণ নাথ সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতকে উদ্ভুত নাট্য-আঙ্গিক

সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকে উদ্ভুত ও বিকশিত নাট্যধারায় নাম করতে হয় যাত্রা, ঢপকীর্তন, জারিগান, বোলান গান, ঝুমুর, আলকাপ প্রভৃতির। 'যাত্রা' কথাটি অষ্টাদশ শতকে নাটকের আঙ্গিক রূপে ব্যবহৃত হলেও প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলার সংস্কৃতিতে শোভাযাত্রা, রথযাত্রা অথবা সংগঠিত চলন রূপে নির্দেশিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী করে চরিত্রমূলক উপস্থাপন যাত্রার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন পণ্ডিত গবেষকেরা। নাটকের পদবাচ্য রূপে যাত্রাকে নাটকের অন্তর্ভুক্ত করাটা হয়তো সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। সময়োপযোগী হয়ে পাঁচালি, কথকতার ধারা বিচ্ছিন্নরূপে পরিবেশিত হলেও (যেমন কালীয়দমন, সীতার বনবাস, মনসার ভাসান প্রভৃতি) তাতে যাত্রার তকমা জুড়ে দেওয়াটা শক্ত ছিল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের এই সংরূপগুলি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। সেক্ষেত্রে এটুকু বলে রাখা উচিত যে প্রতিটি সংরূপ নিজের মত

করে প্রতিষ্ঠা পেতে, আসরকে মাতিয়ে রাখতে ত্রুটি রাখেনি। নাট্যধর্মীতার উপর ভর করে এজাতীয় সংরূপের সহজ গতি নির্ধারিত হয়। হয়তো চটুল জনপ্রিয়তার লোভে বিষয়গত দিক দিয়ে তা কখনও রুচির মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু নাট্যগুণ যে তাতে ষোলো আনা বজায় ছিল বা এখনও আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

২:৩ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দশম-দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নাট্য সংরূপের বৈচিত্রসহ বিবরণ পাওয়া গেল। আদি ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত পুঁথির নিরিখে এই বিচার সংগঠিত হওয়ায় একটা যৌক্তিক পারম্পর্য বিধানও সম্ভবপর হয়েছে বলে মনে করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যযুগের শক্তিমান কবিদের হয়তো কোথাও কোথাও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উপস্থাপন মাধ্যমের উপর যেহেতু বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেহেতু উল্লেখ করা না করার মানদণ্ড সর্বত্র এক রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে বাংলায় যে ঋদ্ধ নাট্য ঘরাণা প্রচলিত ছিল তা সদর্পে বলা যায়। মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনাকালে, এক বিস্মৃতির সময়ে, হীনমন্য বাঙালির যত্নের অভাবে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ক্রমেই স্মৃতির পথ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। নাট্য সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রজন্মান্তর ঘটে না। এই কারণে নাটকের ইতিহাস রচনায় এত বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধ্রুবপদের ব্যবহার নাট্য উপস্থাপনে দোহারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গানের বিষয়বস্তু এবং ভাব অনুসারে চলত নৃত্য। নৃত্য পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। বাদ্য বাজানোর জন্য নিশ্চই দলে পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন। সাহিত্যে রয়েছে এর অজস্র প্রমাণ। এমত দলগত উপস্থাপনের রূপটি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ধারায় পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তন প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠান করেছে। আখ্যানধর্মী পাঁচালি জাতীয় রচনার উপস্থাপনেও এই রীতির অনুসরণ ঘটেছে। অভিনয় উপযোগিতা পদাবলীর তুলনায় আখ্যানধর্মী পাঁচালীতে বেশি থাকায় এতে নাট্য-উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পদাবলী এবং পাঁচালির বাহ্যিক রূপের তফাৎ থাকলেও উপস্থাপনগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ক্রমবিবর্তিত নাট্যধারা এই বৈচিত্র্যের সমাবেশে ততোধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

অনেক নাট্য সংরূপের কথা সঙ্কুচিত করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়কে মাথায় রেখে। বিশেষত অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক বা তার পরবর্তী সময়ের নাট্যসংরূপগুলি যেভাবে ও যে কারণে বিবর্তিত হচ্ছে তার নির্দেশ এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় অর্থে সঙ্কুচিত করা হয়েছে অথবা অনুল্লেখ্য থেকেছে। পদাবলী কীর্তনের উল্লেখ বহুক্ষেত্রে করা হলেও এর উপস্থাপনে নাট্য-বৈশিষ্টের বিচ্ছুরণ কতখানি হয়েছে তা নির্ধারণ করতে একটি আস্ত অধ্যায়ের অবতারণা করতে হয়। চৈতন্যদেরবের অনুপ্রেরণায় পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালির চিন্তাচেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব স্বমহিমায় বিরাজিত হবার সুযোগ পায়নি। তাঁর মহীরুহ ব্যক্তিত্বকে লঙ্ঘন করার মত আরেকজন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব না হওয়াটা এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য। ধর্মের পথে চলতে গিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করার প্রবণতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কীর্তন সেই ইতিহাসকে সযত্নে ধারণ করে চলেছে। নাট্যবৈশিষ্ট্যে ভর করে বরাবরই লীলাকীর্তন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থেকেছে। প্রভাবিত করেছে অন্যান্য উপস্থাপন-মাধ্যমগুলিকে। কীর্তনের নাট্যগুণে বাংলার মানুষ কতখানি মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল তা জানার বিস্তৃত পরিসর পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র

[১] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ৬

[২] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১০-১১। পৃ. ২৬

[৩] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ. ৩

[৪] তদেব। পৃ. ৫৩

[৫] ঘোষ, অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস* । কলকাতা: দেজ। ২০০৫। পৃ. ৫

[৬] শীল, বৈদ্যনাথ। *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা* । কলকাতা:এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং। ১৯৫৮। পৃ. i

[৭] মজুমদার, অতীন্দ্র। *চর্যাপদ* । কলকাতা: নয়া প্রকাশ। ১৯৬১। পৃ. ১৮

[৮] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ. ১

[৯] ঘোষ, অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস* । কলকাতা: দেজ। ২০০৫। পৃ. ১

[১০] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২। পৃ. ১

[১১] চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১২। পৃ. ৫০১

[১২] তদেব। পৃ. ৫০১

[১৩] ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭। পৃ. ২

[১৪] চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১২। পৃ. ৫৩৩

[১৫] ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭। পৃ. ১

[১৬] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮। পৃ. ১৭০

[১৭] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৩

[১৮] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ৪৪

[১৯] রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* । আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৪। পৃ. ৬৪০

[২০] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । ২য় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ১১৬

[২১] তদেব। পৃ. ১১৮-১১৯

[২২] তদেব। পৃ. ১১৯

[২৩] তদেব। পৃ. ১১৬

[২৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । ১ম খণ্ড। অবতরণিকা। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০০৯। পৃ. ২২

[২৫] Coomarswamay, Ananda and Duggirala, Gopala Kristnayya. *The Mirror of Gesture*. London: Harvard University press. 1917. Page 14

[২৬] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *সংগীত দামোদর* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৯। পৃ. ১৩১

[২৭] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ২

[২৮] রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* । আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৪২০। পৃ. ৪৫১

[২৯] চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা* । কলকাতা: ডি.এম, লাইব্রেরি। ২০০৫। পৃ. ২১১

[৩০] তদেব। পৃ. ২০৮

[৩১] মজুমদার, অতীন্দ্র। *চর্যাপদ* । কলকাতা: নয়া প্রকাশ। ১৯৬১। পৃ. ৪৪

[৩২] চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা* । কলকাতা: ডি.এম, লাইব্রেরি। ২০০৫। পৃ. ২০৮

[৩৩] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নাট্যধারা* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭। পৃ. ৭

[৩৪] জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭। পৃ. ১০

[৩৫] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ১৯৯

[৩৬] জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭। পৃ. ২১-২২

[৩৭] জাকারিয়া, সাইমন ও মুর্তুজা নাজমীন (সম্পা.)। *বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস*। ঢাকা: অয়াডার্ন পাবলিকেশন। ২০১০। পৃ. ১৯

[৩৮] জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭। পৃ. ১৭

[৩৯] জাকারিয়া, সাইমন ও মুর্তুজা নাজমীন (সম্পা.)। *বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস*। ঢাকা: অয়াডার্ন পাবলিকেশন। ২০১০। পৃ. ২৯

[৪০] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৫। পৃ. ৭২।

[৪১] তদেব। পৃ. ১৮৪-১৮৫

[৪২] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৪

[৪৩] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ৪৯

[৪৪] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৫। পৃ. ২৬৮

[৪৫] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৪

[৪৬] মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৭৩। পৃ. ২৮

[৪৭] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৪

[৪৮] মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৭৩। পৃ. ২৭

[৪৯] মুখোপাধ্যায়, দিলীপ। *বৃহৎ শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮। পৃ. ২১৭

[৫০] সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। কলকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি। ১৩৬৭। পৃ. ২৩৪

[৫১] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৪

[৫২] শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বর্ণমিছিল। ১৯৭১। পৃ. ৯৩

[৫৩] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ২৮

[৫৪] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৫

[৫৫] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৩২

[৫৬] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ৪৪

[৫৭] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৬

[৫৮] সেন, সুকুমার। *মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস* । *বিশ্বভারতী পত্রিকা* । বিশ্বভারতি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ২১৩-২১৪

[৫৯] চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্য উপাদান* । কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৯। পৃ. ২৫

[৬০] মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৭৩। পৃ. ৩১

[৬১] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ১৯৯৬। ঢাকা। পৃ. ৬১

[৬২] বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪। পৃ. ৫০৮

[৬৩] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ.৬৮

[৬৪] বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪। পৃ. ৫০৮

[৬৫] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৫৯

[৬৬] বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪। পৃ. ১৬৯

[৬৭] কুনডু, মণীন্দ্রলাল। *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* । কলকাতা: সাহিত্যলোক। ২০০০। পৃ.৮২

[৬৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ২০০৫। পৃ. ২৭

[৬৯] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ২০১৫। আনন্দ। পৃ. ১০৩

[৭০] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৬৪

[৭১] তদেব। পৃ. ৮২

[৭২] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ.২২১

[৭৩] তদেব। পৃ.২১৮

[৭৪] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ৬

[৭৫] দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯। পৃ. ৫

[৭৬] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ.৬৮

[৭৭] সেন, সুকুমার। *মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস* । *বিশ্বভারতী পত্রিকা* । বিশ্বভারতি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ২২৫

[৭৮] দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯। পৃ. ৩৬৯

[৭৯] তদেব। পৃ. ৪৮১

[৮০] ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পা.)। *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল* । শিলিগুরি: উত্তরবঙ্গ বিশ্বিবিদ্যালয়। ১৯৭৭। পৃ. ২৯৭

[৮১] দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯। পৃ. ৪৮১

[৮২] ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পা.)। *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল* । শিলিগুরি: উত্তরবঙ্গ বিশ্বিবিদ্যালয়। ১৯৭৭। পৃ. ৩৫

[৮৩] তদেব। পৃ. ৩১৯

[৮৪] তদেব। পৃ. ৩৯

[৮৫] সেন, সুকুমার। *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৪৬। পৃ. ৩৮

[৮৬] চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা। *মঙ্গলকাব্য : পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১১। পৃ. ১৬০।

[৮৭] নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.)। *কবিকঙ্কন চণ্ডী* । কলকাতা: রত্নাবলী। ১৯৯৯। পৃ.২৩৮।

[৮৮] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ২০৮

[৮৯] তদেব। পৃ. ১০৯

[৯০] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৮২

[৯১] মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *রামায়ণ* । কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর। ১৯৭৯। পৃ. ১৬৭

[৯২] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ১০৯

[৯৩] তদেব। পৃ. ১১৬

[৯৪] মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *রামায়ণ* । কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর। ১৯৭৯। পৃ. ৫০৮

[৯৫] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* । কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ৭০

[৯৬] তদেব। পৃ.৭০

[৯৭] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১১। পৃ. ৪৯০

[৯৮] তদেব। পৃ. ৫০৩

[৯৯] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ২০৮

[১০০] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ৯৫

[১০১] ঘোষ, মুনীন্দ্রকুমার। *কবি সঞ্জয়-বিরচিত মহাভারত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯। পৃ. ৫৫

[১০২] তদেব। পৃ. ৫৯

[১০৩] তদেব। পৃ. ১৮৩

[১০৪] তদেব। পৃ. ১৯১

[১০৫] তদেব। পৃ. ১৮৩

[১০৬] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১১। পৃ. ৩
[১০৭] তদেব। পৃ. ৩
[১০৮] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬। পৃ. ১০৫
[১০৯] তদেব। পৃ. ১১৫
[১১০] তদেব। পৃ. ১৩৩
[১১১] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৮৩
[১১২] তদেব। পৃ. ১৮৫
[১১৩] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৩। পৃ. ৩৩
[১১৪] তদেব। পৃ. ৩৩
[১১৫] তদেব। পৃ. ৩৩
[১১৬] তদেব। পৃ. ৩৩
[১১৭] তদেব। পৃ. ৩৩
[১১৮] সেন, সুকুমার। *চৈতন্যাবদান* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬। পৃ. ৪৪
[১১৯] সেন, সুকুমার। *মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস* । *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। বিশ্বভারতী প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ২২১
[১২০] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৬১
[১২১] তদেব। পৃ. ১৬১
[১২২] তদেব। পৃ. ১৬১
[১২৩] মজুমদার, বিমান বিহারী ও মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬। পৃ. ৭৭
[১২৪] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৬১
[১২৫] তদেব। পৃ. ১৬১-১৬২
[১২৬] তদেব। পৃ. ১৬২
[১২৭] তদেব। পৃ. ১৬২
[১২৮] তদেব। পৃ. ১৬২
[১২৯] তদেব। পৃ. ১৬৩
[১৩০] তদেব। পৃ. ১৬৩
[১৩১] তদেব। পৃ. ১৬৩
[১৩২] সেন, সুকুমার। *চৈতন্যাবদান* । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬। পৃ. ৪৭
[১৩৩] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ১৬৪
[১৩৪] তদেব। পৃ. ১৬৪
[১৩৫] তদেব। পৃ. ১৬৪
[১৩৬] তদেব। পৃ. ১৬৪
[১৩৭] বিদ্যারত্ন, কালীকিশোর (সম্পা.)। *চৈতন্যমঙ্গল* । কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮। পৃ. ৬১
[১৩৮] মজুমদার, বিমান বিহারী ও মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬। পৃ. ৪
[১৩৯] বিদ্যারত্ন, কালীকিশোর (সম্পা.)। *চৈতন্যমঙ্গল* । কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮। পৃ. ৬৯
[১৪০] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত* । কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. ৪
[১৪১] গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর (সম্পা.)। *শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা : নিবিড় পাঠ*। কলকাতা: গ্রন্থ বিকাশ। ২০০৮। পৃ. ৫
[১৪২] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ১৯৯৬। ঢাকা। পৃ. ২৭২
[১৪৩] সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। (প্রথম খণ্ড) কলকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি। ১৯৬১। পৃ. ২৩৪

[১৪৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* । কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৬-২০১৭। পৃ. ১৩৯

[১৪৫] করিম, মুন্‌শী আব্দুল (সম্পা.) *গোরক্ষ-বিজয়* । কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৯১৮। পৃ. ৯৪

[১৪৬] আল দীন, সেলিম। ১৯৯৬। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। পৃ. ৭

[১৪৭] করিম, মুন্‌শী আব্দুল (সম্পা.)। *গোরক্ষ-বিজয়* । কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৯১৮। পৃ. ৯৫

[১৪৮] তদেব। পৃ. ৯৬

[১৪৯] তদেব। পৃ. ১০০

[১৫০] তদেব। পৃ. ৯৭

[১৫১] ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্রের গান* । কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯। পৃ. ২২৩

[১৫২] তদেব। পৃ. ৪০৫

[১৫৩] তদেব। পৃ. ৪০৬

কীর্তনের আঙ্গিকবিচার ও নাট্য-আঙ্গিক

৩:০ ভূমিকা

সাহিত্যক্ষেত্রে আঙ্গিকবিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আঙ্গিক নিরূপণে ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঐতিহ্যের উপর সাহিত্যতত্ত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে একথা সত্য যে সাহিত্য রচনার পর বহুকাল অতিবাহিত হলে সে সম্পর্কিত তত্ত্ব রচিত হয়। তত্ত্বের প্রভাবে অনেক সময় পরবর্তী শিল্প-সাহিত্য ক্রমেই একরৈখিক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক বিচার বরাবরই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণিকরণ ও বিন্যাসের রূপ একদিনে নির্দিষ্ট হয় না। মান্যতার বিচার চলে শতাব্দী জুড়ে। অনেক সময় পরস্পরবিরোধী মতের সহাবস্থানও লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সমালোচকদের অনেক বেশি মুক্তমনের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে বাংলা-নাটক বলতে যে সাহিত্যসংরূপের প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্যে কৃত্যানুষ্ঠান থেকে থিয়েটারের রূপান্তরে একটি পারম্পর্য বজায় রয়েছে। বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন থিয়েটার সংরূপের আনয়ন ঘটে তখন সমাজে প্রচলিত নাট্য উপস্থাপন থেকে কৃত্যানুষ্ঠান বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়নি। ভারতবর্ষের মতো দেশে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে উপস্থাপনের প্রচলন হওয়া তখনও সম্ভব ছিল না। সেই পথ অতিক্রম করা ছিল বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে যদি এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্ভব হত তাহলে বাংলার একটি নিজস্ব নাট্যধারার অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যেত। পাশ্চাত্য নাট্যধারার সঙ্গে এই দেশের নাট্যধারার একটি তুলনামূলক পাঠ সম্ভব হত।

কীর্তনের আঙ্গিক নিরূপণে একে নাটক বলার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যের তাত্ত্বিক গ্রন্থ *নাট্যশাস্ত্র*-এর বিচারে বা দেশজ নাট্যধারার প্রেক্ষিতে লীলাকীর্তনকে নাট্য অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্যের সম্মিলিত উপস্থাপন রূপে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কীর্তনের আঙ্গিক নিরূপণে এর শ্রেণিবিভাগ নির্দেশ করে বিশেষভাবে লীলাকীর্তনের গঠনগত দিক, যেমন— বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা,

ঘরানা, তাল, অঙ্গ ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হবে। নাটগীত, ধামালী, ঝুমুর, লীলানাটকের ঐতিহ্য অনুসারে বাংলা সাহিত্যের উপস্থাপনার দিকটি উঠে আসবে। এর পাশাপাশি *নাট্যশাস্ত্র, নাটকচান্দ্রিকা, উজ্জ্বলনীলমণি, সঙ্গীতদামোদর* ইত্যাদি গ্রন্থের বিভিন্ন সূচকের নিরিখে কীর্তনের আঙ্গিক বিচার করা অত্যন্ত জরুরি। *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত রস, নায়ক-নায়িকা, মঞ্চ, অভিনয়, দশরূপক, বৃত্তি প্রভৃতির বিচারে লীলাকীর্তনের আঙ্গিক বিচার করে দেখতে হবে তা নাটকের পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারছে কী না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি আকর গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। রূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি* ও *নাটকচন্দ্রিকা* গ্রন্থদু'টি রচনায় *নাট্যশাস্ত্র*-এর ভূমিকা অসামান্য। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের গ্রন্থ যদি *নাট্যশাস্ত্র*-কে ধরা হয় তবে বাংলা নাটকের শাস্ত্রীয় রূপ *নাটকচন্দ্রিকা* ও *উজ্জ্বলনীলমণি*-র মধ্যে নিহিত রয়েছে। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র নির্মাণ এবং পদাবলী ও লীলাকীর্তনের উপস্থাপনায় রূপ গোস্বামীকৃত গ্রন্থগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

৩.১ নাটগীত ও মধ্যযুগের বাংলা অভিনয় পাঠের ধারা

নাটগীত সংরূপটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'নাটগীত' শব্দটি ভাঙলে 'নাট' ও 'গীত' শব্দ দু'টি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এতে গানের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করা হত। এতে নটের অস্তিত্বও রয়েছে। এই ধরনের নাটক বলতে প্রথাগত (বর্তমানে প্রচলিত নাটকের ধারণা) নাটক বোঝায় না। মধ্যযুগের নাটক ছিল ভিন্ন স্বরূপের। বর্তমানে প্রচলিত নাটকের গদ্য সংলাপ এতে ছিল না। সাহিত্যে বাংলা গদ্যের প্রচলন হয় উনিশ শতকে। এর আগে চিঠিপত্রের মধ্যেই ছিল গদ্যের জগৎ। মধ্যযুগের নাটকে চরিত্রের কথোপকথন হত সংগীতের মাধ্যমে। এক ধরনের পদ্য সংলাপ এতে ব্যবহৃত হত। একটি আসর বা মঞ্চে (এই মঞ্চ যে কোনো ফাঁকা স্থান হতে পারে) দর্শকদের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে বিশিষ্ট (দেবতা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি) ব্যক্তির কাহিনি উপস্থাপন করা হত গানের মাধ্যমে। চরিত্রদের উক্তিপ্রত্যুক্তি মূলক কথোপকথন সংগীতের আকারে পরিবেশিত হত বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকে। এরূপ উপস্থাপনের কৌশল বাংলার প্রাচীন নাটক উপস্থাপনরীতির অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। নাটগীত সংরূপটিও এর ব্যতিক্রম নয়। গীত-নৃত্য-বাদ্যময় অভিনয় ছিল

এর মূল কাঠামো। নাটগীত সংরূপটির মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মূল শ্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের উপস্থাপনমাধ্যম কেমন ছিল তা লিপি লিখনে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এবং সর্বোপরি সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কবি জয়দেবের কাব্য *গীতগোবিন্দ*-এ নাটগীতের উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নাটগীত সম্পর্কিত ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার আমলের শেষের দিকে নাট্যকর্মের ধারাগুলি অল্পবিস্তর নতুন রূপ নিচ্ছিল। তার মধ্যে একটিকে বলতে পারি "নাট্যগীত"। এই নাট্যগীতের ভালো উদাহরণ জয়দেবের গীতগোবিন্দ।[১]

দলগত উপস্থাপন ছিল নাটগীতের মূল বৈশিষ্ট্য। কবি জয়দেবের একটি ঘরোয়া দল ছিল এবং তিনি নিজে ছিলেন সেই দলের অধিকারী। সেই সময়ে অধিকারীই ছিলেন একাধারে অভিনেতা, সূত্রধার, কথক এবং গায়েন। জয়দেব গাইতেন এবং পদ্মাবতী নাচতেন। মঞ্চ ছিল রাজসভা ও মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত ছিল। নৃত্যের মাধ্যমে দেবস্তুতি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রীতির অন্তর্গত। *গীতগোবিন্দ* কাব্য উপস্থাপনের সময় বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করতেন পদ্মাবতী। কবি জয়দেবের বন্ধু পরাশর ও অন্যান্যরা ছিলেন দোহার ও বাদ্যকর। অর্থাৎ মূলগায়েন এবং দোহার মিলে সংগীত উপস্থাপন করতেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে দোহারের সমার্থক হিসেবে 'পালি' ও 'জুড়ি' শব্দগুলির প্রয়োগ করা হত। পরবর্তীকালে পদাবলী কীর্তনে ও পাঁচালিগানে (কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি) এই রীতির প্রচলন দেখা যায়।

নাটগীতের ধারাতেই উপস্থাপিত হত বড়ুকবির *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য। *গীতগোবিন্দ* ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে তিনটি চরিত্র— কৃষ্ণ, রাধা ও দূতী (বড়ায়ি)। তিনটি চরিত্রের কথোপকথনে কাহিনির বিকাশ হয়েছে। মাঝে মাঝে রয়েছে শ্লোক। কৃষ্ণের কাহিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। বিশেষত জয়দেব যেভাবে কৃষ্ণকে একজন মার্জিত দেবতা করে তুলেছিলেন তা কবির অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের লোকায়ত অমার্জিত ও আদিরসাত্মক রূপ ধামালী ও ঝুমুর নাট্যসংরূপের মাধ্যমে গ্রামবাংলার আসরে উপস্থাপিত হত। যদিও সেকালে আদিরসাত্মক অমার্জিত নাট্যরূপকে আজকের মতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নজরে দেখা হত না।

জয়দেবের কাব্য কালক্রমে সর্বভারতীয় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মীয়ভাবাপন্ন ভারতভ্রমন এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল। জনপ্রিয়তার কারণেই হোক বা ধর্মীয় ভাবাবেগের কারণেই হোক *গীতগোবিন্দ*-এর উপস্থাপনা প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যমাধ্যমগুলিতে। অসমের অঙ্কিয়ানাট, উড়িষ্যার লীলানাটক, মিথিলার কীর্তনীয়া নাটক ও নেপালের বাংলা-মৈথিলী নাটকে নানামাত্রায় *গীতগোবিন্দ* কাব্যের অনুসরণ ঘটেছে।

জয়দেবের পর যে নাটগীতি পাওয়া যায় তা উমাপতি ওঝার *পারিজাতহরণ* নাটক। এর ভাষা সংস্কৃত নয়, প্রাদেশিক লৌকিক মৈথিলী ভাষা। অনেক সমালোচক নাটকটিকে প্রাচীন ‘সংগীতনাটক’ সংরূপ হিসেবেও দেখেছেন। এই নাটকে চরিত্রসংখ্যা পাঁচ— কৃষ্ণ, রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যভামার সখী ও নারদ। জয়দেবের পদাবলীতে নাটগীতের উপস্থাপনায় নাটের চেয়ে গীতের প্রাধান্য ছিল অধিক। উমাপতির *পারিজাতহরণ*-এ গীতের প্রাধান্য থাকলেও নাটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ গীতকে ছাপিয়ে নাটক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য আদিরসে পরিপূর্ণ। এতে ধামালী বা ঢামালী ও ঝুমুরের অস্তিত্ব প্রবলভাবে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লৌকিক কাহিনি কম ছিল না। এতে আদিরসের আধিক্য থাকলেও তা ছিল সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী। এই কাব্যে আদিরসের উপস্থাপনায় সকল প্রকার দর্শকের (শিক্ষিত মার্জিত রুচিসম্মত ও অশিক্ষিত) মনই তুষ্ট হয়েছিল। যদিও বৈষ্ণবেরা আদিরসের প্রাধান্য নেক নজরে দেখেননি। এই কাব্যের উপস্থাপনগত দিকটির সিংহভাগ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক নাটগীতেরই ঐতিহ্য বহন করেছে। প্রাচীন বাংলায় বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ নাট্যসংরূপের অভাব ছিল না। নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংরূপেই সাযুজ্য ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নৃত্য-গীত-বাদ্য ছিল নাটকের বাহন। নাটক উপস্থাপন করার সময়ে কখনো কখনো একটিমাত্র সংরূপের ব্যবহার নির্দিষ্ট নিয়মিত পদ্ধতিতে করা হত না। স্থানকাল অনুসারে সংরূপের সংমিশ্রণ ঘটত। তাতে নাট্যরস ব্যহত হত না। ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দর্শনের মতই যেন বিবিধ নৃত্য-নাট্যসংরূপ ঘনীভূত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যমাধমে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলা পদাবলী কীর্তনের উৎস রূপে জয়দেবের *গীতগোবন্দ* কাব্যটিকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। তাঁর রচত চব্বিশটি গান বৈষ্ণব কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে প্রশ্ন হল, বৈষ্ণব পদাবলীর উপস্থাপন সেযুগে কেমন ছিল? এক্ষেত্রে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের উপস্থাপনরীতি অনুকরণীয় হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্যের নয়। নাটগীত সংরূপের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যের সম্ভাবনা এতে হয়তো ক্ষীণ মনে হতে পারে, কিন্তু নাট্যরস তাতে কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। একক পদাবলীর কথা চিন্তা না করে যদি পরপর ঘটনাক্রম অনুসারে পদাবলী কীর্তনের একটি সামগ্রিক রূপের কথা ভাবা যায় তবে নাটগীতের উত্তরাধিকার মিলবে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনে। মধ্যযুগের একটি আসরে যখন মহাজনদের পদ গাওয়া হত (এখনও হয়) তখন রাধাকৃষ্ণমূলক কাহিনীর চিত্র পরিস্ফুটনে একাধিক বৈষ্ণব পদাবলী গীত হবার সম্ভাবনাই দৃঢ় হয়ে ওঠে। পদাবলী কীর্তনের নাট্যবৈশিষ্ট্য আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনে। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক চরিত্রাভিনয়ের অভাব দূর হয়েছে লীলাকীর্তন সংরূপে।

গীতগোবিন্দ-এর উপস্থাপনরীতি যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবেশনরীতি যে নাটগীতের সংরূপকেই অনুসরণ করবে তাতে আর আশ্চর্যের কী। বৈষ্ণব পদাবলী ছিল একটি অধিকারী কেন্দ্রিক নাট্যমাধম। দলে দোহারের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। নৃত্যের উপযোগিতা এতে যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনে সংগীতের ভূমিকা নাটের তুলনায় অধিক মাত্রায় রয়েছে। নাট্যভাব প্রকাশের সুসংবদ্ধ রূপ সেকালে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করার চল ছিল। তাতে উচ্চমার্গের সংগীত ব্যবহার করা হত। সেক্ষেত্রে ভক্ত-শ্রোতা-দর্শকদের নেহাত সাধারণ হলে চলত না। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদেরা সাধারণ শ্রোতার মনকে তুষ্ট করতে কীর্তনের সংরূপগত বদলের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। চৈতন্যদেব কানাইয়ের নাটশালে 'কৃষ্ণ চরিত্র লীলা' বা কৃষ্ণলীলা উপভোগ করেছিলেন। এর সহজতায় তিনি মুগ্ধ হন। সাধারণের মনকে তুষ্ট করার উপায় উপলব্ধ হয় লীলাজাতীয় নাট্যের দ্বারা। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশিত নাট্যে সকল শ্রেণির ভক্ত-দর্শক উপস্থিত ছিলেন এবং তা সমানভাবে উপভোগ করেছিল। এই প্রচেষ্টা থেকে পরবর্তীকালে কতগুলি নাটকও লেখা হয়। যেমন— রূপ গোস্বামী রচিত *ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব,* কবিকর্ণপূর রচিত

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটক ইত্যাদি। কিন্তু নাটকের ভাষা সংস্কৃত এবং *নাট্যশাস্ত্র* সম্মত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে তা সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নবতর সংরূপের যা বাংলার একেবারে নিজস্ব সম্পদ, জন্ম হয় লীলাকীর্তনের। এতে সংগীতকে ছাপিয়ে নাট্যগুণ বড় হয়ে ওঠে। এতে পদাবলী কীর্তন ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি হয়। 'আখর', 'কথা', 'তুক'-এর সংযোজন করা হয় লীলাকীর্তনে। নাট্যলীলা বা লীলানাট্য হিসেবে পরিচিত নাট্যরূপের জনপ্রিয় কাহিনী অনুসারে লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তবে এই সকল নবতর পন্থার আড়ালে থাকা নাটগীত ও গীতিনাট্যের রূপ কখনোই মুছে যায়নি। চৈতন্য তিরোধানের পর খেতুরী মহোৎসবে লীলাকীর্তনের সর্বসম্মত রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যগুণ বড় হয়ে উঠলেও লীলাকীর্তন থেকে পদাবলী কখনোই বাদ যায়নি আর ভবিষ্যতে হয়তো যাবেও না। সব মিলিয়ে নাটগীতের উত্তরাধিকার বহন করে ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন।

শ্রীচৈতন্যদেব মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে যে অভিনয় উপস্থাপন করেছিলেন তা সংরূপগত বিচারে নাটগীত দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীচৈতন্যের চরিত্রাভিনয় সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাটগীতাভিনয় করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে তার যে উল্লেখ পাই তাতে বোঝা যায় যে তিনি রুক্মিণীহরণ ও বড়ু চণ্ডীদাসের অনুযায়ী রাধাবিরহ অভিনয় করেছিলেন।[২]

তিনি স্পষ্ট ভাষায় নাটগীত সংরূপের উল্লেখ করেছেন। যদিও নাট্যকার সেলিম আল দীন এই উপস্থাপনকে লীলানাট্য রূপেই দেখতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন যে—

> পুরাণকে নবোদ্ভুত কৃষ্ণতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রেরণায় চৈতন্যদেব লীলাভিনয়ের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত মানব মধ্যে দেবতার বিচিত্র শক্তি ও রূপান্তর প্রত্যক্ষ করার ধর্মীয় আবেগ থেকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ে অনিবার্য রূপেই লীলা নাট্যের প্রসার ঘটেছিল।[৩]

চরিত্রাভিনয়, রূপসজ্জা, কৃত্যানুষ্ঠান নাটগীতে যুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু নবোদ্ভূত নাট্যসংরূপগুলি থেকে দলীয় উপস্থাপন, সংগীত, বাদ্য, নৃত্যকে কখনোই বাদ দেওয়া যায়নি। নতুনভাবে একটি নাট্যসংরূপ সংগঠিত হবার সময় হঠাৎ করে একেবারে আনকোরা কিছু উদ্ভাবন সাধারণত সম্ভব হয় না। এই কার্যে পুরাতনের অনুকরণ ও অনুসরণ সর্বদা হয়ে থাকে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। লীলানাট্য সংরূপের

ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। মধ্যযুগের মানুষের নাট্যস্পৃহা প্রসমিত করতে যে নবতর নাট্যসংরূপ গড়ে উঠছিল তাতে নাটগীতের আত্তীকরণ করা হয়েছিল। দেবতার (রাম ও কৃষ্ণের) লীলাজাতীয় নাট্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় হয়ে উঠেছিল নাটগীত নাট্যসংরূপটি। মধ্যযুগে 'লীলা' শব্দটির বহু অর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন- ঐশ্বরিক ক্রিয়াকর্ম, খেলা, নাটক ইত্যাদি। নাটক অর্থে 'লীলা' কথাটির প্রচলন তাই নতুন কিছু নয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের মতই 'অঙ্কের বন্ধনে' নাট্য-উপস্থাপন শঙ্করদেবের অঙ্কিয়া নাটেও দেখা যায়। অসমের অঙ্কিয়া নাটে পরোক্ষভাবে জয়দেবের উপস্থাপনরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অঙ্কিয়া নাটে সংগীতের আধিক্য তো ছিলই, উপরন্তু যুক্ত হয়েছে নৃত্যের প্রাচুর্য। অনেকটা মণিপুরি রাসনৃত্যের মতই নৃত্যের বিশেষ স্থান রয়েছে এতে। কালের নিয়মে নাটগীতের স্বরূপ ক্রমেই রূপান্তরিত হয়েছে। নাটকে বৈচিত্র্য আসার পাশাপাশি নামেও এসেছে পরিবর্তন। শ্রীচৈতন্যদেবের নাট্য-উপস্থাপনায়ও তাই ঘটতে দেখা যায়। তাই কেউ এই নাট্য-উপস্থাপনাকে নাটগীত তো কেউ লীলানাটক বলে চিহ্নিত করছেন।

জয়দেব তাঁর কাব্যকে 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' বলেছেন। 'মঙ্গল' শব্দটি শুভকামনা বা কল্যানকামনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই কাব্যের আস্বাদনে কবি ও শ্রোতার অথবা উপস্থাপনকারী ও ভক্তের কল্যান হয়। এই অর্থে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* নাটগীত মঙ্গলগান। ভগবানের কাছে ভক্তহৃদয়ের আর্তি ও সকলের মঙ্গলকামনা মধ্যযুগের সাহিত্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একইভাবে 'বিজয়' শব্দটিও দেবতার জয়যাত্রা বা বিজয়কাহিনি প্রকাশে ব্যবহৃত হত। গ্রন্থনামে কল্যানের নিমিত্তে 'মঙ্গল' এবং ভক্তির দিক দিয়ে 'বিজয়' যুক্ত হত। এই যুক্তিতে মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যই মঙ্গলার্থে রচিত হয়েছে। কাব্যের নামকরণে 'মঙ্গল' এবং 'বিজয়' শব্দগুলি যুক্ত হয় সেই অভিপ্রায় থেকেই। যেমন- *কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণবিজয়* ইত্যাদি। কিন্তু এক সময় বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্বে নামকরণে 'মঙ্গল' কথাটি বাদ পরতে দেখা যায়। কারণ মঙ্গলকাব্য রূপে ভিন্ন সংরূপ তখন বাংলায় বেশ দাপটের সঙ্গে বিরাজিত। লৌকিক দেবদেবীদের এই জনপ্রিয়তা বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের একাংশ বিশেষত বৈষ্ণবেরা ভালো নজরে দেখেনি। 'মঙ্গল' শব্দটির ব্যবহারে তাই

বৈষ্ণবদের আপত্তির জায়গা তৈরি হয়। যেমন *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের নাম পূর্বে ছিল *চৈতন্যমঙ্গল*। ধর্মীয় দ্বন্দ্বে তা পরিবর্তিত হয়। তবে শুভকামনা প্রকাশের আদি স্বরূপ তাতে মুছে যায়নি।

মধ্যযুগে কাব্য রচনার একটি জনপ্রিয় সংরূপ ছিল পাঁচালি। মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য, অনুবাদকাব্য, প্রণয়মূলক কাব্য ইত্যাদি এক বৃহৎ সাহিত্যসম্ভার পাঁচালি আকারে পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেন মহাশয় পাঁচালির স্বরূপ নির্ধারণ করে বলেছেন—

> আগেই বলিয়াছি পুরানো পাঞ্চালী কাব্য দুই রকমের— নাটগীত ও আখ্যায়িকা।[৪]

অর্থাৎ আখ্যান ও উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক অভিনয়ের মাধ্যমে পাঁচালি আসরে উপস্থাপিত হত। দেবতার পূজা ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে পাঁচালি উপস্থাপিত হত। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে একটি আসরে ঘট প্রতিস্থাপন করা হত দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করে। পাঁচালির কিছু অংশ গানের মতো নাচের তালে তালে গাওয়া হত। একে ‘নাচাড়ি’ বলা হয়। বাকি অংশ সুরে তালে আবৃত্তি করা হত। এই পদ্ধতি ‘শিকলি’ বা ‘পয়ার’ নামে পরিচিত। পাঁচালি একটি দলগত উপস্থাপন পদ্ধতি। একজন অধিকারী বা মূলগায়েন পালা উপস্থাপন করতেন। তাঁর হাতে থাকত কঙ্কন (তোড়া) ও চামর এবং পায়ে থাকত নূপুর। তাঁর সাহায্যকারীদের বলা হত ‘পালি’ বা ‘দোহার’। এঁরা ধুয়া গাইতেন এবং প্রয়োজনমাফিক মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজাতো। অধিকারী ও দোহারের সম্মিলিত প্রয়াসে নৃত্য-গীত-বাদ্য যুক্ত অভিনয় পদ্ধতি নাটগীতের উপস্থাপনরীতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় নাটগীত সংরূপটি মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের রূপরেখা নিরূপণে ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সংস্কৃত নাট্যসংরূপের পাশাপাশি বাংলা নাট্যসংরূপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ঝাঁ-চকচকে ব্যয়বহুল মঞ্চের পরিবর্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণ অথবা সমতলে মাটির আসরে হত বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অভিনয়। বহুচরিত্রের পরিবর্তে হয়তো এক অধিকারি হয়ে উঠতেন সর্বেসর্বা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকতেন দোহার। গদ্য সংলাপের জায়গায় পদ্যময় সংগীত এক সুরের মূর্ছনা তৈরি করতে সক্ষম হত। বাদ্যে ও নৃত্যের চালিকাশক্তির উপর ভর করে দর্শক-শ্রোতা মনোরঞ্জন প্রধান হয়ে উঠত। এসবের বৈচিত্র্যে কি নাট্যগুণ হারিয়ে যায়? হয়তো যায় না। বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশে তা হয়ে ওঠে বাংলার নিজস্ব নাট্যসম্পদ।

৩:২ কীর্তনের আঙ্গিক

কীর্তনের আঙ্গিক পরিস্ফুটনে এর শ্রেণিবিভাগ, গঠনগত দিক, তালপদ্ধতি, ঘরানা, রসবিভাজন ইত্যাদির কথা চলে আসে। কীর্তন বাংলার একটি প্রাচীন প্রাণবন্ত ও রসায়িত সংগীত-বিশেষ। বাংলার পদাবলী কীর্তন অন্যতম ধ্রুপদী সংগীতপদ্ধতির অনুসারী। অনেক সাহিত্য সমালোচক কীর্তনকে শাস্ত্রীয় সংগীতের আখ্যা দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্রজরাখাল দাসের মত হল—

> আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি ধ্রুপদ এবং পাখোয়াজের মতই এই সমৃদ্ধশালী এবং উচ্চস্তরের পদাবলী কীর্ত্তন গান এবং শ্রীখোল বাদ্য প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীখোলের তাল পদ্ধতি এতই উচ্চস্তরের যে ইহাকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।[৫]

তবে কেবলমাত্র ধ্রুপদী সংগীতচর্চার অনুশাসন মেনে পদাবলী কীর্তন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠতে সক্ষম হয়নি। কীর্তনে উপস্থাপনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। লৌকিক সুরতরঙ্গ এতে বিশেষ মিষ্টতা প্রদান করে। কেবল সুরই নয় বাদ্য ও নৃত্যের ভূমিকাও কিছু কম নয়। সব মিলিয়ে কীর্তনের উপস্থাপনে ধ্রুপদী ও লোকজ ধারার এমন সমন্বয় বাংলার শিল্প সংস্কৃতিতে দুর্লভ সামগ্রী। উপস্থাপনের বিচারে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীকীর্তন নাট্যগুণে ভরপুর। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষও বটে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তা ক্রমেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে।

যে ভক্তিভাবুকতা নিয়ে কীর্তনের উদ্ভব তা অনেকটাই আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে বদলে গেছে। পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্যরকম করে ভাবা যায়, ক্লাসিকাল ধারার অন্তর্ভুক্ত হলে কীর্তনে এমন পরিবর্তন আসত না। ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্যই হল চিরন্তন বাঁধাধরা পদ্ধতির কঠোর অনুশাসন। এই চর্বিতচর্বণের বৈশিষ্ট্য কীর্তনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। নদীর অভিমুখ যেমন নদীই ঠিক করে তেমনি কীর্তনগানের অভিমুখ স্বয়ং কীর্তনীয়াই ঠিক করেন। কীর্তনে সেই স্বাধীনতা আছে যেখানে নাম এবং নামী এক হয়ে যান। বিজ্ঞানমনস্কতাই হোক বা আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির কারণেই হোক ভক্তিভাবে তারতম্য ঘটেছে। তবে উপস্থাপনের দিকটি আজও বেশ জোড়ালো থাকায় কীর্তনের গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র বিরাজমান। গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কীর্তনের সম্প্রচারে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি।

বর্তমানকালে এই সংরূপটির কী কী আঙ্গিকগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নির্ধারণ করা অনেকটা কঠিন। কারণ সেই প্রাচীন সময়ের গাওয়া পদ লিখিত আকারে পাওয়া গেলেও, তার উপস্থাপনরীতির দলিল সামান্যই পাওয়া যায়। তখনকার মহাজনদের পদাবলীতে 'আখর', 'কথা', 'তুক' প্রভৃতি সংযোজনের কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কীর্তনের গায়নরীতি খাঁটি রাখার কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়ণ করা কতটা শক্ত তা সকলেরই বোধগম্য আছে। বিশেষত কীর্তনের মতো প্রাচীন সংরূপের ক্ষেত্রে তো নয়ই। জনপ্রিয়তা পেতে হলে যুগোপযোগী হওয়াটা একরকম প্রাথমিক শর্তের মধ্যে পড়ে। অনেক গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। মধ্যযুগের কীর্তনপদ্ধতি ও তার সঙ্গে যুক্ত কৃত্যানুষ্ঠানের অনেক কিছুই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে। আবার নতুন কিছু যে যুক্ত হয়নি তা বলাও ঠিক হবে না। তবে আশার কথা হল পণ্ডিত-গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিস্মৃত সংস্কৃতির অনেকাংশই পুনরুদ্ধার হয়েছে। আশা করা যায় আগামী দিনে কীর্তনের আরও নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হবে। বিশেষত নাট্য-আঙ্গিকের দিক দিয়ে পদাবলী কীর্তন কতটা পরিপূর্ণতার দাবি রাখে তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৩:৩ কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন ধরনের কীর্তন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনও তা বহাল আছে। বিশিষ্ট তাত্ত্বিকেরা 'কীর্তন' আঙ্গিকটির নানা শ্রেণিবিভাজন মৌলকভাবে সম্পন্ন করেছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র কীর্তনকে দুই ভাগে বিভিক্ত করেছেন যথা- 'নামকীর্তন' এবং 'লীলাকীর্তন'।[৬] ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কীর্তনকে 'নামকীর্তন' ও 'লীলাকীর্তন' –এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৭] ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী কীর্তনের দু'টি ভাগের কথা বলেছেন। একটি 'কথকতা কীর্তন' বা 'শুককীর্তন' এবং অপরটি হল 'নারদীয়কীর্তন' বা 'কীর্তনগান'। তিনি প্রচলন অনুযায়ী ৯ ধরনের 'কীর্তগানের' কথা বলেছেন। যথা- 'বন্দনাকীর্তন', 'প্রার্থনাকীর্তন', 'আরতিকীর্তন', 'অধিবাসকীর্তন', 'পরবগান', 'সূচককীর্তন', 'নামকীর্তন', 'পদাবলীকীর্তন' এবং 'লীলা' বা 'পালাকীর্তন'।[৮] একইভাবে, ড. কৃষ্ণা বক্সী কীর্তনকে দু'টি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- 'শুককীর্তন' এবং 'নারদীয়কীর্তন'। নারদীয়কীর্তনের তিনটি ধরনের কথা বলা হয়েছে। যথা- 'নামকীর্তন', 'লীলাকীর্তন' এবং 'প্রার্থনাকীর্তন'।[৯]

বন্দনাকীর্তন গানে গুরু এবং শ্রীকৃষ্ণকে একাকার করে গাইবার প্রচলন দেখা যায়। এছাড়া গৌরবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, রাধাকৃষ্ণ বন্দনা প্রভৃতি বন্দনাসংগীতের অন্তর্গত। পালার প্রথমে বন্দনাকীর্তন উপস্থাপন পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের একটি বিশেষ অংশ রূপে পরিগণিত হয়। পালা উপস্থাপনের আগে বন্দনা অংশ অবশ্য পালনীয় পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে, ভক্তপ্রাণের আকুতি প্রকাশের জন্য আত্মনিবেদন, ভগবান ও গুরুর চরণে শরণাগতির অভিলাষ-জ্ঞাপন, দৈন্যবোধ, বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা ইত্যাদির অভিপ্রায়ে পদকর্তারা বিভিন্ন পদ রচনা করেছেন। ভগবানের কাছে নিজের আর্তি প্রকাশ করে সাধকোচিত মনোভাব প্রকাশক এই গান 'প্রার্থনা কীর্তন' রূপে বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত। 'আরতিকীর্তন' ভগবানের সামনে খোল-করতাল-কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে সম্পন্ন হয়। মন্দিরে বা ভক্তের বাড়িতে নির্দিষ্ট (মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্ন ভোগারতি, সন্ধ্যারতি) সময়ে এই গান গাওয়া হয়। 'অধিবাস কীর্তন' বা 'মঙ্গল অধিবাস কীর্তন' অনুষ্ঠানের আগের দিন সম্পন্ন একটি আচারমূলক কীর্তন। পরদিন কীর্তন মহোৎসবের আয়োজন হবে —এই সংকল্প করার জন্য এই অধিবাস কীর্তনের আয়োজন করা হয় আগের সন্ধ্যায়। এই ধরনের কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। পরবগান বৈষ্ণবসমাজে রাধাকৃষ্ণের জন্য বিশিষ্ট তিথি (হোলি বা দোল, ঝুলন, রাস, ফুলদোল, বাসন্তীরাস ইত্যাদি) অনুসারে বিশেষ পালাগানের ('হোলিলীলা', 'ঝুলনলীলা', 'রাসলীলা' ইত্যাদি) আয়োজন করা হয়। সূচক কীর্তন বৈষ্ণব আচার্য ও গুরুবর্গের তিরোধান তিথিকে উপলক্ষ করে গাওয়া হয়। অনেক সময় গৌরচন্দ্রিকায় সূচককীর্তনের পদ গেয়ে বৈষ্ণব আচার্যদের স্মরণ করা হয়।

কীর্তন সংরূপটির শ্রেণিকরণে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য স্বল্পসময়ে হঠাৎ করে নির্ধারিত হয়নি। বিভাজনের ক্ষেত্রে সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। তবে সকলেই যে প্রচলন অনুসারে কীর্তনের শেণিবিভাগ করেছেন তা স্পষ্ট। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপযোগিতা অনুসারে কীর্তনের বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। তাই সকলের মতকে মিলিয়ে কীর্তনের প্রচলনকে যদি প্রাধান্য দিতে হয় তবে তিন ধরনের কীর্তন এখনও বেশ জনপ্রিয় ও সর্বাধিক প্রচলিত। এগুলি হল— নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন,

লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন এবং পদাবলী কীর্তন। কীর্তনের শ্রেণিবিভাজনের ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই এই তিন বিভাজনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন

নামকীর্তনে হর (হরি) ও কৃষ্ণের ক্রমাগত উচ্চারণ সুর ও ছন্দে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বিষ্ণুর অন্যান্য নাম, রাধা নাম এমনকি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের নামও উচ্চারণ করতে শোনা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে কীর্তন যখন অনেকে মিলে গাওয়া হয় তখন তা সংকীর্তন হয়ে ওঠে। দিনে অথবা রাতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে কখনো পথে চলতে চলতে, নৃত্য করতে করতে নামসংকীর্তন করা যায়। বাদ্য রূপে মৃদঙ্গ ও করতাল-ই যথেষ্ট। চৈতন্যদেব গৃহবন্দী নামকীর্তনকে মুক্তি দেন এবং নগরকীর্তনের প্রচলন করেন।

সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি—এই চার যুগের আলাদা আলাদা নাম নির্দেশিত আছে। এর মধ্যে কলিযুগের মানুষের জন্য যে 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' নামের নির্দেশ আছে তা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।[১০]

চার যুগের চারটি নামকে 'তারকব্রহ্ম নাম' বলা হয়। তারকব্রহ্ম নামে ত্রাণক্ষমতা আছে বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই নাম ছাড়াও চৈতন্য সমসাময়িক কালে বিভিন্ন নামকীর্তন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল—

হরি হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।[১১]

চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তেরা যে সব নাম নানাভাবে কীর্তন করেছেন তার একটি এখানে তুলে ধরা হল—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।।[১২]

এছাড়া বিভিন্ন সমাজবাড়িতে গুরুস্থানীয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র নামগানের অবতারণা করেন। বাঙালি আজও নিভৃতে বা অভ্যাসবসে অথবা সম্মিলিতভাবে নামকীর্তন করে থাকেন। অনেক সময় দীক্ষাগ্রহণকালে গুরু তাঁর শিষ্যকে নাম প্রদান করেন। এই নাম নির্দিষ্ট সময় মেনে জপ করার নিয়ম বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণবদের মধ্যে বিচিত্র নামকীর্তনের প্রচলন থাকলেও চৈতন্যদেবের সময় থেকে নামকীর্তন এবং নগরসংকীর্তন হিসেবে 'হরেকৃষ্ণ' তারকব্রহ্ম নাম বেশ সমাদৃত হয়ে এসেছে। তাঁর সমসাময়িক সময়ে নামকীর্তন প্রচলনের কথা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে সবিস্তারে পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক সময়ে কীর্তনের স্বরূপ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই কীর্তনে গায়ক-বাদকসহ দল গঠন করা হত। অন্ততপক্ষে দু'জন শ্রীখোলবাদক, বেশ কয়েকজন গায়ক, একজন মূল গায়ক নিয়ে কমবেশি পনেরো-কুড়িজন লোকের একটি সম্প্রদায় হত। এখন যদিও পাঁচ জনের দলও দেখা যায়। দলগত উপস্থাপনে নাটগীতের উত্তরাধিকার বহন করেছে কীর্তন সংরূপটি।

নির্দিষ্ট সময় ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে নামকীর্তন করা হয়। প্রতিদিন আট প্রহর করে ষোল, চব্বিশ, বত্রিশ, চল্লিশ এমনকি বাহাত্তর বা তার বেশি সময় জুড়ে নামকীর্তন হতে পারে। এই সংকল্প রক্ষা করতে তিন-চারটি দল প্রস্তুত রাখতে হয়। বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, সুর-তালের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনে নামকীর্তন আস্বাদ্যমানতায় ভরে ওঠে। নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে এর উপস্থাপন হলেও এই শ্রেণির কীর্তনকে গানের অতিরিক্ত কিছু বলা ঠিক হবে না। এতে কোনো কাহিনি থাকে না। অভিনয়ের সুযোগ একেবারেই নেই। নাট্যরসের আস্বাদ তাই পাওয়া যায় না। বরং ভক্তিরসের আধার এই গীত। সংরূপগত দিক দিয়ে নামকীর্তন বা নামসংকীর্তন 'সংগীত'-এর পর্যায়ভুক্ত করাই সঙ্গত।

পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন

লীলাকীর্তন, রসকীর্তন, পদকীর্তন, পালাকীর্তন ও পদাবলী কীর্তন —এই নামগুলি প্রায় সমার্থক রূপে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক ড. বিনয়কুমার মাহাতা পদাবলী কীর্তনকে পালাকীর্তনের সমার্থক রূপে তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তার বক্তব্যের কিছু অংশ উল্লেখ করা হল—

> চৈতন্য-পরবর্তী যুগে কীর্তন থেকে সংকীর্তন এবং তারপর সংকীর্তন থেকে পালা-কীর্তন বা পদাবলী-কীর্তন হয়ে ওঠার ব্যাপারে কিন্তু মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।[১৩]

দেখা যাচ্ছে, পালাকীর্তন ও পদাবলী কীর্তন সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ড. বর্ণালী রায় লীলাকীর্তন সম্পর্কে বলেছেন— লীলাকীর্তনের অপর নাম পদকীর্তন বা পদাবলীকীর্তন।[১৪] তবে বিশেষজ্ঞরা অনেকেই পদাবলী কীর্তন ও পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তনকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিশেষত ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী *বাংলার কীর্তন গান* বইতে পদাবলী ও লীলাকীর্তনের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

> এর প্রতিটি পদ একটি কীর্তন। এমন এক বা একাধিক মহাজন-কৃত পদগানকেই বলা হয় 'পদাবলী কীর্তন'। এক্ষেত্রে লীলাবিন্যাসের প্রয়োজন কম, গানটির উপস্থাপনই বড় কথা।[১৫]

তিনি পদাবলী কীর্তনকে কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করেন। অন্যদিকে পালা বা লীলাকীর্তনের সঙ্গে পদাবলী কীর্তনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে—

> পদাবলী কীর্তন মূলতঃ পালা কীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগুলি পদকে সংকলিত করে ঘটনার নাটকীয় বর্ণনার উপস্থাপনকল্পে করা হয়— পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন।[১৬]

পদাবলী কীর্তনকে তিনি লীলা বা পালাকীর্তনেরই অংশ মনে করেন। লীলাকীর্তনে মহাজনদের যে পদ গাওয়া হয় তা পদাবলী কীর্তন রূপে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মত হল—

> শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত 'নামগান' বা সংকীর্তনের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলার রসায়িত লীলাবিষয়বস্তুকে নিয়ে পরবর্তীকালে ঠাকুর নরোত্তম-প্রবর্তিত কীর্তনগান তথা লীলাকীর্তন রসকীর্তনে পরিণত হয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে খেতুরীর মহোৎসবে যে বিরাট বৈষ্ণব-সম্মিলনের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে ঠাকুর নরোত্তমদাস 'গৌরচন্দ্রিকা'-র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবপদগানের ঠাটে বা গঠনে বিলম্বিত লয়ে পদাবলীকীর্তনের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর সেই কাজে সহায়ক ছিলেন বাদক গৌরাঙ্গদাস ও দেবীদাস, দোহার শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ এবং আরও অনেক বিদগ্ধ বৈষ্ণব-মহাজনগণ।[১৭]

পদাবলী ও লীলাকীর্তনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায়, লীলা বা রসকীর্তন কখনোই পদাবলী কীর্তনকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। পদাবলী ছাড়া লীলারসের আস্বাদন কল্পনাই করা যায় না। তাই এদের অভিন্ন কল্পনা করা হয়তো তেমন দোষের নয়।

বাঙালির নিজস্ব প্রাণের সামগ্রী বৈষ্ণব পদাবলী। পদাবলীর 'পদ' শব্দের দ্বারা 'গান' বা 'গীত' বোঝানো হয়। প্রাচীনকাল থেকেই পদ বলতে গানের দুই ছত্রকে বোঝানো হত। সেক্ষেত্রে পদাবলীর

অর্থ গানের সম্মিলিত রূপ। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে ড. সুকুমার সেন পদ অর্থে 'গান' মনে করলেও তিনি পদাবলীকে গীতিকবিতা বলার পক্ষপাতী।[১৮] কিন্তু অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে—

> এখনকার দিনে 'পদ' মানে একটি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-কবিতা বা গান আর পদাবলী মানে বৈষ্ণব-কবিতা বা গান সমূহ।[১৯]

অন্যদিকে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিকবিতা বলে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, বৈষ্ণব পদাবলীকে সাধারণভাবে গীতিকবিতা বলা হলেও তা সুর করে ছড়ার মতো করে আবৃতি করা হত না। পদাবলী গান করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। তাই পদাবলীর সংরূপ হল গান, গীত বা সংগীত।[২০] গীতিকবিতা সংরূপে গান থাকে একথা ঠিক। কিন্তু এতে কবিতা রূপে পাঠ করার প্রবণতা দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হত গানের কথা মাথায় রেখে। গান করার জন্য পদকর্তারা রাগরাগিণীর নির্দেশ ও তালের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভক্তমনকে তুষ্ট করতে গানের বিকল্প হিসেবে কবিতা পাঠ করার কথা ভাবা সমীচীন হবে না।

পদাবলী পাঠ করা যায় না এমনটা নয়। তবে তা একক ঐকান্তিক পাঠ। কিন্তু এর সার্থকতা গানের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয়। উদাহরণ হিসেবে যদি রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতির কথা ভাবা যায় তাহলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হবে। তাঁদের গানগুলি পাঠ করাই যায়। কিন্তু গানের মাধ্যমে সুরের ছোঁয়ায় তাতে গভীর অনুভূতি তৈরি হয়। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, যে সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হচ্ছে সেই সময়ে মানুষের শিক্ষার হার আজকের মতো ছিল না। নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণের মাহাত্বসূচক বাণী পৌঁছানোর কাজ পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমে করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা রূপে বিবেচিত হত। তাই বৈষ্ণব পদগুলি গানের আকারেই লেখা হত। এক্ষেত্রে ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর মতটি উল্লেখ্য—

> কীর্তনগানের জন্য উপযোগী করে প্রাচীনকালের কতিপয় বৈষ্ণব আচার্য কবি (মহাজন) কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই একটি করে পদ। এমন পদ কত আছে তার সীমা নাই। তবে যে-সব পদ পদাবলী সংকলনে সংকলিত হয়েছে তার সবগুলি গান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল কিনা তার যথার্থ প্রমাণ নাই। তবে নানাবিধ গবেষণা-সূত্রে যে-সব সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় এর সিংহভাগ কবিতাই ছিল প্রসিদ্ধ গান। এর প্রতিটি পদ একটি কীর্তন। এমন এক বা একাধিক মহাজন-কৃত পদগানকেই বলা হয় 'পদাবলী কীর্তন'।[২১]

চর্যাপদ-কেও চর্যাগান বলা হয়। কেবলমাত্র গান বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। উপস্থাপনে *চর্যাপদ*-এর গান চরম নাট্যরসের বস্তু। বুদ্ধনাটকের কথা আগেই জানা গেছে। নৃত্যনাট্যময় এই গানের ধারায়

জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দ* রচনা করে বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তনের অগ্রপথিক হয়ে ওঠেন। তাঁর হাত ধরে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলার সংস্কৃতিতে নব দিগন্তের ছোঁয়া পায়। তিনি কৃষ্ণকথাকে বিবিধ বৈচিত্র্যের সমাবেশে কামহীন ভক্তিরসের আধার করে তুলেছিলেন। বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে বৈষ্ণব পদাবলীর এক ঐশ্বর্যময় যুগে পদার্পণ করেছেন। পদাবলী কীর্তন সেই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী।

আনুষ্ঠানিকভাবে খেতুরী মহোৎসব থেকে লীলাকীর্তনের প্রচলন শুরু হয়। তবে এর আগেও যে বিক্ষিপ্তভাবে লীলারস চর্চার প্রক্রিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল তা আগেই জানা গেছে। নবদ্বীপের বাইরে শ্রীখণ্ডে কীর্তনের এরূপ প্রচেষ্টা নতুন নয়। তবে চৈতন্যদেব যে জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ শুনতেন তা থেকে অনুমান করা যায় নামকীর্তনের পাশাপাশি পদাবলী কীর্তনের প্রচলন ছিল। নামকীর্তনের আসরে পালাবদ্ধ রসের কীর্তনকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপনের মাধ্যমে বৈষ্ণব সমাজে এই ধরনের লীলারস আস্বাদন ও চর্চার একটা সার্বজনীন অনুমোদন পাওয়া যায় খেতুরী মহোৎসব থেকেই।

মহাজনদের পদাবলী কীর্তন অনেকসময় সাধারণের বোঝার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত। ব্রজবুলি ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞ মহাজনদের নিপুণ অলঙ্কার প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। পদাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়েই লীলাকীর্তন সংরূপটি তৈরি হয়। পদাবলীতে গীত-নৃত্য-বাদ্য যুক্ত ছিল। উপরন্তু লীলাকীর্তনে যুক্ত হল কাহিনির নাট্যরস। সংরূপের বিচারে লীলাকীর্তনকে কেবলমাত্র গান বললে ভুল হবে। এতে নাটকের যাবতীয় গুণ রয়েছে। বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলি লীলা নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে শুভঙ্কর রচিত *সঙ্গীত দামোদর* (ষোড়শ শতকের পূর্বে রচিত)-এর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নির্দেশ উল্লেখ্য—

ভাবো হাবানুভাবৌ গতিসময়দশাস্থান্দূতীবিভাবাঃ
স্ত্রীপুংসৌ নাদগীতস্বরগমকপগণা মূর্ছানাবর্গতানাঃ।
গ্রামো রাগাঙ্ঘ্রিতালশ্রুতিসচিবকলাবাদ্যমাত্রাঙ্গহারা
নৃত্যং নির্দোষগানালতিলয়নরসাঃ কৃষ্ণলীলাং বহন্তু।।[২২]

অর্থাৎ ভাব, হাব, অনুভাব, গতি, সময়, দশা, স্থান, দূতী, বিভাব, নায়ক-নায়িকা, নাদ, গীত, স্বর, গমক, গণ, মূর্ছনা, বর্গ, তান, গ্রাম, রাগ, গীত চরণ, তাল শ্রুতি, সচীব কলা, বাদ্য, মাত্রা, অঙ্গহার,

নৃত্য, লয়, রস, সমস্তই কৃষ্ণলীলা বাহন করুক। মধ্যযুগে 'লীলা' কথাটি নাটক অর্থে ব্যবহার করা হত। কৃষ্ণলীলার প্রকাশে নাটকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়। কীর্তনীয়ারা লীলা উপস্থাপনকালে এই দিকগুলি বিশেষভাবে লক্ষ রাখেন।

কৃষ্ণলীলার সঙ্গে পরবর্তীকালে চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের লীলাও যুক্ত হয়। এই লীলারসের আস্বাদনে যে কীর্তনের অবতারণা করা হয় তাই লীলাকীর্তন নামে পরিচিত। এতে রসের বিলাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপভোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়, তাই লীলাকীর্তন রসকীর্তন নামেও পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা, দ্বারকা ও বৃন্দাবনলীলাকে ছোট ছোট পালায় ভাগ করে (যেমন কুঞ্জভঙ্গ, দান, মান, মাথুর, গোষ্ঠ, নৌকাবিলাস ইত্যাদি) মহাজনদের পদ সহকারে কীর্তন করা হয় বলে একে পালাকীর্তনও বলা হয়। বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাস এই পালাগুলিতে নিহিত রয়েছে। নাটকের আঙ্গিকে কীর্তনকে যাচাই করতে এর গঠনগত দিক বিচার করা আবশ্যক।

৩:৪ কীর্তনের গঠন

কীর্তনের বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা, পঞ্চাঙ্গ, ঘরানা, রাগরাগিণী, তালপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় এই সংরূপের বাহ্যিক গঠনগত দিক। এর অন্তরে ফল্গুধারার মতো নাট্যরস প্রবাহিত হয়। গঠনগত আলোচনায় বোঝা যাবে সেই সময়ের মানুষ কীর্তনকে নিয়ে কতটা গভীরভাবে ভেবেছিল। গভীর চিন্তার সামগ্রী ছিল বলেই কীর্তন এতটা সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কীর্তনকে ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল সংগীতধারা ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মনে রাখতে হবে কীর্তন কখনোই ছোট জনগোষ্ঠীর পরিচায়ক নয়, তা ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। শিক্ষিত পরিশিলিত চিন্তাধারায় কীর্তনের বিকাশ। চৈতন্যদেব স্বয়ং ছিলেন সুগায়ক ও নৃত্যপটু। তাঁর পার্ষদদের অনেকেই ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীত, বাদ্য ও নৃত্যে দক্ষ পণ্ডিত। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য, দামোদর পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, নরহরি সরকার, নরোত্তম দাসের মতো অগণিত পণ্ডিতেরা কীর্তন গান করতেন। অনেকে কীর্তনগান তো গাইতেনই উপরন্তু বিশিষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ সেকালেই প্রখ্যাত পদকর্তা ও কীর্তনীয়া ছিলেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস বৈষ্ণবসমাজে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে কীর্তনের গঠন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ক। কীর্তনের বন্দনা

সাধারণত কীর্তন গান আরম্ভ করার আগে বন্দনা করা হয়। প্রথমে বন্দনা, তারপর গৌরচন্দ্রিকা গান করে লীলাকীর্তন আরম্ভ হয়। বন্দনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম পালন করা হয়। এক্ষেত্রে ড. কৃষ্ণা বক্সীর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য—

> বন্দনা করারও একটি নিয়ম আছে। যেমন – প্রথমে গুরু-বন্দনা, তারপর বৈষ্ণব-বন্দনা, গৌর-বন্দনা, রাধারানী-বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা, সর্বশেষে কৃপা-প্রার্থনামূলক শ্লোক পাঠান্তে বন্দনা সমাপ্ত ক'রে তারপর গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করা হয়।[২৩]

বন্দনার বিষয়বস্তু নামকরণ থেকেই অনুমিত হয়। এই কীর্তনে মূলগায়েনের গুরুবন্দনায় ব্যক্তিক অনুভূতি ও আবেগ প্রাধান্য পায়। অনেক ক্ষেত্রে গুরুকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয় করে গাওয়া হয়। বিশেষত সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে গুরুবন্দনা এক অন্য মাত্রা পায়। বন্দনা কীর্তন বৈষ্ণবদের নবধা ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ। মধ্যযুগে 'বন্দনা' একটি সুপ্রচলিত শব্দ। বিশেষত মঙ্গলকাব্যে বন্দনার প্রচলন দেখা যায়। ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর মতে—

> 'বন্দনাগান' মঙ্গলগান এবং 'কড়চা' সূত্রেই উদ্ভুত এবং প্রাচীনকালের নিয়ম অনুযায়ী যে-কোন গ্রন্থকার গ্রন্থসৃষ্টির প্রারম্ভেই যে যাঁর উপাস্য দেবতা সকলকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ভাষায় একটি করে বন্দনা লিখতেন।[২৪]

কীর্তনের ক্ষেত্রে 'বন্দনা' অংশই এক প্রকারের গান। তাল, সহজ এবং পরিচিত সুরে গাওয়া হয়। অনেক সময় কীর্তন গায়ক এসব বন্দনা-গানের সঙ্গে ভক্তদের অন্তরের কিছু কিছু ভাবের উপযুক্ত আখর সংযোজন করে বন্দনা-গানকেই কীর্তনের একটি বিশেষ শ্রেণিতে রূপায়িত করে থাকেন। কীর্তনীয়া বন্দনাগানের পর গৌরচন্দ্রিকা অংশে উপনীত হন।

খ। গৌরচন্দ্রিকা

বৈষ্ণবসমাজে সাধারণ বিশ্বাস আছে যে, কলিযুগে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ চৈতন্যদেব। তাঁরই আরেক নাম গৌরচন্দ্র বা গৌরাঙ্গ। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব এই চিন্তার ফসল। রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদ

করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। তাই তাঁকে অনুসরণ না করে রাধাকৃষ্ণলীলারসের অবতারণা করা বৈষ্ণব সমাজে দোষের কাজ। তাছাড়া কীর্তনে গৌড়াঙ্গের অসামান্য ভূমিকা থাকায় তাঁকে লীলাকীর্তনে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাকীর্তনের আগে ঠিক সেই লীলার অনুরূপ শ্রীচৈতন্যের লীলাপ্রসঙ্গ গান 'গৌরচন্দ্রিকা গান' নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিকভাবে খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন করলেও অনুমান করা হয় এর আগেই অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যের নামগান প্রচলনের পাশাপাশি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। লীলাকীর্তন যদি তিন ঘন্টার পালা হয় তবে কমবেশি এক ঘন্টা গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয়ে থাকে। আসরের ভাব অনুসারে এর সময়ের তারতম্য ঘটে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৌশলগ্রামে এক কীর্তন আসরে কীর্তনীয়া সুরজীৎ বসু মহাশয় প্রায় তিন ঘন্টা ধরে কেবল গৌরলীলার গান করেন, যদিও তাঁকে রাধাকৃষ্ণলীলা গান করার জন্য বায়না করা হয়েছিল। ভক্তদের তাতে কোনো সমস্যা হয়নি।

কীর্তনীয়ারা বন্দনা গান বসে বসে করলেও গৌরচন্দ্রিকা গান দাঁড়িয়ে পরিবেশন করেন। এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। গৌরাঙ্গ হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কীর্তনের আসরে গৌরচন্দ্রিকার গানে তিনি উপস্থিত হন। সেই আসরে কীর্তনীয়া কখনোই বসে গান করতে পারেন না। আসরে আবির্ভূত ভগবানকে উঠে দাঁড়িয়ে সন্মান জ্ঞাপন বৈষ্ণবসমাজে শিষ্টাচারের অংশ বলেই বিবেচনা করা হয়। কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা বেশ জনপ্রিয় বিষয়। শব্দ হিসেবে 'গৌরচন্দ্রিকা'-র একটি বিশেষ তাৎপর্য সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। সূচনা বা ভূমিকা অর্থে 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়।

গ। কীর্তনের অঙ্গ

পদাবলীর ভাষা অনেকসময় সাধারণের বোঝার পক্ষে কঠিন হয়। বিশেষত ব্রজবুলি (কৃত্রিম ভাষা) ভাষা রাজসভার শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভাষায় গোস্বামীদের রসশাস্ত্র বোঝা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ব্রজবুলি ছিল একটি সাহিত্যিক ভাষা। এই ভাষায় লোকে কথাও বলত না এবং তার অর্থ বোঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া লীলাকীর্তনের মাঝে ব্যবহৃত চরিতগ্রন্থের নিগূঢ় বৈষ্ণবতত্ত্বের কয়েক চরণ, হিন্দি কবিদের দোঁহা ইত্যাদি কীর্তনীয়ারা আবৃত্তি করেন যার সহজ-সরল ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হত। এইজন্য লীলাকীর্তনের মাঝে মাঝে 'কথা', 'আখর',

'তুক'-এর উদ্ভাবন করা হয়েছে। কীর্তনের অঙ্গ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে— কীর্তনের এই পাঁচটি অঙ্গ— কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট।[২৫] তবে ঝুমুরকেও তিনি কীর্তনের অঙ্গ রূপে স্বীকার করেছেন। আবার অন্যদিকে হিতেশরঞ্জন সান্যাল দোঁহা-কে বাদ দিয়ে ঝুমুর-কে পাঁচটি অঙ্গের একটি মনে করেন।[২৬] ড. কৃষ্ণা বক্সী পঞ্চাঙ্গের কথায় না গিয়ে এগুলিকে কীর্তনের পালাপ্রকরণের অংশ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৭] মতপার্থক্য থাকলেও কীর্তনসমাজে কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ বা 'পঞ্চাঙ্গ' কথাটির প্রচলন আছে।

কথা— লীলাকীর্তনে পালা অনুসারে বৈষ্ণব পদ গাওয়া হয়। পদাংশের অর্থ বোঝাতে, এক পদ থেকে অন্য পদের অবতারণায় যোগসূত্র তৈরিতে অথবা ঘটনার ক্রম বোঝাতে নায়ক, নায়িকা, দূতী, সখা ও সখী ইত্যাদি চরিত্রের উক্তি কীর্তনীয়া নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। কীর্তনে এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা অংশটি 'কথা' নামে পরিচিত। পাঁচালি গানে 'শিকলি'-র ভূমিকার সঙ্গে কথা-র তুলনা চলে। পাঁচালি গানে শিকলি উপস্থাপন করা হয় বর্ণনাত্মক গদ্যের ভঙ্গিতে। অবশ্য গদ্যে সুর বজায় থাকে। শিকলির সাহায্যে দু'টি নাচাড়ির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। কীর্তনে কথার প্রধান কাজ এই যোগসূত্র স্থাপন করা।

দোঁহা— অবিভক্ত, সূত্রাকার ও ছন্দবদ্ধ ভাবে দু'চার চরণে রচিত বিষয় দোঁহা নামে পরিচিত। বৌদ্ধদের রচিত 'হাজার বছরের পুরান দোঁহা-কোষ' পাওয়া গিয়েছে। হয়তো দোঁহা থেকেই দোহার কথাটির উৎপত্তি। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের পয়ার বা ত্রিপদীর দুই-এক চরণ, হিন্দী কবির রচিত দোঁহা, 'উজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকাংশ কীর্তনে দোঁহা নামে পরিচিত।[২৮]

সাধারণত মূল গায়েনের গাইবার পর যাঁরা গান দু'বার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁরা দোহার (হিন্দি ভাষায় 'দো' অর্থে দুই সংখ্যা বোঝায়) নামে পরিচিত। এঁদের গানকে দোহারী গান বলে। কীর্তনগানে সুর ধরিয়ে দেওয়া, গানে মূল গায়েনের অনুসরণ ও সহায়তা করা এবং আসরে সুরের রেশ জমিয়ে রাখা দোহারের কাজ। অনেক সময় দোহার মূলগায়েনের পদে নিজস্ব সংযোজন করেন। তাতে পদাবলী অন্য মাত্রা পায়। এই স্বাধীনতা একজন দোহারের রয়েছে।

আখর— কীর্তনের আসরে বসে 'আখর' শুনে শুনে বুঝতে হয়। 'আখর' কথাটির অর্থরূপে ভাবা যেতে পারে শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের সমষ্টি। কীর্তনীয়ারা আখর তৈরিতে পারঙ্গম হন। পদাবলী কীর্তনের পদকে দীর্ঘায়িত করে গাইবার ক্ষেত্রে আখর ও তুকের ভূমিকা অসামান্য। আখর পদের মাঝে, কখনো ছত্রের সঙ্গে অথবা ছত্রকেই ভেঙে বর্ণনাত্মক অথবা ভাব পরিবর্ধক ছোট বাক্য বা বাক্যাংশ যুক্ত করতে হয়। কীর্তনে আখরের ব্যবহার সম্পর্কিত কীর্তনশিল্পী সুমন ভট্টাচার্য্যের মত এখানে প্রাসঙ্গিক—

> আখর ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম হল মূলগানের কিছু অংশ কেটে সে স্থানে প্রথম আখরটি ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলগানের যে অংশটি প্রথম আখরের সময় ছিল সেটি বাদ দিয়ে সেই স্থানে দ্বিতীয় আখরটি দিতে হয়। শেষ পর্যায়ে প্রথম আখরটির স্থানে তৃতীয় আখরটি সংযোজিত হয় এবং দ্বিতীয় তৃতীয় আখর দুইটি একসঙ্গে বহুবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে ও সেই সঙ্গে নানাবিধ 'লহর' বাজাবার পর শেষ পর্যায়ে মাতন শুরু হয়।[২৯]

আখরের বহিরাঙ্গ পদ্যাত্মক হলেও এতে গদ্যের ছাপ রয়েছে। আখর শুনে মনে হতে পারে তা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি। কিন্তু আখর অনেকসময় গুরুপরম্পরায় চালিত প্রথানুসারী হতে পারে। আখরের ব্যবহারে যদিও কীর্তনীয়ার সৃজনশীলতা প্রকাশ পায় তবু তা বেশিরভাগক্ষেত্রেই পূর্বপরিকল্পিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলী লিখিত সাহিত্যে স্থান করে নিলেও আখর তুলনামূলক পরবর্তী সংযোজন হওয়ায় বা মৌখিক পরম্পরায় চালিত হওয়ায় সাহিত্যিকদের নজর এড়িয়ে গেছে।

তুক— অনুপ্রাসবহুল, ছন্দময়, মিলনাত্মক-গাঁথা তুক নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ পদের মাঝে তুক গাওয়ার চলন আছে। মহাজনদের পদের বিশেষ অংশ অনেক সময় তুক রূপে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় প্রচলিত বৈষ্ণব কবিতার পরিবর্তে অজ্ঞাত কবিদের লেখা পয়ার বা ত্রিপদী তুক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কোনো কোনো তুকে গানের মতো কয়েকটি 'কলি' থাকে। এগুলি সাধারণত 'তুক' বা 'তুক্ক-গান' নামে পরিচিত। তুক কীর্তনীয়ারা গুরুপরম্পরায় পান। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কলহান্তরিতা পর্যায়ের একটি তুকগানের উদাহরণ তুলে ধরা হল—

> তোমায় নিতে আসিনি।
> গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠেছো কি হে, তোমায় নিতে আসিনি।
> আমি ফুল নিতে এসেছি। কৃষ্ণকলি ফুল নিতে এসেছি।
> বাসি ফুলে হবে না। ঝরা ফুলে হবে না।
> মান রাজার পূজা হবে, করবে পূজা কমলিনী।।[৩০]

কীর্তনীয়ার উপস্থাপিত পালা বা পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও উক্ত অংশটি কীর্তনীয়ার নিজস্ব সংযোজন হয়। এতে পদাবলীর অর্থ বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে। ভক্তদের পালা বুজতেও সুবিধা হয়।

ছুট— ছুট একধরনের হালকা চালের গান। ক্ল্যাসিকাল ভারী গান গাইতে গাইতে কীর্তনীয়ারা আসরের একঘেয়েমি দূর করতে বা ভাবের ঘোর ভাঙতে সহজভাবে গান করেন। সহজভাবে তরল তালে একটা পদের কিছুটা গাওয়া হলে তাকে ছুট বলে। বড় তালের মধ্যে তাল-ফেরতায় ছোট তালের গানকেও ছুট বলে।

ঝুমুর— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'ঝুমুর'কেও কীর্তনের একটি অঙ্গ হিসেবে ধরেছেন। ঝুমুর বা ঝুমরী একটি সুর। কিন্তু ঝুমুর অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কীর্তনে পালাশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলনান্তক গীত গাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু একই আসরে পর পর দু'তিনজন পালা উপস্থাপন করলে, কেবলমাত্র শেষের জন মিলন গেয়ে থাকেন। আগের কীর্তনীয়ারা মিলন গাইতে পারেন না। অথচ মিলন না গেয়ে আসর ছাড়ার নিয়ম নেই। নিয়ম বজায় রাখতে কীর্তনীয়া এক ছত্র ঝুমুর গান করে উঠে যান। একই পালা দুই বা তিনদিন ধরে গাইতে হলেও কীর্তনীয়া ঝুমুর গেয়ে পালা স্থগিত রাখেন। শেষ দিন পালা শেষ করেন মিলন গেয়ে।

গ। কীর্তনের ঘরানা

সংগীতের ক্ষেত্রে সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ঘরানা' কথাটির প্রচলন হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এই পরিভাষাটি বেশ জনপ্রিয় শব্দ। অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহারের কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণত হিন্দুস্থানী সংগীতের মধ্যে বিশেষ করে খেয়াল গানেই ঘরানার প্রচলন দেখা যায়। 'ঘরানা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'ঘর' শব্দটি থেকে 'ঘরানা' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বহুবাচনিক ধারণা রয়েছে। হিন্দি ভাষায় 'খানদান' অর্থে যে কথাটি ব্যবহার করা হয় ঘরও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। অর্থাৎ সমকুল জাত বা একই বংশোদ্ভূত সমস্ত ব্যক্তিই একই ঘরের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে কুল বা জাতির বৈশিষ্ট্যই প্রধান বলে বিবেচিত হত। তানসেন এবং তার বংশ যে পরম্পরায় গানের ধারা প্রচার করেছিলেন তা 'সেনী ঘরানা' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরা যখন কোনো এক ঘরের সংগীত বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারিত

হয়ে সংরক্ষিত হত তখন সেই সমগ্র গুরু প্রণালীকেই একটি ঘরানা বলে গণ্য করা হত। এই ঘরানার স্রষ্টারা বা তাঁদের আত্মীয় বর্গ কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা তার আশেপাশে বাস করতেন বলে অনেক সময় সেই স্থানটির নামানুসারেও ঘরানার নামকরণ হয়ে থাকত। যেমন— কীর্তনের গরাণহাটী ঘরানা। ড. খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে— খেতরি যে পরগনায় অবস্থিত, সেই পরগনার নাম সম্ভবতঃ 'গরের হাট' ছিল।[৩১] বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গড়েরহাট পরগণার নাম অনুসারে 'গড়েরহাটী' বা 'গরাণহাটী' ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল।

কীর্তনগানে ক্ল্যাসিকাল সংগীতের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং আজও তা রয়েছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে ও পরে সংগীত শাস্ত্রের চর্চা বঙ্গদেশে বেশ জোরালো ছিল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বৈষ্ণব পরিকরদের সংগঠিত কীর্তনের ফলস্বরূপ কীর্তন গানে ঘরানার প্রচলন দেখা যায়। অখণ্ড বঙ্গ সহ সমগ্র পূর্বভারতে কীর্তনের পাঁচটি সম্প্রদায় বা ঘরানা বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। এগুলি হল— গরাণহাটী বা গড়েরহাটী, মনোহরশাহী, রেণেটী, ঝারখণ্ডী এবং মন্দারিণী।

গরাণহাটী বা গড়েরহাটী— ঘরানার ইতিহাসে গরাণহাটী কীর্তনের ধারা সর্বপ্রাচীন ও বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তমদাস গরাণহাটী কীর্তনের প্রচলন করেন। এই গানের ধারা বহুদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনে সুরক্ষিত ছিল। গরাণহাটী গান সম্পর্কিত ড. হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতটি এখানে তুলে ধরা হল—

> বছর কুড়ি পঁচিশ আগে পর্যন্ত বড় বড় কীর্তনীয়ারা অনেকেই গরাণহাটি ঢঙের চর্চা করতেন। ইদানীং গরাণহাটি কীর্তনের বিশুদ্ধ রূপ গাহিবার মতো কীর্তনীয়া বিরল হইয়া উঠিয়াছে। তবে কীর্তনগানে গরাণহাটি ঢঙের স্মৃতি এখনও জাগরুক আছে। বিলম্বিত, স্থির, ধীরা, গম্ভীর, প্রসন্ন কীর্তন গানকে এখনও গরাণহাটি ঢঙের গান বা বটুক গান বলা হয়।[৩২]

বোঝা যাচ্ছে, গরাণহাটী ঘরানা সংগীতশাস্ত্রের এক জটিলতম পদ্ধতি ছিল বলে বর্তমানে এর ব্যবহার কমে গেছে। এই ঘরানা সংগীতের শ্রোতাদের শিক্ষিত অথবা মননশীল হতে হয়। কীর্তনের প্রসার গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক হওয়ার দরুণ রাশভারী সংগীতের চাহিদা তুলনামূলক কম।

নরোত্তমদাস উত্তরভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতটি প্রাসঙ্গিক—

একথা ঠিক যে, বাঙালির পদাবলীকীর্তন বিশেষভাবে ঋণী ঠাকুর নরোত্তম দাসের কাছে, কেননা বৃন্দাবন-অঞ্চল থেকে উত্তর-ভারতীয় অভিজাত বা ক্ল্যাসিকাল ধ্রুবপদগানে শিক্ষালাভ ক'রে ষোড়শ শতকে খেতরীর মহোৎসবে সকল বৈষ্ণবাচার্যদের সম্মুখে যে পদাবলীকীর্তনের রূপ ও শৈলী প্রবর্তন করেন তা ভারতীয় সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রে একটি অভিনব দান।[৩৩]

ধ্রুপদী গানের সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত কাব্য সংগীতের মেলবন্ধনে যে নতুন গায়ন পদ্ধতি নরোত্তমদাস তৈরি করেছিলেন, তা কীর্তনগানে আভিজাত্যের পাশাপাশি মেঠো সুরের মেলবন্ধন তৈরি করেছিল। খেতুরী মহোৎসবে গরাণহাটী ঘরনায় নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ পদ্ধতিতে গান করেছিলেন। ড. হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

নরোত্তমদাস ও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রবন্ধসঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন।[৩৪]

'গরাণহাটী' গানের গতি ছিল মন্থর প্রকৃতির। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই কীর্তনে ১০৮ প্রকার তালের ব্যবহার হয়।[৩৫] তবে একটি গান একই তালে এবং একই গতিতে গাওয়া হয় । এই গানে দশকোশী, একতালি, দাসপ্যারী, দোঠুকী, তেওট ইত্যাদি তালগুলো বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধ্রুপদাঙ্গ রীতির কীর্তনের প্রধান রাগগুলি হ'ল— গৌরী, মল্লার, বরাড়ী, বিভাস, কামোদ, সুহই, মায়ূর, আলোয়া ইত্যাদি। গানে সুরমাধুর্য ও শ্রুতিবৈচিত্র্য আনতে খোলবাদক 'কাটানে'র পর 'কাটান' (খোলবাদনের বিশেষ পদ্ধতি) দিয়ে থাকেন। এই গানের কাটানগুলি আকস্মিকভাবে শুরু হয় এবং 'মাতন'ও খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না। গরাণহাটী ঘরানা ভাবপ্রধান এবং ভাবই এই গানের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

মনোহরসাহী— গরাণহাটী গানের সরলীকৃত রূপ মনোহরসাহী কীর্তন। বর্ধমান জেলার 'মনোহরসাহী' পরগণা নাম থেকে মনোহরসাহী ঘরানার নামকরণ করা হয়েছে। গরাণহাটীর কিছুকাল পরেই এই ঘরানার উদ্ভব হয়। কালক্রমে এই ঘরানার পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তি বেশ পোক্ত ছিল। মনোহরসাহীর সুর ও তালের মূল কাঠামো এখনও সুশৃঙ্খলিত রেখেছেন কীর্তনীয়ারা। গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনের ঠাঁটকে তাই লোকসংগীতের আঙ্গিকে ফেলা যায় না। এপ্রসঙ্গে হিতেশরঞ্জন সান্যালের বক্তব্য—

গরাণহাটি ও মনোহরসাহী ঢংকে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না কেননা সম্মেলক ও অনাড়ম্বর গীত হলেও আসলে কীর্তনের আঙ্গিক হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিক। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ পদের প্রতিটি অঙ্গ প্রাচীন

কীর্তনে বর্তমান। এর সঙ্গে যে তালপদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে তাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরূপ। অতএব কীর্তন প্রবন্ধ লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়, তবে আখর পদ্ধতিতে কতকটা লোকসঙ্গীতের পরিচয় এতে রয়েছে।[৩৬]

আখর নিয়ে আলোচনায় লোকসংগীতের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই বিচারে কীর্তন শাস্ত্রীয় এবং কিছুটা আঞ্চলিক গীতধারার সম্মিলিত রূপ।

নরোত্তম দাসের গরাণহাটী কীর্তনের যে খামতিগুলি ছিল তা মনোহরসাহী ঘরানায় মেটানোর চেষ্টা করা হয়। এই ঘরানার উদ্ভব ও প্রসারে জ্ঞানদাস, মনোহরদাস, রঘুনন্দন, নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের পরিবারের ভূমিকা অসামান্য। এসম্পর্কিত ড. খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মত হল—

কথিত আছে শ্রীনিবাস আচার্য মনোহরসাহী ও রেনেটি সুরের সৃষ্টিকর্তা। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখ পদকর্তার প্রভাবে মনোহরসাহী কীর্তনগান এক সময় অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ইহারা নরোত্তম দাসের সমসাময়িক।[৩৭]

এই ধারাতেই নয়নানন্দ, শশীশেখর, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্তা এবং পরবর্তীকালে রসিকদাস, অনুরাগীদাস, হরিদাস, আখরিয়া, রাধিকা সরকার প্রভৃতি কীর্তনীয়ারা এসেছেন। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এতে চুয়ান্ন প্রকার তাল ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৩৮] মনোহরসাহী ঘরানা পরবর্তীকালে রেণেটী ঘরানার গানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

রেণেটী— বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া গ্রামের নিকটবর্তী রাণীহাটী পরগণায় রেণেটী কীর্তন-রীতির উৎপত্তি হয়। এই পরগণায় দেবীপুর বা হীরাপুর গ্রামের ধনী জমিদার সঞ্জয় ঘোষের পুত্র বিপ্রদাস ঘোষকে এই রীতির প্রবর্তক বলা হয়। অষ্টাদশ শতকে ধারাটি প্রচলিত হয়েছিল। রাণীহাটিতে ঘোষেদের প্রাধান্য ছিল যা সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাব ফেলেছিল। এরা বংশগতভাবে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতৃবর্গের কেউ কেউ যেমন মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই ধারা প্রবর্তনে সহায়তা করেন। রেণেটী ঘরাণায় তেওট, বেহাগ তেওট, দাসপ্যারী, দশকোশী প্রভৃতি মোট ছাব্বিশটি তাল পাওয়া যায়। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রেণেটী রীতির সঙ্গে হিন্দুস্থানি ঠুংরীর তুলনা করে বলেছেন—

যাঁহারা বন্দীপুরনিবাসী আখরিয়া গোপালের ভাগিনেয় (হুগলী) বাসুদেবপুরের বেণী দাস কীর্তনীয়ার রেণেটী সুরের কীর্তন শুনিয়েছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নিত্যধামগত গনেশ দাসের মুখে শুনিয়াছি যে রেণেটীর মাধুর্য মনোহরসাহী অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহে।[৩৯]

লোফা তালের গান বা সাধারণ ঢপ কীর্তন বলে পরবর্তীকালের কীর্তনের যে সব গান প্রচলিত হয়েছিল তার মধ্যে বেশিরভাগই রেণেটী ঘরানার। এই রীতির কীর্তনে সন্ধ্যাকালীন বেহাগ রাগের প্রচলন দেখা যায়।

মন্দারিণী— কীর্তনের আর একটি ধারার নাম 'মন্দারিণী'। গরমন্দারণ অঞ্চল অর্থাৎ উড়িষ্যার নিকটবর্তী বাংলার অংশে গোকুলানন্দ আচার্য নামে এক ব্যক্তির চেষ্টায় 'মন্দারিণী' ধারার সৃষ্টি হয়। এই রীতিতে নয়টি তাল ব্যবহৃত হয়। গোকুলানন্দ আচার্য কেবল গায়কই নন, তিনি পদকর্তাও বটেন। গোকুল ভনিতায় তাঁর কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। 'মাথুরের' সংস্কৃত-মিশ্র বাংলা ভাষায় 'রাই ধৈর্য্যং', 'রহু ধৈর্যং', 'হাম গচ্ছং মথুরায়ে' পদগুলি গোকুলানন্দের রচনা এবং মন্দারিণী তাল পদ্ধতিতেই গানটি গাওয়া হয়। এতে সংগীত নাটকের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে স্ফুরিত হয়েছে। মন্দারিণ অংশটি বাংলাদেশে হলেও ওড়িয়া সংস্কৃতির প্রভাব এখন বেশি। ড. কাননবিহারী গোস্বামীর মত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য—

মন্দারিণীতে তালের বৈচিত্র্য কম। উল্লিখিত গানটি মন্দারিণী রীতিতে একটু লঘু তালেই গাওয়া হয়। হয়তো এর মূলে আছে উড়িষ্যা-সীমান্তের লোকসঙ্গীতের প্রভাব।[৪০]

ভক্তি আন্দলনের প্রসারে শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। কীর্তনগানের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়সাধন হয়েছে। গানের জাতিভাদ (শাস্ত্রীয়সংগীত-লোকসংগীত, পাঁচালী-পদাবলী ইত্যাদির ভেদাভেদ) কীর্তনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এক্ষেত্রে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরা হল—

রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের সুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল এই সুরে গীত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গলও এই সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয়।[৪১]

পদাবলীর পাশাপাশি পাঁচালি গানের জনপ্রিয়তা প্রবল ছিল। সংরূপগুলি বিভিন্ন ঈশ্বরবিশ্বাসের দ্বারা লালিত হলেও দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। আঙ্গিক যাই হোক না কেন, আস্বাদ্যমানতায় এদের জুড়ি মেলা ভার। কাজেই ধর্মের ছুঁতমার্গ অঞ্চলভেদে কীর্তনকে স্পর্শ করেনি।

ঝাড়খণ্ডী— মানভূম পুরুলিয়া অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ অংশ ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত হয়। এই অংশে ঝাড়খণ্ডী কীর্তন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব কয়েকবার এই অঞ্চল দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। ঝাড়খণ্ডী ঘরানার প্রচলন করার ক্ষেত্রে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতটি হল—

> কড়ুই-নিবাসী কবীন্দ্র গোকুল সেরগড় আসিয়া বাস করেন। সেরগড় ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। পূর্বে বীরভূমের বক্রেশ্বর পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছিল। কবীন্দ্র গোকুলই এই সুরের কিছু সংস্কারসাধন করেন। এই সুর এখন লুপ্ত হইয়াছে।[৪২]

কিন্তু ড. কৃষ্ণা বক্‌সী আঞ্চলিক প্রবাদকে প্রাধান্য দিয়ে এর প্রতিষ্ঠাতারূপে শিবদাস নামক কায়স্থ কীর্তনীয়াকে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে—

> মিথিলার সঙ্গীতধারার দ্বারা প্রভাবিত এই ব্যক্তি পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে যে কীর্তনের ধারা প্রচলন করেন তারই নাম ঝাড়খণ্ডী কীর্তন। স্বভাবতই এই ধারার ওপর একদিকে বিদ্যাপতি প্রণীত মিথিলার সঙ্গীতের প্রভাব যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় পুরুলিয়া অঞ্চলের ঝুমুর গানের প্রভাব।[৪৩]

লোকগানের প্রভাব থাকার কারণেই হোক বা মঙ্গলগানের প্রভাব থাকার কারণেই হোক, এই ঘরানার প্রভাব অন্য ঘরানায় পড়েনি বলেই মনে করা হয়। সে যাই হোক, তবে এটুকু স্পষ্ট যে প্রতিটি ঘরানার ক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। অনেক ঘরানার গানই এখন অবলুপ্ত, কিন্তু একসময় এই ঘরানার প্রচলন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল তাতে বিশেষজ্ঞরা একমত।

ঘ। কীর্তনে তাল

কীর্তনের তালপদ্ধতি সম্পর্কে খুব সামান্য কথাই এখানে আসবে। তালপদ্ধতি বোঝার বা বোঝানোর মতো অবকাশ এখানে কম। সে পারঙ্গমতাও গবেষকের নেই তা অকপটে স্বীকৃত হিল। কিন্তু তালপদ্ধতি কথাটি বারবার ঘুরে ফিরে ব্যবহার করা হবে, তাই সে সম্পর্কে কিছু না বললেই নয়। তথ্যের আকারেই তা লিপিবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য তালপদ্ধতির মতো কীর্তনের তালও মাত্রাভিত্তিক। বিশেষভাবে হস্তচালনার বা মুদ্রার মাধ্যমে মাত্রাগুলি ব্যক্ত হয়। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে যথাক্রমে ছোট, মধ্যম ও বড় তালে কীর্তন গাওয়া হয়। কীর্তনে প্রচলিত কয়েকটি মৌলিক তাল হল— রূপক, আড়, দশকোশী, বীরবিক্রম, শশীশেখর তাল প্রভৃতি। এই মৌলিক তাল দিয়ে নতুন তাল তৈরি করা যায়। যেমন— বিষমপঞ্চম বা খামসা তাল (রূপক ও আড়-তালের সমন্বয়), বিষম সমুদ্র তাল (রূপক

ও দশকোশী) ইত্যাদি। কীর্তনের তালের কতগুলি অঙ্গ কীর্তনীয়া ও গবেষকদের আলোচনায় বারে বারে এসেছে। এই অঙ্গগুলি হল— লয়, লহট, হাত, ঘাত, ছক্কা, মাতন, জমাট, মাথট, হাতুটি, মূর্ছন, কোশী, কাল, বিরাম, জোড়া, ছুটা, কলা, আবর্তন, লঘু ও গুরু। তাল পদ্ধতি প্রাচীনতার পরিচায়ক। কীর্তনের প্রাচীনতাও এরই সঙ্গে নিহিত।

৬। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বা অষ্টকালী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণের জন্য যে লীলাক্রমের অনুসরণ করেছিলেন তা অষ্টকালীয় নিত্যলীলা বা অষ্টকালী বা অষ্টকালীন লীলাকীর্তন নামে পরিচিত। কৃষ্ণের প্রকটলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক -এই দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্যলীলাই হল ব্রজের অষ্টকালীয় লীলা এবং নৈমিত্তিক লীলা হল দূর প্রবাস ও পুতনাবধ ইত্যাদি। অষ্টকালীন লীলাকীর্তনে *শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী, স্মরণ মঙ্গল* ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণ করা হয়। এ সম্পর্কে ড. কৃষ্ণা বক্সীর মত হল—

> কীর্তন গায়কেরা প্রধানতঃ ত্রয়োবিংশ সর্গে বিভক্ত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থখানি অনুসরণ ক'রে শ্রীগোবিন্দ লীলা কীর্তন বা রসকীর্তন পরপর আস্বাদন ক'রে থাকেন।[৪৪]

লীলাকীর্তনের আসরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত *গোবিন্দলীলামৃত* গ্রন্থে ত্রয়োবিংশ সর্গে বর্ণিত লীলাক্রমের অনুসরণ করা হয়। এই গ্রন্থে লীলাকালের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা বৈষ্ণব সমাজে মান্য করা হয়। মঙ্গলাচরণে বর্ণিত শ্লোকের সামান্য অংশ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> কুঞ্জাদেগোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং।
> প্রাতঃ সায়ঞ্চলীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবেচারয়ন্ গাঃ।।
> মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াধ্বপরাহ্নে।
> গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ ন কঞ্চোহরতারং।।[৪৫]

কৃষ্ণ যখন 'নিশান্তে' অর্থাৎ রাত শেষ হলে কুঞ্জ থেকে গোষ্ঠে প্রবেশ করেন তখন গোদোহন, ভোজন ইত্যাদি লীলা হবে। তিনি সকালে সখাদের সঙ্গে খেলা করে গোচারণে যান। মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার করেন। বৃন্দাবনে অপরাহ্নবেলায় গোষ্ঠে এবং প্রদোষে সুহৃদের কাছে যান। নিশান্ত, প্রাতঃ পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীলা —এই লীলার মধ্যে রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয়

মুহূর্তের। বাকি প্রত্যেক লীলাই তিন মুহূর্তের। দুই দণ্ডে এক মুহূর্তের হিসেবে চব্বিশ মুহূর্তের হয় অষ্টকালীন লীলাকীর্তন। কৃষ্ণের অষ্টকালীন নিত্যলীলা সম্বন্ধে পদকর্তারা অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। কীর্তনীয়ারা নিশান্তলীলা থেকে আরম্ভ করে নিশীথকালীন সম্ভোগলীলা পর্যন্ত গান উপস্থাপন করেন।

৩:৫ লীলাকীর্তন ও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতিগ্রহণ

কীর্তনগানে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাব গভীরভাবে রয়েছে। সাংগীতিক দিক দিয়ে কীর্তনের আভিজাত্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। সংগীতের মতই কীর্তনের তত্ত্বগত দিকটি সংস্কৃত তত্ত্বশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এর তত্ত্বগত ভিতটি চৈতন্যপার্ষদেরা মজবুত করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেননি। ভারতবর্ষে প্রচলিত তত্ত্বগ্রন্থের পুনর্বিন্যাস করে বৈষ্ণবদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিল। পুরাণ এবং উপনিষদের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু আরেকটি আকর গ্রন্থ, যা বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ পূর্ণতায় বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেছিল, সেটি ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্র, নায়ক-নায়িকা বিভাজন প্রভৃতির উপর *নাট্যশাস্ত্র*-এর ছাপ স্পষ্ট। কীর্তনে অভিনয়কলা বিচার করার ক্ষেত্রে *নাট্যশাস্ত্র*-র অনুষঙ্গ বারবার উঠে আসে। এর পাশাপাশি কাব্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ আনয়ন আবশ্যক। দৃশ্যকাব্যের রূপক এবং উপরূপকের নাটকীয় আঙ্গিকে লীলাকীর্তনের আঙ্গিক কতটা সাযুজ্যপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেছে তা বিবেচনার বিষয়।

ক। কীর্তনের আঙ্গিক গঠনে নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা

চৈতন্যদেব নিজে শিক্ষাষ্টক ছাড়া কিছুই লেখেননি। এটি কোনো গ্রন্থ নয়, আটটি শ্লোকের সমষ্টিমাত্র। তবে তিনি অনুভব করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভীত প্রতিষ্ঠা না করলে অচিরেই মানুষের মন থেকে তা মুছে যাবে। বৈষ্ণবধর্মকে দীর্ঘায়ু করতে আনুষ্ঠানিকতার দরকার হয়। প্রয়োজন হয় নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের। এই কাজে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত ভক্ত-শিষ্যদের। এঁদের মধ্যে সনাতন দাস, রূপ ও জীব গোস্বামী অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষত শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থ দু'টি বৈষ্ণবধর্মকে সুদৃঢ় দার্শনিক ও রসভিত্তিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. সত্য গিরির মতটি তুলে ধরা হল—

শ্রীচৈতন্যদেব আচরিত প্রধানত নামজপ ও কীর্তন-নির্ভর আনুষ্ঠানিকতাবিহীন বৈষ্ণবধর্মের ভাব-প্রবাহকে সুদৃঢ় দার্শনিক ও রসভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থগুলির প্রয়োজন হয়েছিল।[৪৬]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ আমরা আট প্রকার রসের উল্লেখ পাই। বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এর অনেকটা পরিবর্তন করে তাঁদের ধর্মমত অনুসারে বিন্যাস করেন। এতে 'রস' আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। *নাট্যশাস্ত্র*-এ নাটকের জন্য যে বিভাজন করা হয় রূপ গোস্বামী তা কৃষ্ণের মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলার কথা মাথায় রেখে বিভাজিত করেন। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পদাবলী কীর্তনেও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কীর্তনের আঙ্গিক কতটা নাটকের তা বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনাসূত্রে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

বৈষ্ণব রসবিভাজন

সাধারণ মত প্রচলিত আছে যে, কীর্তনের ক্ষেত্রে গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই রসজ্ঞ হতে হয়। রসজ্ঞানহীন গায়ক যেমন রসজ্ঞ শ্রোতার কাছে অপদস্থ হন, তেমনি গায়কের রসজ্ঞানহীন বিরস উপস্থাপনা শ্রোতার সামনে রসকীর্তনের যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কীর্তন গায়ককে রসজ্ঞ হতে হলে রসশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তা ব্যবহারের কৌশলে পারদর্শীতা থাকা আবশ্যক। বিশেষত লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে রসবিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতটি উল্লেখ্য—

লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন চৌষট্টি রসের গান বলিয়া বিখ্যাত।[৪৭]

কীর্তন সংরূপে চৌষট্টি সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বৈষ্ণব মহাজনদের পদে চৌষট্টি প্রকার রসের বিন্যাস যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়। এখানেই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। কীর্তনে রসের পরিস্ফুটনে অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ নাট্যপরিস্থিতি তখনই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব যখন কীর্তনীয়া জানবেন মূল চরিত্র রসপর্যায়ের কোন অবস্থায় আছেন। অর্থাৎ কীর্তনীয়ার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত তিনি বন্ধু, ভক্ত, সন্তান না প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এক্ষেত্রে কোন রসে তাঁর অধিষ্ঠান সেটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কীর্তনীয়ারা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *উজ্জ্বলনীলমণি*-র মতো তত্ত্বগ্রন্থ সরাসরি পাঠ করেন অথবা গুরুপরম্পরায় এই বৈষ্ণবতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেন। আসরে কীর্তন গাইবার সময় তা ভক্তদের বিলিয়ে দেন।

গোস্বামীদের বৈষ্ণবদর্শন ও তত্ত্বগ্রন্থ রচনার আগের রসপর্যায় ভেদে পদ রচনার অবকাশ ছিল না ঠিকই কিন্তু তাঁদের পদাবলীকে পরবর্তীকালে রসপর্যায়ে বিভাজিত করেছেন সাহিত্য তাত্ত্বিকেরা। রসপর্যায় চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জটিলতা আসেনি। রসপর্যায়ের কাঠামোতে (frame) পদগুলির ঘটনাক্রম অনুসারে, ভাব বুঝে আলাদা করা অনেক সহজ হয়েছে। অবশ্য চৈতন্য-পূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দার্শনিক পার্থক্য ছিল। রাগানুগা ভক্তি কীভাবে ভক্তের মনে সঞ্চারিত হয়, কীভাবে সাধক ব্রজভাব লাভের অধিকার পান তা চৈতন্য-পূর্ব মহাজনদের পদ রচনার মধ্যে ছিল না। তবে ভক্তির স্বরূপ ভিন্ন হলেও পরবর্তী পদকর্তাদের পথপ্রদর্শনে বাধা তৈরি হয়নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কামগন্ধহীনভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে জয়দেবের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। জয়দেবের 'কোমলকান্ত মধুরপদাবলী' বৈষ্ণবভক্তির আধার হয়ে উঠেছিল। তাঁর পরবর্তী *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি বৈষ্ণবসমাজে সেভাবে সামাদৃত হয়নি। কারণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি বড়ু চণ্ডীদাস আদিরসে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। এই লোকায়ত রক্তমাংসের মানবীয় রূপ বৈষ্ণবসমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। একইভাবে *নাট্যশাস্ত্র* থেকে রসের ধারণা বৈষ্ণবেরা নিলেন ঠিকই কিন্তু মুছে ফেললেন কামনা-বাসনার চিহ্নটুকু। বৈষ্ণবভক্তির দাবি পূরণে শৃঙ্গার রস হয়ে ওঠে মধুর উজ্জ্বল রস। বাঙালির চিন্তা-চেতনায় রাধাকৃষ্ণ একেবারে নতুন অবতারে উপস্থিত হন।

নাট্যশাস্ত্র-এর ষষ্ঠ অধ্যায় 'রসবিকল্প'। এই অধ্যায়ে রসবিভাজন আলোচিত হয়েছে। ভরত আটটি রসের কথা বলেছেন—

> শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকঃ।
> বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।[৪৮]

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক বীভৎস ও অদ্ভুত —এই আটটি নাট্যরস বলে কথিত। পরবর্তীকালে আলংকারিকগণ 'শান্ত' রসকে নবম রস রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা রসকে মুখ্য ও গৌণভেদে মোট বারোটি রসের অবতারণা করেছেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-তে বর্ণিত পাঁচটি মুখ্যরস হল— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণ রসগুলি যথাক্রমে— হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস। *নাট্যশাস্ত্র*-এ যে আটটি রসের কথা বলা হয়েছে তার

মধ্যে শৃঙ্গার রস বাদ দিয়ে সাতটি রস গৌণ রস রূপে পরিগণিত হয়। যদিও শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *নাটকচন্দ্রিকা* গ্রন্থে শৃঙ্গার ও বীর রসকে প্রধান বলে নির্দেশ করেছেন। শ্লোকটি উল্লেখ্য—

শৃঙ্গারবীরান্যতরমুখ্যং রম্যেহতিবৃত্তযুক্।
প্রস্তাবনাস্তস্মবন্ধং সন্ধিসন্ধ্যঙ্গসঙ্গতং।।[৪৯]

অর্থাৎ নাটকে শৃঙ্গার এবং বীর রসই প্রধান। অন্য রসগুলি অপ্রধানভাবে থাকবে। ঈশ্বরের কল্পনায় আলৌকিকতা আবশ্যক। কৃষ্ণকথার অনেক অংশে তাঁর প্রেমিকসত্ত্বাকে ছাপিয়ে গেছে বীরসত্ত্বা। কৃষ্ণের কালিয়দমন, পুতনাবধ, পারিজারহরণ, কংসবধ, গোবর্ধন পর্বত ধারণ ইদ্যাদি বীরগাথা বেশ জনপ্রিয় ছিল। বাংলার বিভিন্ন নাট্যরূপের (লীলানাট্য, পাঁচালি, কীর্তন) মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হত। হয়তো সেকারণেই বীর রসকেও প্রধান রস রূপে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণ্য করা হয়েছে।

বৈষ্ণবেরা শৃঙ্গার রসকে মুখ্যরস হিসেবে গ্রহণ করলেন ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে কাম-বাসনার লেশমাত্র থাকল না। এর নাম দেওয়া হল 'উজ্জ্বল মধুর রস'। শ্রীরূপ গোস্বামী এই বারোটি রসের আবার বর্ণ নির্ধারণ করেছেন –শ্বেত, চিত্র, অরুণ, শোণ, শ্যাম, পান্ডুর, পিঙ্গল, গৌর, ধুম্র, রক্ত, কালো, এবং নীল। প্রতিটি মুখ্যরসেরই ভাব, বিভাব, সাত্ত্বিকভাব, সঞ্চারীভাব ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে রয়েছে। পাঁচটি মুখ্য রসের মধ্যে বৈষ্ণবেরা রস গণনায় শান্ত রসকে প্রাধান্য দেননি। তাদের মতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারটি রসই প্রধান। এই চারটি রসের মধ্যে আবার মধুর রসকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। শান্ত ও দাস্য রসের পদ চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে কমই দেখা যায়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই তিনটি রসই পদাবলীর উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে।

শান্তরস— শান্তি বা শম্ নামক রতি এর স্থায়ীভাব। রতির অর্থ রত থাকা। বিষয় সম্পর্কে বিরাগহীন যোগীদের পরমাত্মাজ্ঞানের অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবর্জিত যে ভাবসম্বন্ধ তা শান্ত রতির পরিপোষক। সনন্দ, সনক প্রভৃতি ঋষিরা এই শান্ত ভাবরসের সাধক রূপে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। শান্তরতি দুই ধরনের হয়। যথা— সমা এবং সান্দ্রা।

দাস্যরস— সম্ভ্রম ও গৌরভেদে দু'প্রকার দাস্যরস বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত। দাস্যের গুণ হবে সেবা। দাস্যরসের মধ্যে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা তো থাকবেই, উপরন্তু যুক্ত হবে সেবার ভাব। সেবায় ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে সামান্য মমতার সম্পর্কও গড়ে ওঠে। দাস্যভাবের আশ্রয় ভক্ত উদ্ধব,

পরিষদ রূপে সাত্যকি, যদুকুমার, প্রদ্যুম্ন, বিদুর, কালিয়নাগ প্রভৃতি। কলিযুগে চৈতন্যের অবতারের ক্ষেত্রে গোবিন্দ, মুরারি, শঙ্কর প্রভৃতি দাস্যরসের অধিকারী।

সখ্যরস— যাঁরা বয়সে, বেশভূষায় এবং ভাবে কৃষ্ণের সমতুল্য হন, তাঁদের কৃষ্ণের প্রতি মমতাযুক্ত যে সমতাবোধ তাই হল প্রেয় স্থায়ীভাব এবং সখ্যরসের বিষয়। শ্রীদাম, সুদাম ইত্যাদি কৃষ্ণের সখারা এবং অর্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি কৃষ্ণের সখারূপে পরিচিত। কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভাব সখ্যরসের উৎস্রোত হয়ে ওঠে। চৈতন্যাবতারের ক্ষেত্রে রায় রামানন্দ এবং মুকুন্দ ইত্যাদি বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শুদ্ধ সখ্যের অধিকারী। সখ্যের মধ্যে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবামূলক ভাব তো থাকেই, উপরন্তু বন্ধুত্বের সমবোধ যুক্ত হয়। প্রতিটি স্তরে যেন ভক্তিভাব উন্নততর হয়ে উঠছে।

বাৎসল্য রস— অনুকম্পার্হ ব্যক্তির উপর অনুকম্পাকারীর একধরনের সম্ভ্রমশূন্য রতিভাব বৎসল রূপে পরিচিত। এই বৎসলরতি উপযুক্ত বিভাবাদির সমন্বয়ে পরিণত হয় বাৎসল্যরসে। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের গুরুজনেরা যেমন- নন্দ, যশোদা, রোহিণী, বাসুদেব প্রভৃতি এই রসের আশ্রয় আলম্বন। কলিযুগে শ্রীচৈতন্যপক্ষে শচীদেবী, মিশ্র পুরন্দর, মালিনী, শ্রীবাস, অদ্বৈত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি বাৎসল্যরসের অধিকারী। এতে মমতার আধিক্য থাকায় কৃষ্ণ ও তাঁর অবতার চৈতন্যকে তাড়না, ভর্ৎসনা, বন্ধন ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

মধুর রস— *নাট্যশাস্ত্র* ও লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্রে যা 'রতি', 'আদি' বা 'শৃঙ্গার', তা-ই বৈষ্ণবশাস্ত্রে কামহীন মধুর বা উজ্জ্বল নামে পরিচিত। এই রতি নায়ক-নায়িকার প্রেম, সমুচিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারিভাবের সহযোগিতায় মধুর রসে পরিণত হয়। এই রতির বিষয় হবেন শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীবর্গ। মধুর রসাশ্রিত কান্তা প্রেমই শ্রেষ্ঠতম। মহাভাবময়ী হ্লাদিনীশক্তি রাধা হলেন এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠা। আশ্রয় হবেন গোপীবর্গ ও ভক্তহৃদয়। উদ্দীপন বিভাব হল বাঁশি, রাধাকৃষ্ণের রূপগুণ, যমুনাতট প্রভৃতি। ব্যাভিচারিভাব হল উগ্রতা, আলস্য, ঘৃণা ছাড়া সমস্ত (বিয়াল্লিশটি ব্যাভিচারিভাব)। কটাক্ষ, হাসি ইত্যাদি এর অনুভাব। সাত্ত্বিকভাব হল স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি। মধুর রতিতে শান্ত, সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যের সমস্ত গুণ থাকে। এর অতিরিক্ত প্রেমের একাত্মতা-বন্ধন মধুর রসের আধার। মধুর রস উৎকর্ষলাভ করতে করতে ভাব, মহাভাব পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারে যার সর্বোচ্চ অধিষ্ঠাত্রী রাইবিনোদিনী।

এই পঞ্চরস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্তরে প্রবাহিত। বৈষ্ণব আলংকারিকদের এই মধুর রসের স্থায়ী যে রতি অর্থাৎ সেই 'মধুরা' রতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। এর মধ্যে সমর্থা রতি শ্রেষ্ঠ। মথুরায় কুব্জার প্রেম 'সাধারণী' রতি। কারণ কৃষ্ণের রূপ দর্শনে তাঁর সঙ্গসুখের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি (বৈষ্ণবেরা দেহসুখকে সর্বদা এড়িয়ে চলেন) চরিতার্থ করার বাসনা তাঁর ভক্তহৃদয়ে জন্মায়। সমঞ্জসায় শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন শ্রবণে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেহসুখ ভোগের বাসনা জন্মায়। দ্বারকায় কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী ও সত্যভামার যে প্রেমরতি তা সমঞ্জসা। নিজের নয় একমাত্র ভগবানের তৃপ্তিসাধনাই সমর্থা রতির লক্ষ্য। বৃন্দাবনের ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধার রতি সমর্থা নামে পরিচিত। বলাই বাহুল্য এঁদের মধ্যে রাধার আসন সর্বোচ্চ।

উজ্জ্বলনীলমণি –তে মোট পনেরোটি প্রকরণ আছে। সমস্ত প্রকরণে রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল বা মধুর রসের বিষয়ালম্বন, আশ্রয়ালম্বন, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে 'শৃঙ্গারভেদ' অধ্যায়ে বর্ণিত লীলাপর্যায় অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীর লীলাবিন্যাস ঘটেছে। মোট চৌষট্টি প্রকার লীলারস মধুর বা শৃঙ্গাররসেরই অন্তর্গত। মধুর রস দুই (২) ভাগে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ এবং সম্ভোগ অর্থাৎ মিলন। বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ আবার চারটি (৪x২=৮) করে উপবিভাগ আছে। প্রতিটি উপবিভাগের আটটি (৮x৮=৬৪) বিভাগ করেছন রূপ গোস্বামী। মোট চৌষট্টি রস অনুযায়ী চৌষট্টি রসের কীর্তনের প্রচলন আছে বৈষ্ণব সমাজে। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে নায়িকার ভাবের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ড. কৃষ্ণা বক্‌সী এই চৌষট্টি প্রকার কীর্তনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ড. ক্ষুদিরাম দাস তাঁর *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে রসের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন।

বিপ্রলম্ভ

একে অপরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার, (পূর্বে মিলিত বা অমিলিত অবস্থায়) আশানুরূপ মিলন না হওয়ায় অপ্রাপ্তির ভাবে মন ব্যথিত হয় বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। বিচ্ছেদই মিলনকে পূর্ণ করে তোলে। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে রূপ গোস্বামী বলেছেন— ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।[৫০] বৈষ্ণবদের কাছে

বিপ্রলম্ভের আদর সম্ভোগের তুলনায় অনেক বেশি। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস –বিপ্রলম্ভের এই প্রধান চার ভাগ। এদের প্রতিটির আটটি উপবিভাগ আছে যা পদাবলী কীর্তনের উপজীব্য।

পূর্বরাগ— সাহিত্যক্ষেত্রে 'পূর্বরাগ' বেশ জনপ্রিয় শব্দ। শব্দটির বহুমাত্রিক ব্যবহার প্রচলিত হলেও বৈষ্ণবদের কাছে তা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। রূপ গোস্বামী পূর্বরাগ সম্পর্কে বলেছেন—

> রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
> তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্চতে।।[৫১]

অর্থাৎ, মিলনের আগে পরস্পর দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি থেকে জাত নায়ক-নায়িকার মিলনেচ্ছাময় যে রতি তা পূর্বরাগ নামে পরিচিত। রূপ গোস্বামীর মতে আটভাবে এই পূর্বরাগ সম্পন্ন হয়। যথা— সাক্ষাৎ দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, বন্দী ও ভাটমুখে দর্শন, সখী মুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, গুণীজনের গানে শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মান— মানের সংজ্ঞা নিরূপণে রূপ গোস্বামী বলেছেন—

> দাম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
> স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।।[৫২]

নায়ক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত এবং একে অপরের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে নায়কের দ্বারা নায়িকা প্রতারিত হলে যে বিশেষ মানসিক অবস্থা দু'জনের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হল মান। নায়িকার মান আটভাবে হতে পারে। যথা— সখী মুখে শ্রবণ, মুরলী ধ্বনি শ্রবণ, শুক মুখে শ্রবণ, বিপক্ষ গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, প্রিয় গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, গাত্রস্খলন (ভুলবসত বা স্বপ্নে অন্য নায়িকার নাম উচ্চারণ করা), স্বপনে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন।

প্রেমবৈচিত্ত্য— রূপ গোস্বামী প্রেমবৈচিত্ত্য সম্পর্কে বলেছেন—

> প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
> যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।[৫৩]

নায়ক-নায়িকা কাছাকাছি থাকলেও ভাবী বিচ্ছেদ চিন্তা করে যে আক্ষেপানুরাগ তা প্রেমবৈচিত্ত্য। এতে প্রেমের উৎকর্ষবৃদ্ধিতে আক্ষেপ-পূর্ণ বিরহের সুর রয়েছে। এর উপবিভাগগুলি হল— কৃষ্ণের জন্য

আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, দূতির প্রতি আক্ষেপ, মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ, গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস— প্রবাসের সংজ্ঞা নিরূপণে রূপ গোস্বামী বলেছেন—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।।[৫৪]

নায়কের দূর (সুদূর প্রবাস) এবং নিকটে (অদূর প্রবাস) যাওয়ার জন্য যে বিচ্ছেদবেদনা তাই প্রবাস। প্রবাস দূর ও নিকট ভেদে আট রকমের হতে পারে। যথা— ভাবি (প্রবাস গমনের বার্তা শুনে), মথুরা গমন ও দ্বারকা গমন হল দূর প্রবাস। কালিয়দমন, গোচারণে গমন, কার্যানুরোধে স্থানান্তর গমন এবং রাসে অন্তর্ধান হল নিকট প্রবাস।

সম্ভোগ

বৈষ্ণবসমাজে বিপ্রলম্ভের সাধারণ অর্থ মিলন। এই মিলন শারীরিক ও মানসিক দুইভাবেই হতে পারে। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে সম্ভোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।।[৫৫]

নায়ক-নায়িকার দর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি সুখতাৎপর্যময় যে মিলিত অবস্থা তা সম্ভোগ শৃঙ্গার নামে পরিচিত। মুখ্য ও গৌণভেদে সম্ভোগ চার প্রকার। যথা— সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। বিপ্রলম্ভের মতই এদের প্রতিটির আটটি উপবিভাগ আছে যা পদাবলী কীর্তনে কীর্তনীয়াদের গাঢ় অনুভবের উদ্দীপনা পেয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত— পূর্বরাগের পর নায়ক-নায়িকার লজ্জাসম্ভ্রমজনিত বাধার সৃষ্টি হয়। এরকম অবস্থায় সংকোচপূর্ণ চুম্বন-আলিঙ্গনের যে মিলন তা সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ রূপে খ্যাত। এই সম্ভোগের যে আটটি রসপর্যায়ভিত্তিক কীর্তন দেখা যায়, তা হল— বাল্যাবস্থায় মিলন, গো-দোহন কালে মিলন, গোষ্ঠে গমন কালে মিলন, অকস্মাৎ মিলন, বস্ত্রাকর্ষণ মিলন, বর্ত্মরোধন (পথরোধ) মিলন, হস্তাকর্ষণরূপ মিলন এবং রতিভোগরূপ মিলন।

সঙ্কীর্ণ— নায়কের বঞ্চনা ও উপেক্ষাজনিত কারণে নায়িকার মান হয়। মানের পর যে মিলন তা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ নামে পরিচিত। এই সম্ভোগের যে আটটি রসপর্যায়ভিত্তিক কীর্তন দেখা যায়, তা হল— মহারাস, জলকেলি, দানলীলা, বংশীচৌর্য, কুঞ্জলীলা, নৌকাবিলাস, মধুপান এবং সূর্যপূজা।

সম্পন্ন— অদূর প্রবাসের পর (সুদূর প্রবাসের পর রাধাকৃষ্ণের আর সশরীরে মিলন সম্ভব হয় না) ব্যাকুলাবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে মিলন তাকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলে। এই সম্ভোগের যে আটটি রসপর্যায়ভিত্তিক কীর্তন দেখা যায়, তা হল— সুদূর দর্শন, ঝুলন দর্শন, পাশকক্রীড়া (পায়ের আঙুলের অলঙ্কারবিশেষ নিয়ে খেলা), হোলী লীলা, প্রহেলিকা, নর্তক রাস, রসালস এবং কপট নিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান— বিভিন্ন কারণে নায়ক অথবা নায়িকাকে দূর প্রবাসে থাকতে হয়। এই অবস্থায় দুর্লভ মিলন (প্রবাসান্তে অথবা মানসিক কল্পনাপ্রসূত মিলন) হল সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই সম্ভোগের যে আটটি রসপর্যায়ভিত্তিক কীর্তন দেখা যায়, তা হল— স্বপনে মিলন, কুরুক্ষেত্রে মিলন, ভাবোল্লাস, দ্বারকা থেকে ব্রজে গমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজোন কৌতুক, একত্র নিদ্রা এবং স্বাধীন ভর্তৃকা।

নাট্যশাস্ত্র ও লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে রসের আরও অনেক খুঁটিনাটি দিকের উদ্ভাবন করেছেন বৈষ্ণব পরিকরেরা। রসপর্যায় আলোচনায় মধুররসের বিকাশ ও বিশেষভাবে কীর্তন সংরূপে 'চৌষট্টি রসের কীর্তন' শব্দবন্ধের ব্যাখ্যায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে নায়ক-নায়িকার বিভাজনের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের ভূমিকা যথেষ্ট রয়েছে।

নায়িকাভেদ

নাট্যশাস্ত্র-এর চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ভরত আটপ্রকার নায়িকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

> তত্র বাসকসজ্জা বা বিরহোৎকণ্ঠিতাপি বা।
> স্বাধীনভর্তৃকা চাপি কলহান্তরিতাপি বা।।
> খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা বা তথা প্রোষিতভর্তৃকা।
> তথাভিসারিকা চৈব ইত্যষ্টৌ নায়িকাঃ স্মৃতাঃ।।[৫৬]

অর্থাৎ নায়িকা আট প্রকারের হয়। যথা— বাসকসজ্জিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, স্বাধীনভর্তৃকা, কলহান্তরিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা ও অভিসারিকা। বৈষ্ণবতাত্ত্বিকেরা এই নায়িকাবিভাজন গ্রহণ করলেন

ঠিকই কিন্তু বহুগুণে উৎকর্ষে ভরিয়ে তুললেন। এক্ষেত্রে ড. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের মতটি তুলে ধরা হল—

> উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লীতে (১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) ও তাহার পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে অষ্টনায়িকার আবার প্রত্যেকের আট-আটটি করিয়া বিভাগ দেখাইয়াছেন।[৫৭]

বৈষ্ণব পদাবলীতে স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে মূলত কৃষ্ণপ্রিয়াদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রূপগোস্বামী *নাটকচন্দ্রিকা* গ্রন্থে নায়ক নায়িকার স্বরূপ আলোচনায় বলেছেন—

> যৎ পরোঢ়োপপত্যোস্তু গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ।
> তত্তু কৃষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদিতং।।[৫৮]

সংস্কৃত নাটকে পরোঢ়া অর্থাৎ পরপত্নীকে নায়িকা এবং উপপতিকে নায়ক রূপে দেখানো নিষেধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে বিলাস করেন তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ রাধা হলেন লক্ষ্মীদেবীর সত্ত্বা। পরকীয়া প্রেমের আস্বাদ নেবার জন্য তিনি এরূপ লীলার আয়োজন করেছেন। বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব সেই আদর্শকে অনুসরণ করেছে। মঞ্জরীভাবের সাধনাও সেই নিমিত্তেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বারকায় রয়েছেন স্বকীয়া নায়িকা। এঁরা সকলেই কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী'র মর্যাদায় ভূষিতা। পরকীয়া নায়িকা অবিবাহিত কন্যাও হতে পারেন আবার অন্যের বিবাহিত স্ত্রীও হতে পারেন।

লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকাদের বয়সোচিত স্বভাব বৈচিত্র্যকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা— মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা নায়িকা কম বয়সী, বাসনা ও কাম কলায় অনভিজ্ঞ হন। তিনি রতি বিষয়ে প্রতিকূলতা, সখীদের আনুগত্য এবং অত্যধিক লজ্জার কারণে মনের ইচ্ছে প্রকাশে বিশেষভাবে যত্নশীল হন এবং সব কাজে সাবধানতা বজায় রাখেন। মুগ্ধা নায়িকার রতির অভিলাষ থাকলেও প্রবল লজ্জাই সেখানে প্রধান অন্তরায় হয়ে মিলনে বাধার সৃষ্টি করে। মধ্যায় লজ্জা এবং রতি বাসনা থাকে প্রায় সমান সমান। প্রগলভা নায়িকা দেহশোভার দিক থেকে হন পূর্ণ যৌবনের অধিকারিণী। প্রগলভা নায়িকার অনুগত থাকেন নায়ক।

এই মুখ্য তিন শ্রেণির পরকীয়া নায়িকা প্রেমলীলায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র অবস্থার অধিকারিণী হন। সেই সব অবস্থার বিচারে ওই সব নায়িকার আট প্রকারের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যা কীর্তনের

পরিভাষায় 'চৌষট্টি নায়িকা' রূপে পরিচিত। অভিসারিকা, বাসক সজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা পাওয়া যায়। তবে *নাট্যশাস্ত্র*-এ এঁদের প্রত্যেকের আটটি করে পর্যায়ে অধিষ্ঠাত্রী নায়িকা মিলে সর্বমোট চৌষট্টি নায়িকার ধারণা তৈরি হয়েছে। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে নায়িকার আট ধরনের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রূপ গোস্বামী আট ধরনের নায়িকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্বনায়িকানাং নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা।
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোসিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা।।[৫৯]

বৈষ্ণবেরা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের পথ অনুসরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু অবস্থার ব্যাখ্যাকল্পে সংস্কৃত পণ্ডিতদের ছাপিয়ে গিয়েছেন। নায়িকার অবস্থানুসারে আসরে পদাবলী কীর্তন উপস্থাপন করা হয়। নাট্যশাস্ত্র কথিত 'অবস্থানুকৃতি' কীর্তনের মূল গায়েন সম্পন্ন করে থাকেন।

অভিসারিকা— একান্ত মিলন ব্যাকুলা হন এই নায়িকা। *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে আছে যে— যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসারত্যপি।[৬০] অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং অভিসার করেন এবং প্রেমিককে নির্দিষ্ট নির্বাচিত স্থানে অভিসার করান। পীতাম্বর দাস আট ধরনের অভিসারিকা নায়িকার কথা বলেছেন। যথা– জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা এবং অসমঞ্জসা। অভিসারিকা নায়িকা এতটাই মিলনব্যাকুলা থাকেন যে তাঁর আগে-পরের কথা ভাবার মতো অবস্থা থাকে না। তাঁরা বাঁশির সুর শুনে সকল বাধা অতিক্রম করে অভিসারে বের হন।

বাসকসজ্জিকা— রূপগোস্বামীর মতে এই নায়িকা হবেন—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা।।[৬১]

প্রিয় আসার ভাবনায় ব্যাকুলা হন এই নায়িকা। প্রিয় কিঞ্চিতকাল কুঞ্জে অবস্থান করে নায়িকাকে ফিরে আসার কথা দিয়ে বেরিয়ে যান। নায়কের ইচ্ছা অনুসারে নায়িকা কুঞ্জে অবস্থান করেন। তিনি নিজে

শৃঙ্গারের বেশ ধরেন এবং বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন। মোহিনী, জাগ্রতিকা, মধ্যোক্তিকা, রোদিতা, সুপ্তিকা, চকিতা, সুরসা এবং উদ্দেশা —এই হলেন আট ধরনের বাসকসজ্জিকা নায়িকা।

উৎকণ্ঠিতা— উৎকণ্ঠিতা নায়িকার সংজ্ঞা নিরূপণে রূপ গোস্বামী বলেছেন—

> অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
> বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা।।[৬২]

নায়কের প্রতীক্ষায় থাকেন এই নায়িকা। প্রিয় আসতে দেরি হওয়ায় নায়িকা উৎসুক হয়ে ওঠেন। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা আট ধরনের হন। যথা- স্তব্ধা, উচ্চকিতা, দুর্মতি, বিকলা, অচেনতা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা এবং নির্বন্ধা।

বিপ্রলব্ধা— *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে বিপ্রলব্ধা নায়িকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

> কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
> ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।।[৬৩]

পূর্ব নির্ধারিত সময় ও স্থানে প্রিয় না আসায় এই নায়িকা অপমানিত বোধ করেন। ব্যথিত চিত্তের এই নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলে। বিপ্রলব্ধা নায়িকা আট প্রকার— বিফলা, প্রেমমত্তা, ক্লিষ্টা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা এবং ভীতা।

খণ্ডিতা— খণ্ডিতা নায়িকার সংজ্ঞা নিরূপণে রূপ গোস্বামী বলেছেন—

> উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
> ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।[৬৪]

পূর্বনির্দিষ্ট সঙ্কেতকালে না এসে, নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে নিশিযাপনের চিহ্ন শরীরে নিয়ে নায়িকার সামনে উপস্থিত হন। এই সময় নায়িকার যে অবস্থা হয় তাকে খণ্ডিতা বলে। খণ্ডিতা আট প্রকারের। যথা– নিন্দ্যা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগলভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কল্পিতা এবং সন্তপ্তা।

কলহান্তরিতা— *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে কলহান্তরিতা নায়িকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

> যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
> নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।[৬৫]

খণ্ডিতা অবস্থায় থাকাকালীন প্রিয়কে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করে অনুতাপ করেন যে নায়িকা, তাঁকে কলহান্তরিতা বলে। কলহান্তরিতা নায়িকাও আট ধরনের। যথা– আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা বা মন্থরা এবং বিধুরা।

প্রোষিতভর্তৃকা— এই নায়িকার সংজ্ঞা নিরূপণে রূপ গোস্বামী বলেছেন— দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।[৬৬] অর্থাৎ নায়ক দূর দেশে গেলে বিরহসন্তপ্তা নায়িকাকে বলে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা। মাথুর পর্যায়ের নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকার নায়িকারূপে ধরা যায়। এই অবস্থায় নায়িকা প্রিয়ের গুণকীর্তন ও বিচ্ছেদজনিত বিলাপ করেন। তাঁর দেহে মালিন্য ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার আটটি বিভাগ। যথা— ভাবী, ভবন, ভূত, দূত-সংবাদ, দশদশা, বিলাপা, সখ্যুক্তিকা এবং ভাবোল্লাসা।

স্বাধীনভর্তৃকা— উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়— স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেত স্বাধীনভর্তৃকা।[৬৭] অর্থাৎ নায়ক যে ধরনের নায়িকার একান্ত বশীভূত থাকেন তাঁকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। জলকেলি, বনবিহার, কুসুমচয়ন এবং নায়িকার আদেশে যখন নায়ক তাঁর কেশ বিন্যাস করে দেন তখন নায়িকার স্বাধীনভর্তৃকা রূপ দেখা যায়। আট ধরনের স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকারা হলেন— গোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা এবং অভিষেক।

বৈষ্ণব পণ্ডিতরা নায়িকার ধারণা সংস্কৃত *নাট্যশাস্ত্র* থেকে গ্রহণ করলেও তার উৎকর্ষ বিধানে বৈষ্ণবরাই শ্রেষ্ঠ। আগেও আমরা চৌষট্টি (৬৪) রসের কীর্তনে তা পেয়েছি। চৌষট্টি সংখ্যাটি যেন বৈষ্ণব সমাজে পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। এই চৌষট্টি নায়িকার অনেককেই মূল গায়েন কীর্তন করার সময় ভক্তদের কাছে ব্যাখা করেন।

নায়কভেদ

নাট্যশাস্ত্র-এ নায়িকা বিভাজনের মতো নাটকে নায়ক বিভাজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের চৌত্রিশতম অধ্যায়ে নায়কবিভাজনের শ্লোকটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল—

ধীরোদ্ধতা ধীরললিতা ধীরোদাত্তাস্তথৈব চ।।
ধীরপ্রশান্তকাশ্চৈব নায়কাঃ পরিকীর্তিতাঃ।[৬৮]

নায়ক চার প্রকার বর্ণিত হয়েছে। যথা— ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত ও ধীরপ্রশান্ত। নাটকের নায়ক কেমন হবেন তা বৈষ্ণব নাট্যতত্ত্ব নাটক-চন্দ্রিকা গ্রন্থে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

দিব্যেন দিব্যাদিব্যেন তথাহদিব্যেন বা যুতং।
ধীরেণাঢ্যমুদাত্তেন কৃষ্ণশ্চেল্ললিতেন চ।।[৬৯]

অর্থাৎ দিব্য, দিব্যাদিব্য ও অদিব্য নায়ক নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের অভিপ্রেত নায়ক হন। উক্ত নায়ক ধীর ও উদাত্ত গুণযুক্ত হবেন। কিন্তু কৃষ্ণ যদি নায়ক হন তবে লালিত্য গুণযুক্ত হতে পারেন। রামচন্দ্রকে *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নায়কের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু নাটকের নায়ক সম্পর্কে রূপ গোস্বামীর বক্তব্য ভিন্ন। তাঁর মতে—

স্বয়ং প্রকটিতৈশ্বর্য্যো দিব্যঃ কৃষ্ণাদিরীরিতঃ।
দিব্যোহপি নরচেষ্টত্বাৎ দিব্যাদিব্যো রঘূদ্বহঃ।।
অদিব্যো ধর্ম্মপুত্রাদিরেষু কৃষ্ণো গুণাধিকঃ।
নায়কানাং গুণাঃ সর্ব্বে যত্র সর্ব্ববিধাঃ স্মিতাঃ।।
ললিত্যৌদাত্তয়োরত্র ব্যক্ত্যা শোভাভরোহধিকঃ।
তেনৈষ নায়কো যুক্তঃ শৃঙ্গারোত্তরনাটকে।।
যৎ পরোঢ়োপপত্যোস্ত গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ।
তত্তু কৃষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপাদিতং।।[৭০]

গীতা-য় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান রূপে নিজ পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। রামচন্দ্র মানবসুলভ আচরণ করেন। তাই তাঁকে দিব্যাদিব্য নায়ক বলা যায় না। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি অদিব্য নায়ক। শ্রীকৃষ্ণের মতো গুণের অধকারী তাঁরা নন। সেই কারণে নাটকের নায়ক রূপে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠতম মনে করেন বৈষ্ণবেরা। বিশেষত লালিত্য এবং উদাত্ত গুণের সমধিক ও প্রচুর শোভা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজমান। এইজন্য শৃঙ্গার রস প্রধান নাটকে শ্রীকৃষ্ণই উপযুক্ত নায়ক।

রূপ গোস্বামী *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে নায়কভেদ নামক প্রকরণে ছিয়ানব্বই প্রকারের নায়কভেদ দেখিয়েছেন। নায়কঃ সোহনুকুলাদ্যৈঃ স্যাৎ ষন্নবতিধোদিতঃ।[৭১] লীলাভেদে হয় চার প্রকার নায়ক। যথা— ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কৃষ্ণের গুণপ্রকটনের তারতম্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম —এই তিন প্রকার নায়ক মিলে মোট বারো ধরনের নায়ক। এই বারো প্রকারের নায়ক পতি ও উপপতিভেদে চব্বিশ প্রকার নায়কে বিভক্ত। এঁরাও (চব্বিশ প্রকারের নায়ক)

অনুকূল, শঠ, দক্ষিণ ও ধৃষ্ট –ভেদে মোট ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক। এভাবে মোট ছিয়ানব্বই প্রকারের নায়কভেদ বৈষ্ণব আলংকারিকগণ করেছেন।

ধীরোদাত্ত হল সেই নায়ক যিনি হবেন গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, সুদৃঢ়ব্রত, করুণ, আত্মস্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব ও মহাবলবান। এই প্রকৃতির নায়ক হলেন রামচন্দ্র। ধীরললিত অর্থে তাঁকে বোঝায় যিনি বিদগ্ধ, নবতারুণ্যযুক্ত, পরিহাসপটু এবং প্রায়ই প্রেয়সীর বসে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং কন্দর্প হলেন এই শ্রেণির নায়ক। ধীরশান্ত নায়ক হবেন কষ্টসহিষ্ণু, শান্তপ্রকৃতির, সুবিবেচক এবং বিনয়ী। এই প্রকৃতির নায়ক হলেন যুধিষ্ঠির। ধীরোদ্ধত সেই নায়ক যিনি অহংকারী, মাৎসর্যযুক্ত, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাপরায়ণ হন। ভীমসেন এই ধরনের নায়ক।

নাট্যশাস্ত্র ও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে নাট্যকলার বীজমন্ত্র বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্র নির্মাণে সাহায্য করেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে তা বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে ওঠার দরুণ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা ও সম্প্রচারের সঙ্কীর্ণতা এসেছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তুলনামূলক পরবর্তী রচনায় ভাবপ্রকাশে সংযম আসে বাধাধরা ছকের তাড়নায়। তবে কীর্তনের ক্ষেত্রে এই বাধা থাকেনি। কীর্তনীয়ার ক্ষেত্রে উপস্থাপনে সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি বৈচিত্র্য এসেছিল কীর্তনের পঞ্চাঙ্গে। বিশেষত কথা ও আখরের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বানুসরণ বৈচিত্র্যময় ও সুবিধাজনক হয়েছিল। সর্বোপরি *নাট্যশাস্ত্র*-এর অনুসরণ নাটক রূপে কীর্তনের আঙ্গিক নির্ধারণে জোড়ালো যুক্তির সংযোজন করে।

রঙ্গালয়

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে রঙ্গালয়ের বিভাজন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য— বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব হি মণ্ডপ।[৭২] অর্থাৎ তিন প্রকার মণ্ডপ বা রঙ্গালয় রয়েছে। যথা- বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র্য। আকার ও আয়তনের অনুসারে তিন ধরনের রঙ্গালয়ের নির্দেশ রয়েছে। ভরত লিখেছেন যে— তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাহবরম্।[৭৩] অর্থাৎ আয়তনের বিচারে রঙ্গালয়ের তিন ভাগ যথা— জ্যেষ্ঠ (বৃহৎ), মধ্য (মধ্যম) ও অবর (ক্ষুদ্র)। অভিনব গুপ্ত বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র ভেদে মোট নয় ধরনের রঙ্গালয়ের কথা বলেছেন। এর মধ্যে

মধ্যম রঙ্গালয়ই শ্রেষ্ঠ। রঙ্গালয় মধ্যম আকারের হলে আবৃত্তি, গান সহজে শোনা যায়। কীর্তনে আসরের সমতুল্য রূপে ভাবা যায় মধ্যম আকারের মঞ্চকে।

রঙ্গালয়ের দৈর্ঘ্য হাত ও দণ্ড অনুসারে পরিমাপ করা হয়। বিকৃষ্ট রঙ্গালয়ে থাকে আয়তাকার মঞ্চ, যা চৌষট্টি হাত লম্বা এবং বত্রিশ হাত চওড়া হয়। দেবতাদের জন্য এই রঙ্গালয়ের কথা বলেছেন ভরত। চতুরস্র হয় বর্গাকার। এর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য বত্রিশ হাত। রাজাদের জন্য এই রঙ্গালয়। ত্র্যস্র হয় ত্রিকোণ। অবশ্য ভরতমুণি এর বাহুর দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করেননি। দেবতা ও রাজা ব্যতীত অন্যান্য লোকের জন্য এই ধরনের রঙ্গালয়ের কথা বলেছেন ভরতমুনি।

কীর্তনের আসর সাধারণত বর্গাকার (অনেক ক্ষেত্রে গোলাকার হয়) হয়ে থাকে। ভরত নির্দিষ্ট চতুরস্র্যের সঙ্গে কীর্তনের বর্গাকার আসর তুলনীয়। যদিও নেপথ্যগৃহ, রঙ্গশীর্ষ ও রঙ্গপীঠের অবস্থান একসঙ্গে কীর্তনের আসরে থাকে না। নেপথ্য বলে কীর্তনের আসরে কিছু নেই। সবটাই উন্মুক্ত উপস্থাপনভঙ্গি এতে পরিলক্ষিত হয়। মূল গায়েন একক অভিনয়ে পালা উপস্থাপন করেন, এক্ষেত্রে নেপথ্যগৃহের প্রয়োজন হয় না। রঙ্গপীঠে অভিনয় করা হয় এবং রঙ্গশীর্ষে থাকে বাদকবৃন্দ। কীর্তনের আসরে রঙ্গপীঠ ধরে নেওয়া যায় একেবারে সামনের অংশ যেখানে মূলগায়েন থাকেন। রঙ্গপীঠে অবস্থান করেন দলের বাকি সদস্যেরা। *নাট্যশাস্ত্র*-এ যে সমতল, স্থির ও দৃঢ় মৃত্তিকার রঙ্গালয় নির্মাণের কথা বলা হয়েছে তা কীর্তনের আসরেও পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে মঞ্চ বাঁধা হয় বেশ উঁচুতে। এক্ষেত্রে অগণিত ভক্তবৃন্দের লীলা আস্বাদনের সুবিধার্থে এমন উঁচু করার চল হয়েছে। তবে কীর্তনীয়ারা মঞ্চের পরীক্ষানিরীক্ষার পর আসরে নৃত্য করার আগ্রহ দেখান। কীর্তনীয়ারা শক্ত-পোক্ত মঞ্চ না হলে নৃত্য করতে অসম্মত হন। মঞ্চের এই ব্যবস্থাপনায় থিয়েটারের প্রভাব যথেষ্ট বলে মনে করা যায়।

পূর্বরঙ্গ

নাট্যশাস্ত্র-এর পঞ্চম অধ্যায় 'পূর্বরঙ্গবিধান'-এ নাটক শুরুর আগে কতগুলি অনুষ্ঠান পালনের কথা ভরত বলেছেন। এই অনুষ্ঠান পূর্বরঙ্গ নামে পরিচিত। পর্দার আড়ালে যে সব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় তা হল— প্রত্যাহার (বাদ্যযন্ত্রের স্থাপন), অবতারণ (বাদকদের আসন গ্রহণ), আরম্ভ (গানের আরম্ভ),

আশ্রাবনা (বাদ্য যন্ত্রের সুরারোপ), বক্ত্রাপাণি (বাদ্যযন্ত্র বাদনের রিহার্সাল), পরিঘট্টনা (বাদ্যযন্ত্রের তারে বাদন), সংঘোটনা (তালসূচক বিভিন্ন প্রকার হস্ত সঞ্চালন), মার্গাসারিত (অবনদ্ধ ও ততবাদ্যের মলিত বাদন) এবং আসারিত (তাল সংক্রান্ত বিভেদ)।

পর্দার বাইরে গীতবিধি (দেবতার স্তুতি বিষয়ক গান), উত্থাপন (নান্দী শ্লোক আবৃত্তি), পরিবর্তন (ত্রিভুবনের অধিদেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি), নান্দী (প্রস্তাবনা), শুক্লাবকৃষ্টা (এতে অর্থহীন গানের অক্ষর থাকে), রঙ্গদ্বার (এখান থেকেই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত), চারী (শৃঙ্গারসূচক অঙ্গভঙ্গি), মহাচারী (ভয়ানক সূচক), ত্রিগত (বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বকের সংলাপ), প্ররোচনা (সূত্রধর কর্তৃক প্রেক্ষকগণের প্রতি ভাষণ)।

কীর্তনের ক্ষেত্রে পূর্বরঙ্গের 'আসারিত' ছাড়া অন্তঃযবনিকার যাবতীয় অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। বিশেষত খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তম দাস যেভাবে লীলাকীর্তন উপস্থাপন করেছিলেন তা *নাট্যশাস্ত্র*-এ বর্ণিত পূর্বরঙ্গবিধির সমতুল্য। বাদ্যের নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ বাদন দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। গরাণহাটী ঘরানার কীর্তন গান তিনি পরিবেশন করেছিলেন। বহু রাগ ও তালের সমন্বয় তা গাওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বক্তৃতা দেওয়া হয়। শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ইত্যাদি মহন্তদের নিয়ে রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদও গাওয়া হয়। এরূপ নাট্য-উপস্থাপন সেকালে বেশ জনপ্রিয় ছিল বলেই মনে হয়। কীর্তনের আসরে এরূপ বিধি আজও কমবেশি পালিত হয়।

কীর্তনের আসরে পর্দার ব্যবহার থাকে না। আসরের সমস্ত ঘটনা সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত থাকে। দশ প্রকার (গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্ট, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত এবং প্ররোচনা) বহির্যবনিকার কথা বলা হয়েছে *নাট্যশাস্ত্র*-এ। পর্দার বাইরে যে সব নাট্যনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন হল একধরনের দেবতার স্তুতিবিষয়ক গান। কীর্তনানুষ্ঠানে বন্দনা অংশে এই জাতীয় গান ও স্তুতির অবতারণা করা হয়। নান্দী শ্লোক আবৃতি (বন্দনার পূর্বে গীতার শ্লোক পাঠ 'যদা যদা হি ধর্মস্য...' ইত্যাদি) অনুষ্ঠান দু'টির আয়োজন দেখা যায়। পূর্বরঙ্গের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে হুবহু মিল না থাকলেও নাট্যের উপস্থাপনার পূর্বে যে সকল ইঙ্গিত ভরত নির্দেশ দিয়েছেন তা অনেকাংশেই প্রতিফলিত হয়েছে লীলাকীর্তনানুষ্ঠানে। *নাট্যশাস্ত্র*

নির্দেশিত ক্রিয়াকলাপ সেই সময়ের সমাজে নাট্য উপস্থাপনের মানদণ্ড রূপে বিবেচিত হত। নাট্য-আঙ্গিক রূপে কীর্তন উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও তা অনুকরণীয় হয়েছে বলে মনে করা যায়।

অভিনয়

নাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে *নাট্যশাস্ত্র*-এ একে 'অবস্থানুকৃতি' (অবস্থার অনুকরণ) বলা হয়েছে। চার প্রকার অনুকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়— আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।[৭৪] অর্থাৎ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিকভেদে অভিনয় চতুর্বিধ। এদের মধ্যে আঙ্গিক অভিনয় ভঙ্গিটি কীর্তনের অভিনয় ভঙ্গির সঙ্গে বেশ সামাঞ্জস্যপূর্ণ। আঙ্গিক অভিনয় তিন প্রকার— শরীর, মুখজ, এবং শাখা। এই ত্রিবিধ আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ ও উপাঙ্গের লিখিত প্রক্রিয়ার উপস্থাপন করা হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ভরত। অঙ্গ ছয়টি– মস্তক, হস্ত, কটি, বক্ষ, পার্শ্ব ও পাদ। উপাঙ্গও ছয়টি— নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, অধর, গণ্ডস্থল ও চিবুক। প্রতিটি অঙ্গ ও উপাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বিভাজন অনুযায়ী অভিনয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *নাট্যশাস্ত্র*-এ।

কীর্তনের ক্ষেত্রে আঙ্গিক অভিনয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল গায়েন মাথা, হাত, কটি, বক্ষ, পার্শ ও পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে আসরে কীর্তন উপস্থাপন করে থাকেন। কেবলমাত্র অঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয় বা ভাব ফুটিয়ে তোলা যায় না। মৌখিক অভিব্যক্তিও বিশেষ প্রয়োজন, যা একরকম সাত্ত্বিক অভিনয়ের অংশ। চোখ, ভ্রূ, অধরের ভঙ্গিমা দেখতে পাওয়া যায়। অঙ্গ ও উপাঙ্গের মিলিত প্রয়াসে কীর্তন অভিনয়ে সার্থকতা আসে। এছাড়া কীর্তন বাচিক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী। কীর্তনে চরিত্রের সংলাপ অংশ বাচিকাভিনয়ের উপযোগী। তাছাড়া আহার্যের অভিনয়ে কীর্তনীয়া বেশ যত্নশীল হন। চরিত্রানুগ রূপসজ্জা কীর্তনীয়ার ব্যক্তিক চাতুর্যে চমকপ্রদ রূপ পরিগ্রহ করে। তাঁদের পোশাক চরিত্রানুগ করে তোলার বিষয়ে তাঁরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তবে নিত্যদিনের পোশাকের থেকে তা কিছুটা ভিন্ন হয়। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রঙের পোশাক, রূপসজ্জার স্বল্প আয়োজন থাকে কীর্তনীয়ার। বাকিটা নির্ভর করে কীর্তনীয়ার অভিনয়দক্ষতার উপর।

বৃত্তি

নাট্যশাস্ত্র-এ চার ধরনের বৃত্তির (style) কথা বলা হয়েছে। যথা— ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভট্টী। ভারতী বৃত্তি হয় পুরুষসংলাপ প্রধান। সংস্কৃত ভাষায় সংলাপ লেখার ফলে সেখানে নারীর স্থান নেই বললেই হয়। কারণ সংস্কৃতে নারীর মুখের ভাষা হিসেবে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারই নিয়ম ছিল। উচ্চবর্ণের পুরুষ কেবল সংস্কৃতে কথা বলতেন। সাত্বতী হল প্রাণবন্ত বৃত্তি যেখানে শোকভাব সংবরণ করে বহুল পরিমাণে হর্ষ বা আনন্দের সঞ্চার হয়। কৈশিকী বৃত্তির লক্ষণ বলা হয় যেখানে অনেক সংখ্যক স্ত্রীলোক যুক্ত থাকেন এবং বহু নৃত্যগীতের আয়োজন হয়ে থাকে। সাহসী লোকের গুণ, বহু ভাষণ ও কপটতা যুক্ত হয় আরভট্টী বৃত্তিতে। এতে দম্ভ ও মিথ্যা কথা থাকে।

কীর্তনের বৃত্তি হিসাবে প্রাধান্য পায় ভারতী ও কৌশিকী। কারণ এতে নৃত্যের গুরুত্ব ছিল অসামান্য। এক্ষেত্রে ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের মত উল্লেখ্য—

> বর্তমানে প্রচলিত বাংলার কীর্তনেও নাট্যশাস্ত্রে ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন সহ উচ্চণ্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের ঝংকার দেখা যায়। যা বর্তমানে বৈষ্ণবমন্দির আখড়াগুলিতে খোল-করতাল সহযোগে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, সেবাদাস-সেবাদাসীরা পরিবেশন করে থাকেন। যদিও পৃষ্টপোষকতার অভাবে নৃত্যের শাস্ত্রীয় রূপটি অনেকাংশে ক্ষয়িষ্ণু।[৭৫]

প্রাচীন বাংলার বর্ধিষ্ণু সমাজে *নাট্যশাস্ত্র*-এর সমান্তরালে নৃত্যধারা প্রচলিত ছিল। কীর্তনাঙ্গীয় নৃত্য এই ধারাকে বজায় রেখেছে। বাংলার টেরাকোটা শিল্পে নৃত্যশৈলীর অজস্র উদাহরণ আজও বর্তমান। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাণবন্ত, হর্ষ ও আনন্দের আবহ রয়েছে। এর দরুণ কীর্তনে সাত্বতী বৃত্তির লক্ষণও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলায় নারী চরিত্রের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যগীত সহযোগে কামের উপভোগ সংক্রান্ত বিষয় আমরা দেখাতে পাই নৌকাবিলাস, রাসলীলা প্রভৃতি পালায়। এই কারণে পদাবলী কীর্তনকে কৈশিকী বৃত্তি সমন্বিত আঙ্গিক বলা যায়।

খ। দৃশ্যকাব্যের উত্তরাধিকার রূপে লীলাকীর্তন

কাব্য বলতে আজকে সাধারণভাবে শুধু কবিতা বা কবিতা জাতীয় রচনাকে বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'কাব্য' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত। 'সাহিত্য' কথাটি যেভাবে বৃহত্তর জগৎকে নির্দেশিত করে সেভাবে প্রাচীনকালে 'কাব্য' শব্দের দ্বারা বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রকে বোঝাতো। সাহিত্য বলতে যা বোঝায় কাব্যও তাই ছিল। এক্ষেত্রে বলা যায় শব্দার্থের সংকোচন ঘটেছে। সেসময় কাব্যের দু'টি প্রধান ধারা প্রচলিত ছিল। যথা— শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য।

শ্রব্যকাব্য

শ্রব্যকাব্য বলতে সেই সকল রচনাকে বোঝায় যা শ্রবণের দ্বারা রস গ্রহণ করতে হয়। শ্রব্যকাব্যকে পাঠ্যকাব্যও বলা যায়। এই কাব্যের রসাবেদন আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। পাঠ ও শ্রবণের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ থাকলেও শ্রব্যকাব্যের রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ কাব্যের স্রষ্টা তাঁর বর্ণনামূলক বিবৃতির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয় পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেন। এই শ্রব্যকাব্য আবার তিনটি উপধারায় বিভক্ত। যথা— পদ্যকাব্য, গদ্যকাব্য এবং চম্পূকাব্য।

পদ্যকাব্য- সাধারণভাবে ছন্দযুক্ত পদসমন্বিত বাক্যই পদ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পদ সাজিয়ে যে কাব্য তাই পদ্যকাব্য। পদ্যকাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে তিনটি শ্রেণি দেখা যায়। যথা- মহাকাব্য (*রামায়ণ* ও *মহাভারত*), খণ্ডকাব্য (*মেঘদূত, ঋতুসংহার*), কোষকাব্য (*কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়*)।

গদ্যকাব্য— ছন্দের অবকাশ যে রচনায় থাকে না তাকে গদ্যকাব্য বলে। নিত্য ব্যবহার্য বাক্‌ভঙ্গি এই কাব্যে প্রধান। এই কাব্য দুই শ্রেণির— আখ্যায়িকা (বাণভট্টের *হর্ষচরিত*), এবং কথা (বাণভট্টের *কাদম্বরী,* সুবন্ধুর *বাসবদত্তা*)।

চম্পূকাব্য— যে রচনায় গদ্য ও পদ্যের মিলিত রীতি অনুসৃত হয় তাকে চম্পূকাব্য বলে। যেমন-জীবগোস্বামীর *গোপাল-চম্পূ,* ত্রিবিক্রম ভট্টের *নলচম্পূ* প্রভৃতি।

দৃশ্যকাব্য

যে কাব্যের অভিনয় দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল সে কাব্যকে দৃশ্যকাব্য বলে। অর্থাৎ আধুনিক কালে যাকে নাটক বলে তাই সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য রূপে পরিচিত ছিল। কীর্তনের সঙ্গে নাটক সংরূপের যোগসূত্র স্থাপনে দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণকরা জরুরি। দৃশ্যকাব্য অবশ্যই পড়া বা শ্রবণ করা যায়, কিন্তু এর রসোপলব্ধি অভিনয়ের মাধ্যমেই সম্ভব এবং বলাই বাহুল্য তা দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে। দৃশ্যকাব্যে লেখক নিজের মুখে কিছু বলেন না, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে সব কিছু ফুটিয়ে তোলেন। সংলাপ ও আচরণ মঞ্চে দৃশ্যাকারে অভিনীত হওয়ার ফলেই নাটকের পূর্ণ রসগ্রহণ করা সম্ভব হয়। দৃশ্যকাব্য তাই মঞ্চসাপেক্ষ শিল্পকলা। দৃশ্যকাব্য অভিনয়ের সময় অভিনেতারা

নিজেদের উপরে অন্যের রূপ, ভাব ইত্যাদি আরোপ করেন বলে দৃশ্যকাব্যকে আলঙ্কারিকেরা ‘রূপক’ নামে অভিহিত করেছেন। দৃশ্যকাব্যকে রূপক সংজ্ঞা দেবার কারণ হিসেবে বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ*-এ রূপক বলার যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং। তস্য রূপক সংজ্ঞা হেতুমাহ- তদ্‌রূপারোপত্তুরূপকম্।। তদ্ দৃশ্যং কাব্যং নটে রামাদিস্বরূপারোপাদ্ রূপকমিত্যুচ্যতে।[৭৬]

অর্থাৎ, রূপের আরোপ করা হয় বলে এ হল রূপক। দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয় কারণ এতে নটের উপর রাম (চরিত্র) প্রভৃতির স্বরূপ আরোপিত হয়।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের জন্ম

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাট্যজিজ্ঞাসা ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র*-এর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর রচনা হলেও ভারতবর্ষে নাটকের অঙ্কুর অনেক আগেই প্রথিত হয়েছিল। কারণ আগে সাহিত্য এবং পরে রচিত হয় সাহিত্যতত্ত্ব। *নাট্যশাস্ত্র*-এ একটি গল্পে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মাই প্রথম নাটক রচনা করে ‘পঞ্চমবেদ’ নাম দেন। ব্রহ্মার নাটক *ঋগবেদ* থেকে সংলাপ, *সামবেদ* থেকে সংগীত, *যজুর্বেদ* থেকে অভিনয় এবং *অথর্ববেদ* থেকে রস আহরণ করে তৈরি হয়েছিল।

বৈদিক যুগের পর আদি মহাকাব্যের যুগে নাট্যবোধের বিকাশ ঘটে। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ একাধিক নাটকের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ব্যাকরণের যুগে পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ব্যাকরণে উল্লিখিত ‘নট’ ও ‘কুশীলব’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পতঞ্জলীর ব্যাকরণের টীকা *মহাভাষ্য*-এ ‘শৌভিক’ ‘শৌভিকী’ শব্দের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে ধর্মীয় প্রয়োজনে নয় বরং রাজন্যবর্গের আমোদ-প্রমোদের তাগিদে নাটক রচিত হয়েছিল। একারণেই হয়তো বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বুদ্ধনাটক করতে নিষেধ করতেন। *নাট্যশাস্ত্র* –এ রাজাদের আমোদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটকের বিকাশ সম্পন্ন হয়েছিল।

দৃশ্যকাব্যের শ্রেণিবিভাগ

সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপকের দু'টি শ্রেণি— রূপক এবং উপরূপক। এদের আবার বিভিন্ন উপবিভাজন লক্ষ করা যায়। রূপকের বিভিন্ন বিভাজন ও উপবিভাজনের মধ্যে যে নাট্যবৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তার সঙ্গে লীলাকীর্তনের আঙ্গিকগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

রূপক

ধনঞ্জয় রচিত *দশরূপক* সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। *নাট্যশাস্ত্র* একটি বিশালায়তন গ্রন্থ, এর পরিধিও ব্যাপক। এই গ্রন্থ থেকে শুধুমাত্র রূপকের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যগুলি ধনঞ্জয় গ্রহণ করেছেন। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই তিনি ভরতের মতকে নিজ মুন্সীয়ানায় স্বতন্ত্র করে তুলেছেন। *নাট্যশাস্ত্র*-এ বিংশ অধ্যায়ে *দশরূপক*-এর কথা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে—

> নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
> ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ।।
> ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে।।[৭৭]

অর্থাৎ নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন –এই দশটি রূপক নাট্যলক্ষণে জ্ঞাত। এই দশটি রূপকের নাট্যলক্ষণের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই লীলাকীর্তনের তুলনা চলে।

নাটক— নাটকের কাহিনি কোনো বিখ্যাত বিষয় অবলম্বনে রচিত হবে। এই কাহিনি হবে পঞ্চসন্ধিসমন্বিত। এতে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে। এর নায়ক হবেন কোনো বিখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি, রাজর্ষি, ধীরোদাত্ত গুণান্বিত বা প্রতাপশালী ব্যক্তি। শৃঙ্গার বা বীর হবে 'নাটক'-এর প্রধান রস। ধনঞ্জয়ের *সাহিত্যদর্পণ*-এ আছে—

> দূরাধ্বানং বধং যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবম্।।
> সংরোধং ভোজনং স্নানং সুরতং চানুলেপনম্।
> অম্বরগ্রহণাদীনি প্রত্যক্ষণি ন নির্দিশেৎ।।[৭৮]

অর্থাৎ দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া (রতিক্রীড়া), অধরদংশন, শয়ন, চুম্বন প্রভৃতি নাটকের অঙ্কে স্থান পাবে না। নাটকের এক একটি অঙ্কে একদিনের ঘটনামাত্রই

বর্ণিত হবে। নাটক-এর নায়ক, অঙ্কবিভাজন ও কাহিনি পরিসরের সঙ্গে লীলাকীর্তনের সেভাবে মিল পাওয়া যায় না। কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* হল 'নাটক'-এর লক্ষণযুক্ত।

প্রকরণ— প্রকরণের কাহিনি হবে লৌকিক এবং কবিকল্পিত। ধীরপ্রশান্ত লক্ষণযুক্ত অমাত্য, বিপ্র অথবা বণিক হবেন এর নায়ক। তিনি ধর্ম, অর্থ ও কামে আসক্ত হবেন। তাঁর কার্যসিদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি হয়। প্রকরণের অঙ্ক হবে পাঁচ থেকে দশের মধ্যেই। নায়িকা সম্পর্কে *দশরূপক*-এ বলা হয়েছে যে—

নায়িকা তু দ্বিধা নেতুঃ কুলস্ত্রী গণিকা তথা।
ক্বচিদেকৈব কুলজা বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়াং ক্বচিৎ।।[৭৯]

অর্থাৎ কুলস্ত্রী এবং বেশ্যা নায়িকারূপে থাকতে পারেন। আবার এই দু'জন একসঙ্গেও থাকতে পারেন (ভরত এদের সরাসরি সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা বলেছেন), কোথাও কেবলমাত্র কুলবধূ অথবা শুধুই গণিকা প্রকরণে থাকতে পারেন। শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে দুই শ্রেণির নায়িকা পাওয়া যায়। তবে বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের পত্নী ধুতাদেবীর সাক্ষাৎ হয়নি। স্বকীয়া ও পরকীয়াভেদে বৈষ্ণবপদাবলীর নায়িকাও দুই ধরনের। পরকীয়া নায়িকা রূপে শ্রীমতি রাধিকাকে পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন আইহনের স্ত্রী। কিছুটা হলেও এক্ষেত্রে নায়িকার ধরণগত মিল পাওয়া যায়।

ভাণ— ভাণ হল একাঙ্ক রূপক। ধনঞ্জয়ের *দশরূপক*-এ ভাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

ভাবস্তু ধূর্তচরিতং স্বানুভূতং পরেণ বা।
যত্রোপবর্ণয়েদেকো নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ।।
সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্যাদাকাশভাষিতৈঃ।
সূচয়েদ্ বীরশৃঙ্গারৌ শৌর্যসৌভাগ্যসংস্তবঃ।।[৮০]

এর বিষয়বস্তু হবে কাল্পনিক এবং নায়ক হবেন ধূর্তচরিত্র। এতে একজন নিপুণ পণ্ডিত 'বিট' থাকবেন। তিনি রঙ্গমঞ্চে নিজের ও অন্যের অনুভূতির কথা প্রকাশ করবেন। একে আকাশভাষিত অভিনয় কৌশল বলা হয়। রূপ গোস্বামী রচিত *নাটক চন্দ্রিকা* গ্রন্থে আকাশভাষিত অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন—

কচিদত্র বিনিষ্পাদ্যং ধীরৈরাকাশভাষিতং।
অন্যেনানুক্তমপ্যন্যো বচঃ শ্রুত্বৈব যদ্বদেৎ।

ইতি কিং ভণসীত্যেতদ্ভবেদাকাশভাষিতং।।[৮১]

রঙ্গমঞ্চে অন্য কোনো পাত্র না থাকা সত্ত্বেও একজনমাত্র নাটকীয় চরিত্র কোনো অনুক্ত বিষয় শ্রবণ করেছে এমন ভাণ বা ছল করেন। অর্থাৎ নিজেই অন্যের হয়ে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দেন। এভাবে অপরের উক্তি দিয়ে ক্রমশ বাক্য বিন্যস্ত হয়। এই রূপক কাল্পনিক ব্যক্তির উক্তি ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা অভিনেয়। ভাণ নামক রূপকে বিট নিজেই কখনো তিরস্কারের, আবার কখনো জুয়াড়ির অনুভূতির কথা আকাশভাষিতের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। ভারতী বৃত্তিতে সম্পূর্ণ কবিকল্পিত বিষয় সৌভাগ্য ও শৌর্য বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত হয়। শৃঙ্গার ও বীররসের স্ফিতি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ বড়াই চরিত্রের মধ্যে ভাণের সমস্ত গুণ উপলব্ধি করা যায়। নায়ক কৃষ্ণ একজন ধূর্তচরিত্রের ব্যক্তি। বড়াই রাধাকৃষ্ণের মিলনে বীটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া লীলাকীর্তনে মূল গায়েন ভাণে প্রযুক্ত আকাশভাষিত অভিনয়ের মাধ্যমে একের পর এক চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, সখী, দূতী ইত্যাদি) সংলাপ বলেন। এছাড়া ভাণ একাঙ্ক রূপক হওয়ায় লীলাকীর্তনের উপযোগী। সংস্কৃত সাহিত্যের *লীলা-মধুকর* এবং বৎসরাজের *কর্পূরচরিত* এই শ্রেণির রূপক।

প্রহসন— প্রহসন অনেকটা ভাণের মতো রচনা, এর বিষয়বস্তুও তাই। এর সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ, লাস্য এবং অঙ্কসংখ্যা ভাণের মতই হবে। ধনঞ্জয়ের মতে—

তদ্বৎ প্রহসনং ত্রেধা শুদ্ধবৈকৃতসংকরৈঃ।
পাখণ্ডিবিপ্রপ্রভৃতিচেটচেটীবিটাকুলম।।
চেষ্টিতং বেষভাষাভিঃ শুদ্ধং হাস্যবচোন্বিতম্।
কামুকাদিবচোবেষৈঃ ষণ্ঢকঞ্চুকিতাপসৈঃ।।
বিকৃতং সঙ্করাদ্ বীথ্যা সংকীর্ণং ধূর্তসংকুলম।
রসবস্তু ভূয়সা কার্যঃ ষড়্বিধো হাস্য এব তু।।[৮২]

অর্থাৎ প্রহসন শুদ্ধ, বিকৃত ও সংকীর্ণ ভেদে তিন প্রকারের হয়। কোনো ভণ্ড তপস্বী, ব্রাহ্মণ অথবা বিট বা চেট যদি বিকৃত বেশভূষা বা ভাষা ব্যবহারে অভিনয় করে তাকে শুদ্ধ প্রহসন বলে। কোনো নপুংসক, বৃদ্ধ কঞ্চুকী অথবা তপস্বী যদি কামুক ব্যক্তির আচার আচরণ করে ও সেই চরিত্রানুগ ভাষায় অভিনয় করে সেই প্রহসনকে বলা হয় বিকৃত প্রহসন। সংকীর্ণ প্রহসনে অনেক ধূর্তচরিত্রের সমাবেশ থাকে। প্রহসন মূলত হাস্যরসাত্মক রূপক। এখানে হসিত, অপহসিত, উপহসিত, অবহসিত, অতিহসিত এবং বিহসিত —এই 'ষড়্বিধো হাস্য' থাকবে। লীলাকীর্তনে বড়াই, জটিলা-কুটিলা প্রভৃতি

চরিত্রের সমাবেশে হাস্যরসের সঞ্চার করা হয়। বিশেষত বড়াই চরিত্রের বেশভূষার বর্ণনায়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা ও বাচনভঙ্গিতে হাস্যরসের বিস্তার করেন কীর্তনীয়া। কৃষ্ণ ও বড়াইর মিলিত চক্রে কুলবধূ রাধা কামবাসনায় জর্জরিত কৃষ্ণের মায়াজালে জড়িয়ে পড়েন। আধ্যাত্মিকতার বাইরে গিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এক ধূর্তচরিত্রের নায়ক বলা যায় কৃষ্ণকে। তাই ভাণ ও প্রহসন রূপকের সঙ্গে মিলিয়ে লীলাকীর্তনের পাঠ হয়তো অসঙ্গত হবে না।

ব্যায়োগ— ব্যায়োগ হল একাঙ্ক রচনা। এর কাহিনি হবে ইতিহাসখ্যাত *রামায়ণ, মহাভারত* ও পুরাণাশ্রিত। ব্যায়োগের কাহিনি হবে প্রখ্যাত। কবিকল্পিত কাহিনি এতে নিষিদ্ধ। হাস্য ও শৃঙ্গার ব্যতীত অন্য রস প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হবে। এতে স্ত্রী'চরিত্র খুব কম থাকবে। *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের বিংশ অধ্যায়ে ব্যায়োগ রূপকের নায়কের কথা আছে। এক্ষেত্রে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল—

> ন চ দিব্যনায়ককৃতঃ কার্যো রাজর্ষিনায়কনিবদ্ধঃ।
> যুদ্ধনিযুদ্ধাঘর্ষণসঙ্গর্ষশ্চাপি কর্তব্যঃ।।
> এবংবিধস্তু কার্যো ব্যায়োগো দীপ্তকাব্যরসযোনিঃ।[৮৩]

অর্থাৎ এতে দিব্য নায়ক থাকবে না। রাজর্ষি জাতীয় নায়ক এতে থাকবে। যুদ্ধ, নিযুদ্ধ, ঘর্ষণ, সংঘর্ষের বৃত্তান্ত এতে থাকবে। *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে আছে যে এই যুদ্ধ স্ত্রীলোকের কারণে হবে না। একাধিক পুরুষচরিত্র থাকলেও একদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটিমাত্র অঙ্কে ব্যায়োগ রচিত হবে। ভাসের *মধ্যম ব্যায়োগ* এই রূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমবকার— সমবকার তিন অঙ্কের রূপক। তার উপজীব্য কোনো বিখ্যাত বিষয় হবে এবং তাতে দেব ও অসুর উভয় চরিত্র থাকবে। বারোজন বিখ্যাত এবং ধীরোদাত্ত গুণান্বিত দিব্যপুরুষ বা মানুষ এর নায়ক হবেন। এর মুখ্যরস হবে বীররস। বৎসরাজের *সমুদ্রমন্থন* 'সমবাকর'-এর উদাহরণ।

ডিম— ডিম রূপকও কোনো বিখ্যাত বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়। প্রসিদ্ধ বলতে *রামায়ণ, মহাভারত,* পুরাণাদির খ্যাতিসম্পন্ন বৃত্তান্তের কথা বলা হয়েছে। দেবতা, গান্ধর্ব, রক্ষ, যক্ষ, মহোরগ,

ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি ষোল প্রকার নায়কের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধনঞ্জয় ডিম রূপক সম্পর্কে বলেছেন—

> মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।
> চন্দ্রসূর্যোপরাগৈশ্চ ন্যায্যে রৌদ্ররসেহঙ্গিনি।।
> চতুরঙ্কশ্চতুঃসন্ধিনির্বিমর্শো ডিমঃ স্মৃতঃ।[৮৪]

অর্থাৎ অন্যান্য রসের সন্নিবেশ থাকলেও এতে রৌদ্ররসই প্রধান। ভূমিকম্প, বজ্রপাত, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ, উল্কাপাত, যুদ্ধ, ব্যক্তিসংঘর্ষ, অস্ত্র, সংগ্রাম, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির মাধ্যমে রৌদ্ররস উৎসারিত হবে। ডিম চার অঙ্কবিশিষ্ট হয়। লীলাকীর্তনের সঙ্গে এর মিল নেই বললেই চলে। বৎসরাজের *ত্রিপুরদাহ* একটি ডিম শ্রেণির রূপক।

ইহামৃগ— ইহামৃগও চতুরাঙ্কের রূপক। এর নায়ক নর বা দেবতা যে কেউ হতে পারেন। এবিষয়ে নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। এই শ্রেণির রূপকে নায়ক কোনো অলভ্যা নায়িকাকে মৃগের মতো খুঁজে বেড়ান বলে একে ইহামৃগ বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বৎসরাজের *রুক্মিণী-হরণ* এই শ্রেণির রূপকের উদাহরণ।

অঙ্ক— অঙ্ক সম্পর্কে *দশরূপকম্‌*-এ বলা হয়েছে যে—

> উৎসৃষ্টিকাঙ্কে প্রখ্যাতাং বৃত্তং বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।।
> রসস্তু করুণঃ স্থায়ী নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ।
> ভাণবৎ সন্ধিবৃত্ত্যঙ্গৈর্যুক্তিঃ স্ত্রীপরিদেবিতৈঃ।।
> বাচা যুদ্ধং বিধাতব্যং তথা জয়পরাজয়ৌ।[৮৫]

উৎকৃষ্টাঙ্ক বা অঙ্ক রূপকের একটি অন্যতম বিভাগ। নাটকের দৃশ্যাত্মক অঙ্ক থেকে এটি আলাদা। তাই এই রূপককে বলা হয় উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। অঙ্ক হল এক রকমের একাঙ্ক রূপক। এর কাহিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও নাট্যকার বিচক্ষণভাবে নিজস্ব ভঙ্গিমায় কাহিনি উপস্থাপন করার সুযোগ পান। এই রূপকের স্থায়ী রস করুণ। কোনো একটি বিশিষ্ট চরিত্র এর নায়ক নন, বহু সাধারণ মানুষ হবেন অঙ্কের নায়ক। এক অর্থে গণনাট্যের আস্বাদ এই রূপক থেকে পাওয়া যায়। করুণ রসের আধিক্য তৈরি হয় বহু স্ত্রীলোকের বিলাপ থেকে। এর বৃত্তি হবে ভারতী। এখানে যুদ্ধ বর্ণিত হবে বাক্যের সাহায্যে। যুদ্ধের জয় অথবা পরাজয় বাকচাতুর্যের মাধ্যমেই উদ্ভাসিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য

রসের পদ, মাথুর, ভাবোল্লাস প্রভৃতি পর্যায়ের পদে করুণরসের আধিক্য রয়েছে। সেই অনুযায়ী লীলাকীর্তনের আসরেও করুণরসের ছড়াছড়ি। রাধা, সখী, যশোদা প্রভৃতি নারীর বিলাপে বৈষ্ণব পদাবলী ভারাক্রান্ত। সংস্কৃত সাহিত্যের *শর্মিষ্ঠা, যযাতিঃ* এই শ্রেণির রূপক।

বীথী— 'বীথী' শব্দের অর্থ হল বৃক্ষশোভিত পথ। বীথীও একাঙ্ক রূপক, তবে এর নায়ক একজন বা দুজন ব্যক্তি হবেন। *নাট্যশাস্ত্র*-এ বীথীর চরিত্র নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে— অধমোত্তমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ।[৮৬] অর্থাৎ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার চরিত্র এই রূপকে থাকবে। ভাণের মতই এর প্রথমে মুখসন্ধি ও সমাপ্তিতে নির্বহণ সন্ধি থাকবে। এর মূলরস শৃঙ্গার হলেও একাঙ্কিকার স্বল্প পরিসরে এর পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। একারণে প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য রসপ্রয়োগও বিধেয়। শৃঙ্গারের অনুকূল বলে এতে কৈশিকী বৃত্তি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যকে বীথীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণকোষ' –এ একে বীথী জাতীয় জাতীয় নাটক বলে সনাক্ত করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াটি লক্ষিত হয়। মিখাইল বাখতিন (১৬.১১.১৮৯৫-৭.৬.১৯৭৫) তাঁর উপন্যাসতত্ত্ব বিচারে ১২৬২ খ্রী. নাগাদ আদম দেলা হাইযে-র নামে প্রচলিত দক্ষিণ ফ্রান্সের আরাস শহরে অভিনীত 'The Play of the Bower' –এর আলোচনা করেছেন। সেকালের 'ত্রুবাদুর' বা আমাদের দেশের ভাটচারণ-গায়েন-অধিকারীদের দ্বারা উপস্থিত এই কুঞ্জনাটক- *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর মতো মধ্যবর্তী অবিকশিত সংরূপ।[৮৭]

স্বল্প পরিসরে শৃঙ্গাররসের পরিস্ফুটনে লীলাকীর্তন অসাধারণ নাট্যাঙ্গিক। বীথী এবং পালাকীর্তন উভয়ক্ষেত্রেই কাহিনির পরিসর বৃহৎ নয়, এক অঙ্কের হওয়ায় তা অনেকটাই ছোট। লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পালা বা খণ্ড অনুসারে লীলা বিভাজন করা হয়। সেক্ষেত্রে চরিত্রগত সাযুজ্যে বীথীর নায়ক রূপে পদাবলী কীর্তনের কৃষ্ণকে ভাবাটা অবান্তর হবে না।

কীর্তনের সঙ্গে একাঙ্ক রূপকের মিল রয়েছে। একাঙ্ক রূপকের পরিসর ছোট। সেক্ষেত্রে এর রসবিলাসে চাতুর্য থাকতে হয়। নইলে রসের পরিস্ফুটন সম্ভব হয় না। বাঁধাধরা সময়ের ঘেরাটোপে কাজ করতে হয় নাট্যকারকে। লীলাকীর্তনের উপস্থাপনেও সময় বেঁধে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রসের উদ্গার করতে হয় কীর্তনীয়াকে। এক্ষেত্রে কীর্তনের সঙ্গে তুলনায় একাঙ্ক 'ভাণ', 'ব্যায়োগ', 'অঙ্ক', 'বীথী' এবং 'প্রহসন' রূপকের নাম করতে হয়। পদাবলী কীর্তনে 'ভাণ' রূপকের

মতই ধূর্ত অথবা বিট চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণ এবং বড়াইকে পাওয়া যায়। 'নৌকাবিলাস', 'দানলীলা' প্রভৃতি লীলাকীর্তনে কৃষ্ণ এবং বড়াইর ছলনা ও চালাকির মাধ্যমে কার্যসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধার করুণ অবস্থা দেখে ভক্তের মন বিগলিত না হলেও আধ্যাত্মিকতার বাইরে থাকা মানুষের কাছে এই নিপীড়ন অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। অসহায় রাধার জন্য বেদনায় মন ভরে ওঠে। ব্যায়োগ রূপকটি একাঙ্কিকা হলেও পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য কমই রয়েছে। কারণ এতে বীর ও রৌদ্ররসের আধিক্য দেখা যায়। পদাবলীর কোমলকান্তি ব্যায়োগের অনুসারী নয়।

কীর্তনের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ হল 'অঙ্ক' জাতীয় রূপক। বৈষ্ণবরা মিলনকে (সম্ভোগ) নয়, বিরহকে (বিপ্রলম্ভ) প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই পদাবলী কীর্তনে করুণরসের আধিক্য। অঙ্কের অঙ্গীরস হল করুণ। বহু স্ত্রীলোকের আক্ষেপ এতে প্রাধান্য পায়। মা যশোদা, এবং ষোলশত গোপী ও সখীর বিলাপ এবং সর্বাপেক্ষা কৃষ্ণকামনায় রাধার বিলাপ বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বত্র বিরাজমান। 'বীথী' জাতীয় রূপকের সঙ্গে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এর মিল আগেই জানানো হয়েছে। তাই পদাবলী কীর্তনের সঙ্গে শৃঙ্গাররস-প্রধান বীথীর মিল চোখে পড়ার মতো। প্রহসন রূপকটির অঙ্গীরস 'হাস্য' হওয়ায় কীর্তনের সঙ্গে এর সরাসরি মিল নেই। কীর্তনে প্রাধান্য পায় শৃঙ্গার ও করুণরস। তবে কীর্তন হাস্যরস ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। বিভিন্ন হাস্য রসাত্মক সংলাপ কীর্তনীয়ারা ব্যবহার করেন আসরের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য। অনেকসময় লীলাকীর্তনকে চমকপ্রদ করার জন্যও হাস্যরসের সঞ্চার করা হয়। যদিও কীর্তনীয়ার রসবোধের উপর হাস্যরস সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়।

৩:৭ উপরূপক

সংস্কৃত উপরূপক আঠারোটি ভাগে বিভক্ত। যথা— নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ এবং ভাণিকা। উপরূপকগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নাটিকা, ত্রোটক ও সট্টক বিকাশলাভ করেছিল।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ দশ প্রকার রূপকের কথা বলা হলেও তিনি নাটিকাসহ এগারো ধরনের রূপকের লক্ষ্মণ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নাটিকাকে স্বতন্ত্র রূপকের মর্যাদা দেননি। একে নাটক ও প্রকরণের মিশ্রলক্ষণযুক্ত রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। নাটিকা চার অঙ্কের, স্ত্রীচরিত্রবহুল কবিকল্পিত

কাহিনি অবলম্বনে রচিত উপরূপক। এর নায়ক হবেন ধীরললিত রাজচরিত্র। নায়িকা হবেন অন্তঃপুরচারিণী, সঙ্গীতে নিপুণা ও নব অনুরাগ সম্পন্না রাজকন্যা। নাটিকার উদাহরণ শ্রীহর্ষের *রত্নাবলী*।

ত্রোটকের অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত। কোনো দিব্য পুরুষ বা সাধারণ পুরুষ হবেন এর নায়ক। ত্রোটকে বিদূষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ত্রোটকের অঙ্গীরস শৃঙ্গাররস। উদাহরণ কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়*। সট্টক অনেকটা নাটিকার মতো। সট্টকের সকল সংলাপ প্রাকৃতে হয়। এর প্রধান রস অদ্ভুত রস। এর উদাহরণ রাজশেখরের *কর্পূরমঞ্জরী*। বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ*-এ অন্যান্য উপরূপকগুলির উদাহরণ দেওয়া হলেও আজকে সেইসব গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যধারায় উপরূপকগুলির নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায়না বলে এ সম্পর্কিত আলোচনায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ভরত যে দশরূপকের নির্দেশ দিয়েছেন তা নিজস্ব ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন ধনঞ্জয়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে কীর্তনের সরাসরি মিল খুঁজলে হবে না। তবে তুলনায় দোষ নেই। কারণ আসরে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেই সময় সংস্কৃত নাটক ও *নাট্যশাস্ত্র* ছিল আদর্শ এবং অনুকরণীয় গ্রন্থ। বৈষ্ণব কবিদের বেশিরভাগই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। সেক্ষেত্রে রূপকের অনুসরণ অসম্ভব ব্যাপার নয়। কীর্তনের আঙ্গিক নির্ধারণে *নাট্যশাস্ত্র*-এর রস, ভাব, বৃত্তি ইত্যাদির ভূমিকা যেমন রয়েছে তেমনি দশরূপকের ভূমিকাও কম নয়। প্রাচীনকালে উপস্থাপনভঙ্গি কেমন হবে তা অনেকক্ষেত্রে নির্ধারিত হত *নাট্যশাস্ত্র*-এর মতো আকর গ্রন্থের নিরিখে। তাই কীর্তন আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক নয় কী? রাধাকৃষ্ণের কাহিনিও তো কম প্রাচীন নয়। প্রাচীন একটি কাহিনি কালে কালে ঋদ্ধ সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। সেই কাহিনিকে ধারণ করে পদাবলী কীর্তনের বিলাস হওয়ায় বৈশিষ্ট্যের আত্তীকরণ যথাযথ ঘটেছে।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে পদাবলীর অবয়ব থেকে লৌকিকতা সরানোর কাজ চৈতন্য পরিকরবৃন্দ করেছিলেন। যদিও অনেক আগে সংস্কৃত পণ্ডিত জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এ তা সূচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মকে চৈতন্যের অনুচরেরা লৌকিক ধর্ম করে রাখতে চাননি। অন্তত সামাজিক রীতিনীতি ও

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয়করণ ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের লোকায়ত রূপ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য রচনার পর লিখিত আকারে আর কোথাও তা পাওয়া যায় না। যদিও একথা ঠিক যে চৈতন্যদেব নিজে বৈষ্ণব ধর্মকে সমন্বয় ও লোকধর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়া পড়ে। বৈষ্ণবধর্মের শাখা রূপে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব যেন এই যুক্তির সত্যতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। স্মার্ত জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চৈতন্যের লোকায়ত ধর্মও সমাজে প্রচলিত ছিল। লোকসাহিত্যে ও শিল্পে তা উঠে এসেছে। চৈতন্যের পটশিল্প, পাটাশিল্প কীর্তনের বিশিষ্ট ঘরানায় তা প্রকাশ পেয়েছে। সে যাই হোক কীর্তনের আঙ্গিকে স্মার্ত শাস্ত্রীয়তত্ত্বের সংযোজনের পেছনে যে অভিপ্রায়ই থাক না কেন কীর্তনের আঙ্গিক তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্রে*-এর সঙ্গে মিলিয়ে লীলাকীর্তনের পাঠ এক ভিন্ন নাটকীয় আস্বাদ প্রদান করেছে। কীর্তনকে নাটকীয় আঙ্গিকে দেখার ক্ষেত্রে এই পাঠ অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ বাংলা নাটকের অলিখিত ও অবহেলিত ইতিহাস এরই মধ্যে নিহিত আছে।

৩:৬ উপসংহার

সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যোগ নিবিড়। বাংলা ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার (তৎসম ও তৎভব শব্দ), সাহিত্যসংরূপ ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে নাট্যসংরূপের আলোচনায় *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে চলে আসে। লীলাকীর্তন যে আঙ্গিকগতভাবে নাটকের পর্যায়ভুক্ত তা নিরুপণ করার ক্ষেত্রে *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপন করা হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* ছাড়াও সংগীতশাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনে গীত ও বাদ্যের বৈচিত্র্যে লীলাকীর্তন এক সুললিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। নাট্য-আঙ্গিকগত প্রতিটি ক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তন ঐতিহ্যের অনুসারী। ঐতিহ্যানুসারে গীত-বাদ্য-নৃত্য সমন্বিত উপস্থাপনে কীর্তন নাটকের সর্বগুণ সম্পন্ন সংরূপে উদ্ভাসিত।

চৈতন্য-পূর্ব-সমসাময়িক-পরবর্তী পদকর্তা ও কীর্তনীয়া পদ রচনাকালে প্রচলিত কৃষ্ণকথার ছোট্ট ছোট্ট কাহিনির অংশ কাব্যিক সুষমায় উপস্থাপন করতেন। পালাকীর্তন উপস্থাপনকালে কাহিনির ছোটো অংশগুলি কীর্তনের পঞ্চাঙ্গ, তাল, রাগ-রাগিণী, ঘরানা ইত্যাদির সহযোগে একের পর এক

বৈষ্ণবপদ সংযোজনের মাধ্যমে সামগ্রিকতার আস্বাদ প্রদান করে। একদিনের অষ্টকালীয় কীর্তনের বিভাজনকে নাটকের অঙ্কবিভাজনের মাধ্যমে উপস্থাপনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের গুণাবলী হয়তো এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। কীর্তনের আঙ্গিক কেমন হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত মান্য সাহিত্য সংরূপের প্রভাব না থাকাটাই অস্বাভাবিক। বিশেষ করে কীর্তনের মতো সংরূপে বিচক্ষণ বৈষ্ণবদের পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে এই উপস্থাপনের আঙ্গিক নাটক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে নাটকের ধারণা ঔপনিবেশিক থিয়েটারের দ্বারা কখনোই বিচার্য হবে না। বরং সেই সময় প্রচলিত *নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ, সঙ্গীতদামোদর, নাটক চন্দ্রিকা, সাহিত্যদর্পণ* ইত্যাদি গ্রন্থের আঙ্গিক সম্বন্ধীয় ধারণা কীর্তনের নাট্যগুণ বিচারে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। কেবলমাত্র নৃত্যসম্বলিত সংগীত বা পদাবলী রূপে আংশিক পরিচয় পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের সামগ্রিক নাট্য অস্তিত্বের পরিপন্থি। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের অন্যতম প্রধান নাট্য-আঙ্গিক।

তথ্যসূত্র

[১] সেন, সুকুমার। *নট নাট্য নাটক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। ১৯৬৩। পৃ. ৫৫

[২] সেন, সুকুমার। *মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস* । বিশ্বভারতী পত্রিকা। বিশ্বভারতী প্রকাশন। ২০১৫। পৃ. ২২১

[৩] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ১১৯

[৪] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ১২৮

[৫] রায়, অভিজিৎ (সম্পা.)। *নৃত্যরসমঞ্জরী নৃত্যবিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫। পৃ. ৪০

[৬] মিত্র, খগেন্দনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ণ)*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯০। পৃ. ৫

[৭] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৫৭

[৮] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ. ১৫

[৯] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৩৯৫। পৃ. ২

[১০] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ.৫৪

[১১] তদেব। পৃ. ৫৪

[১২] তদেব। পৃ. ৫৪

[১৩] রায়, জয়ন্ত (সম্পা.)। *কীর্তন কথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৯। পৃ. ৯৭

[১৪] তদেব। পৃ. ৫০০

[১৫] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ.৫৭

[১৬] তদেব। পৃ. ৫৭

[১৭] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ১৯৯

[১৮] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৩৩৬

[১৯] সেন, সুকুমার। *বৈষ্ণব পদাবলী*। ভূমিকা অংশ। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫। পৃ. এগারো

[২০] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ১৯৭০। পৃ. ৬

[২১] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ. ৫৯

[২২] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *সঙ্গীত দামোদর*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৯। পৃ. ১

[২৩] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৯৮৯। পৃ. ৩০।

[২৪] চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮। পৃ. ১৫।

[২৫] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৮

[২৬] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৫৬

[২৭] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৯৮৯। পৃ. ৫৫-৬৪

[২৮] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৯

[২৯] রায়, জয়ন্ত (সম্পা.)। *কীর্তন কথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৯। পৃ. ১৪৮

[৩০] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৭০

[৩১] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৪৬। পৃ. ৩২।

[৩২] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৫০

[৩৩] প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০। পৃ. ২০৩

[৩৪] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৫০

[৩৫] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৮

[৩৬] সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২। পৃ. ১৫১

[৩৭] মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৪৬। পৃ. ৩২

[৩৮] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৭

[৩৯] তদেব। পৃ. ৬৮

[৪০] রায়, জয়ন্ত (সম্পা.)। *কীর্তন কথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৯। পৃ. ৭৪

[৪১] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৬৭

[৪২] তদেব। পৃ. ৬৮

[৪৩] বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৯৮৯। পৃ. ২০২

[৪৪] তদেব। পৃ. ৩০

[৪৫] দাস, যদুনন্দন। *গোবিন্দলীলামৃত*। কলকাতা: বানেশ্বর ঘোষ এণ্ড কোং—ধম্বন্তরা আশ্রম। ১৯১৩। পৃ. ১

[৪৬] গিরি, সত্য। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৫। পৃ. ৬৪

[৪৭] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৭০

[৪৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ১৩৩

[৪৯] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। নাটক-চন্দ্রিকা। কলকাতা: সন্দেশ। ১৪১৩। পৃ. ২

[৫০] বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণীঃ*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী। ২০১৪। পৃ. ৮৩৭

[৫১] তদেব। পৃ. ৮৩৮

[৫২] তদেব। পৃ. ৮৭০

[৫৩] তদেব। পৃ. ৯১২

[৫৪] তদেব। পৃ. ৯১৫

[৫৫] তদেব। পৃ. ৯৪১

[৫৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ১৫৯

[৫৭] মজুমদার, বিমানবিহারী। *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা। ১৩৯৮। পৃ. ১০

[৫৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। নাটক-চন্দ্রিকা। কলকাতা: সন্দেশ। ১৪১৩। পৃ. ৩

[৫৯] বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণীঃ*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী। ২০১৪। পৃ. ১৯২

[৬০] তদেব। পৃ. ১৯২

[৬১] তদেব। পৃ. ১৯৫

[৬২] তদেব। পৃ. ১৯৭

[৬৩] তদেব। পৃ. ২০০

[৬৪] তদেব। পৃ. ১৯৯

[৬৫] তদেব। পৃ. ২০১

[৬৬] তদেব। পৃ. ২০২

[৬৭] তদেব। পৃ. ২০৪

[৬৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ২১১

[৬৯] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। নাটক-চন্দ্রিকা। কলকাতা: সন্দেশ। ১৪১৩। পৃ. ২

[৭০] তদেব। ১৪১৩। পৃ. ৩

[৭১] বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণীঃ*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী। ২০১৪। পৃ. ৪৮

[৭২] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ২২

[৭৩] তদেব। পৃ. ২২

[৭৪] তদেব। পৃ. ১৯৭

[৭৫] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭। পৃ. ১৪৮

[৭৬] সান্যাল, অবন্তীকুমার ও চট্টপাধ্যায়, গীরীন্দ্রনাথ। *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ*। ২য় খণ্ড। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৩৬৯। পৃ. ৬

[৭৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ১৯।

[৭৮] শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য এবং দাস, দেবকুমার (সম্পা.)। *দশরূপকম্*। কলকাতা: সন্দেশ। ২০১২। পৃ. ৪২

[৭৯] তদেব। পৃ. ৪৭

[৮০] তদেব। পৃ. ৫৩

[৮১] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। নাটক-চন্দ্রিকা। কলকাতা: সন্দেশ। ১৪১৩। পৃ. ১১৯

[৮২] শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য এবং দাস, দেবকুমার (সম্পা.)। *দশরূপকম্*। কলকাতা: সন্দেশ। ২০১২। পৃ. ৫৬

[৮৩] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ৩৪

[৮৪] শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য ও দাস, দেবকুমার (সম্পা.)। *দশরূপকম্*। কলকাতা: সন্দেশ। ২০১২। পৃ. ৫৮

[৮৫] তদেব। পৃ. ৬৫

[৮৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ৩৮

[৮৭] বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪। পৃ. ৫৫৭।

কীর্তন ও নাট্য-উপস্থাপনা

৪:০ ভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলী ও পদাবলী কীর্তন একেবারেই আলাদা বিষয় নয়। একটি লিখিত, অপরটি এর উপস্থাপিত রূপ। বৈষ্ণব পদাবলী যে কেবলমাত্র পাঠের জন্য রচিত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। বরং বলা যেতে পারে পদাবলী কীর্তন উপস্থাপনের জন্যই পদাবলী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। প্রাচীনকালে *চর্যাপদ*-এর পদকর্তারাও ছিলেন একেকজন বড়মাপের উপস্থাপক। বীণাবাদনরত নৃত্যের ভঙ্গিমায় প্রাপ্ত সিদ্ধাচার্যদের রেখাচিত্র এর প্রমাণ। পরবর্তীকালে জয়দেবের ক্ষেত্রেও একই পরম্পরার অনুবর্তন হতে দেখা যায়। জয়দেব নিজে পত্নী (মতান্তরে দেবদাসী) পদ্মাবতীর সঙ্গে *গীতগোবিন্দ* উপস্থাপন করতেন। এই ধারায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমুখ পদকর্তারা অনেকেই পদাবলী কীর্তন উপস্থাপনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক পদকর্তার পদে সঙ্গীতশাস্ত্রের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ব্যক্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, কীর্তন এমন সময় উদ্ভূত হয়েছিল যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে শাস্ত্রপাঠের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের নিচু তলার মানুষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হত। তবে ভক্তিধর্মের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখতে এবং বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রচারের বিষয়টি কেবলমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলত না। সর্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাব ছড়িয়ে দিতে একান্তভাবে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কীর্তন এক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল। পদাবলী কীর্তন উপস্থাপনের মাধ্যমে ভক্তিধর্মের সম্প্রচার ছিল একটি সহজ ও সর্বজনবরেণ্য পন্থা। ভক্তিধর্মের সম্প্রচারে পদাবলী রচনা এবং কীর্তনের মাধ্যমে এর সার্থক উপস্থাপন ছিল একটি স্বাভাবিক কর্ম। পাঠ নয় বরং উপস্থাপনই বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সম্পূর্ণ ধর্মীয় আবহে পদাবলীর ধারা বৈচিত্র্যে প্লাবিত হয়। শাস্ত্রীয় ধারার পাশাপাশি প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক আখ্যানেও দিব্যজ্যোতির সংযুক্তিকরণ ঘটে। স্বয়ং চৈতন্যদেব যে মেসো চন্দ্রশেখরের গৃহে অঙ্কবিভাজিত নাটক করেছিলেন তা একটি সর্বসম্মত প্রামাণ্য তথ্য। তবে সমাজে আগে থেকে এই ধারার উপস্থাপনভঙ্গি প্রচলিত না থাকলে হঠাৎ করে নাট্য উপস্থাপনরীতির উদ্ভাবন করা চৈতন্যদেবের পক্ষে কী আদৌ সম্ভব ছিল? কে কোন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করবেন, কাহিনির নির্বাচন, সাজসজ্জা, বাদ্য, নৃত্য, মঞ্চ পরিকল্পনা, পাঠ মুখস্থ করা, মহড়া দেওয়া, অভিনয়ে সামঞ্জস্যবিধান ইত্যাদি খুঁটিনাটি দিক পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। সেই সময় নিশ্চয়ই অঙ্কবিভাজনে অভিনয় প্রচলিত ছিল, তা না হলে পরিকল্পনামাফিক নাট্য উপস্থাপন কখনোই সম্ভব ছিল না। শ্রীবাস এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠোনের আয়তন নাট্য উপস্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল বলেই মনে করা যায়। একটা আস্ত রঙ্গালয় এবং ভক্তদের উপবেশনের স্থান পরিকল্পনা করা সংস্কৃত সাহিত্যে দক্ষ বিচক্ষণ পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। ‘কানাই-এর নাটশাল’ সেই সময়ে নাটক প্রচলনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের মতে—

> তৎকালীন বর্ধিষ্ণু সমাজ ছিল নবদ্বীপে আর সেখানে ছিল একমাত্র নাট্যশালা শ্রীবাসের অঙ্গন। ওই অঙ্গনেই তৎকালীন ওই সমস্ত গায়ক শিল্পীদের সমাবেশ হত প্রত্যহ।[১]

কৃষ্ণলীলা উপস্থাপন নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা চলত তার প্রমাণ চৈতন্যের নাট্য উপস্থাপন। চৈতন্য-পরিকরদের অনেকেই একইসঙ্গে কীর্তনীয়া ও পদকর্তার দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, সেই সময়ের নাট্য ছিল গীত-নৃত্য-বাদ্য নির্ভর উপস্থাপনভঙ্গি। চৈতন্যের নাট্যলীলার উপস্থাপন সেই সকল পদকর্তাদের স্মরণে অবশ্যই থাকবে। তাঁদের পদাবলী রচনায় এবং পরবর্তীকালে খেতুরী মহোৎসবে পদাবলী কীর্তন উপস্থাপনেও চৈতন্যের সাঙ্গাভিনয়ের স্মৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই মনে হয়। এই মহোৎসবের উপস্থাপিত কীর্তন পদ্ধতিই আদর্শ হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে।

বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’। বর্তমান বিশেষীকরণের (specialization) যুগে একই ব্যক্তির একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেন না। গান লেখা, সুর বাঁধা, গান গাওয়া, অটোটিউনিং, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে

আলাদা আলাদা ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন। যেখানে এক গানের উপস্থাপনে এতগুলো লোক নিয়োজিত সেখানে একজন কীর্তনীয়ার গানের সঙ্গে নৃত্য (অনেক সময় বাদ্য যেমন করতাল বাদন) ও অভিনয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না। উপস্থাপনের এই কৌশল আজও বিভিন্ন আসরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে নাট্য উপস্থাপনের ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মর্যাদা পায়নি। নাটকীয় গুণের কথা স্বীকার করলেও তা বিচার করার পদ্ধতি হয়তো সঠিক নয়। নাট্য উপস্থাপন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র এর লিখিত সাহিত্যিক রূপটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র পদাবলী কীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে এই বিভাজন ঘটেনি। এই প্রয়াস সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাস জুড়ে চলেছে। অন্ততপক্ষে বলা যায়, বাংলা নাটকের ইতিহাসচর্চার আলোকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য বলে যা কিছু পাঠ্যরূপে স্বীকৃত তার সিংহভাগ রচনাই কেবলমাত্র উপস্থাপনের জন্যই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। উপস্থাপনের মান বজায় রাখতেই হোক বা তা সংগ্রহ করে রাখার তাগিদেই হোক লিপিবদ্ধ করার কাজ কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ *রামায়ণ* এবং *মহাভারত* রচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর আখ্যান মুখেমুখে বা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল বলেই সাহিত্য তাত্ত্বিকদের মত। বাল্মীকি ও ব্যাসদেব অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের সুষমায় মহাকাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই উপস্থাপনের জন্য লিখিত রূপের প্রচলন হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্ততপক্ষে বাংলা সাহিত্যে পদাবলী, পাঁচালি, গীতিকা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। এই অধ্যায়ে নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র লীলাকীর্তন উপস্থাপনের খুঁটিনাটি দিকগুলি বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে উপস্থাপন করা হবে।

৪.১ মধ্যযুগ এবং সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত কীর্তনের পরিবেশন-রীতি

কীর্তনের সূচনালগ্ন ও তার পরবর্তী সময়ে এর উপস্থাপনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত উপস্থাপনভঙ্গির তফাৎ খোঁজা একরকম নিরর্থক প্রচেষ্টার সামিল। এই পর্যন্ত আলোচনায় (দ্বিতীয় অধ্যায়) নাট্য উপস্থাপনরীতির একটি ক্রমের হদিস পাওয়া যায়। গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে বাংলা নাট্য পরিবেশিত হত। এই একই ধারায় কীর্তনের বিকাশ সম্পন্ন হয়েছে। কালের নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের যে পরিবেশনরীতির পরিচয় পাওয়া

যায় তা নিয়ে আলোচনাই বিধেয়। নাটকের আঙ্গিকে লীলাকীর্তনের বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় *নাট্যশাস্ত্র*-এর বিভিন্ন প্রসঙ্গ (অভিনয়, বৃত্তি, রঙ্গালয় ইত্যাদি) এক্ষেত্রে উত্থাপন করা প্রয়োজন হবে। শাস্ত্রীয় স্মার্ত সমাজ-সংস্কৃতি কীর্তনের (সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, বিধিবিধান নিরূপণ, তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে) উপস্থাপনে সর্বদা সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যাবস্থায় দেশীয় সংস্কৃতির অবমাননা ও অবহেলায় মত্ত থেকেছে ভারতবর্ষের একাংশ শিক্ষিত মানুষ। দেশীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই সংরক্ষণের অভাবে ও অবহেলায় লোপাট হয়েছে অথবা লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে কীর্তনশিল্পকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে ঠিকই তবে কালের প্রবাহে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনও কীর্তন সমাদরের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কালের আবর্তে বিশ্বাস ও ভক্তিভাবে তারতম্য এসেছে অনেকটাই। তবে গ্রাম-শহরের ভেদরেখা মুছে দিয়ে কীর্তনের জনপ্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বর্তমানে পালাকীর্তন আয়োজন ও উপস্থাপনে দু'টি স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত রয়েছে। প্রথম ধারায় গতানুগতিক শাস্ত্রীয় নিয়মানুবর্তিতায় ভক্তিভাব-প্রধান কীর্তন পরিবেশন এবং দ্বিতীয় ধারায় শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার নিরিখে পেশাদার কীর্তন সম্প্রদায় রয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রে ভক্তিভাবের অস্তিত্ব থাকলেও পেশাদারিত্বে ভক্তিভাবের তারতম্য সামান্য হলেও পরিলক্ষিত হয়। পেশাদার কীর্তনীয়াদের জনপ্রিয়তা সর্বত্র। তাঁরা আসর মাতাতে পারেন। বায়নাও তাঁরাই বেশি পান। তবে উভয়পক্ষই কমবেশি কৃত্যানুষ্ঠান সহযোগে পালা উপস্থাপন করেন। কীর্তন যে পুরোপুরি কৃত্যানুষ্ঠাননির্ভর উপস্থাপন বা 'ritual performance' সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর উপস্থাপনকালে বিভিন্ন নাটকীয় উপাদান লক্ষ করা যায়। কীর্তনের এমনই সব নাট্যোপাদানমূলক বিভিন্ন সূচক এক্ষেত্রে বিচার্য হয়ে উঠবে।

কীর্তনে কৃত্যানুষ্ঠান

কীর্তন সম্পূর্ণরূপে কৃত্যানুষ্ঠান নির্ভর পরিবেশন পদ্ধতি। অভিনয় বিদ্যার (performance studies) -এর তত্ত্বানুসারে কীর্তন একধরনের রিচুয়াল পারফরম্যান্স (ritual performance)। রিচুয়াল বা কৃত্য সম্পর্কিত রিচার্ড সেস্‌নারের (Richard Schechner) মতটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল—

> Rituals are collective memories encoded into actions. Rituals also help people (and animals) deal with difficult transitions, ambivalent relationships, hierarchies, and desires that trouble, exceed, or violate the norms of daily life.[২]

জনগোষ্ঠীর কালানুক্রমে আহরিত স্মৃতি, কৃত্যানুষ্ঠানের উপাচারে ও খুঁটিনাটি ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিহিত থাকে। পরিবর্তিত কঠিন পরিস্থিতি, সম্পর্কের অবনতি, পুরোহিততন্ত্র এবং সেইসব আকাঙ্ক্ষা, যার জন্য সমস্যা তৈরি হয় অথবা প্রাত্যহিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে— এসব সমস্যা থেকে মানুষকে (এবং পশুদের) নিস্তার পেতে বা সমস্যার মোকাবেলা করতে সেই পূর্বস্মৃতি-সমন্বিত রিচুয়াল সাহায্য করে।

রিচার্ড সেস্‌নার কৃত্য বা রিচুয়াল থেকে পশুপাখিদের বাদ দেননি। তবে পশুদের সঙ্গে একটি তফাৎ রয়েছে মানুষের, যেকারণে পশুদের থেকে মানুষ অনেক এগিয়ে। মানুষ তার আহরিত স্মৃতি পরের প্রজন্মকে দিয়ে যায়। পশুদের মতো মানুষকে সকল অভিজ্ঞতার ভালো-মন্দের অনুভূতি নিজেকে নিতে হয় না। জনগোষ্ঠীর দ্বারা আহরিত স্মৃতি বিভিন্ন কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত থাকে। সেখান থেকেই মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কীর্তনের ক্ষেত্রে যে সব কৃত্যানুষ্ঠান প্রচলিত তা একদিনের সম্পদ নয়, তা বাঙালি জাতির দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ফসল। কালের প্রবাহে বহু কৃত্যানুষ্ঠান এতে যুক্ত হয়েছে আবার আনেক কৃত্য বাদ গেছে। কিন্তু এতে কৃত্য একেবারে বাদ যায়নি। কীর্তনের উপস্থাপনে একরকম স্মৃতিচারণার মাধ্যমে পুরোনো প্রজন্মের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সাক্ষাৎ ঘটে। রিচুয়ালের স্বরূপ নিরূপণে জেফ্রি সি. অ্যালেকজান্ডারের (Jeffrey C. Alexander) মতটি উল্লেখ্য—

> Rituals are episodes of repeated and simplified cultural communication in which the direct partners to a social interaction, and those observing it, share a mutual belief in the descriptive and prescriptive validity of the communication's symbolic contents and accept the authenticity of one another's intentions.[৩]

অর্থাৎ কৃত্যে থাকবে আচারের পুনরাবৃত্তি। একধরনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে কৃত্য সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আচার অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন প্রতীকের প্রতি পারস্পরিক বিশ্বাস সমপরিমাণে বজায় থাকবে। কৃত্যানুষ্ঠানে একে অপরের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কীর্তনের অনুষ্ঠানে বহু কৃত্য পালিত হত। যেমন- তুলসী গাছ স্থাপন, ফুল-মাল্য-ধূপ-প্রদীপ দ্বারা ঈশ্বরের আরতি, বন্দনা সংগীত, হরির লুট, উলুধ্বনি, নগর কীর্তন, মালসাভোগ,

দধিমন্থন ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। বছরের পর বছর একটি কীর্তনানুষ্ঠানে উক্ত বিধি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে দেখা যায়।

রিচার্ড সেস্‌নার রিচুয়ালকে ধর্মীয় (sacred) এবং ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ভেদে দুই ভাগ করেছেন। ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়। একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, প্রার্থনা, অথবা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাছে আবেদন প্রভৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই শক্তিগুলি ঈশ্বর অথবা অন্যান্য অতিমানবীয় (অবতার) স্বরূপের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে অথবা প্রতীকায়িত হতে পারে। কখনো এরা প্রাকৃতিক জগতের অংশ রূপে পরিগণিত হতে পারে। যেমন— পাথর (সাধারণ পাথর শিবলিঙ্গ রূপে পুজিত হন), নদী (গঙ্গা, যমুনা দেবী রূপে পূজিতা), গাছ (তুলসী, শাল, ফণীমনসা ইত্যাদি গাছের পূজা প্রচলিত), পর্বতমালা (শিবের বাসস্থান কৈলাশ আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে বিরাজমান, গোবর্ধন পূজা কৃষ্ণকথায় প্রচলিত) ইত্যাদি। অপরপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রিচুয়াল (sacred ritual) বলতে ধর্মীয় বিশ্বাস-রহিত ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে পালনীয় দিন (স্বাধীনতা দিবস), প্রতিনিয়ত জীবনযাপন (প্রাত্যহিক জীবনের পড়াশোনা, রান্না, খাওয়া, ঘুমোনো ইত্যাদি), খেলাধূলা এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়াকলাপ (কনভোকেশন) –সবই এই দ্বিতীয় শ্রেণির রিচুয়ালের অন্তর্ভুত। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাব থাকে না ঠিকই কিন্তু নিয়মানুবর্তী, আনুষ্ঠানিকতা, সামাজিক বিশ্বাস প্রভৃতি সবটাই পরিলক্ষিত হয়।

রিচুয়াল বলতে এক বৃহৎ পরিসরের কথা বলা হয়েছে। এই পরিসরকে তাত্ত্বিকেরা উপস্থাপন বা পারফরম্যান্স রূপে চিহ্নিত করেছেন। পারফরম্যান্সের সংজ্ঞা নিরূপণেও এই ব্যাপ্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে। রিচার্ড সেস্‌নারের পারফরম্যান্স সম্পর্কিত মত এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> Performance – whether in the performing arts, sports, popular music, or everyday life—consist of ritualized gestures and sounds. Even when we think we're being spontaneous and original, most of what we do and utter has been done and said before—by us even.[8]

উপস্থাপিত শিল্প-কলা, জনপ্রিয় গান অথবা প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত করে চলা অঙ্গভঙ্গি ও শব্দের ব্যবহার— সবকিছুই একধরনের পারফরম্যান্স। যেমন প্রাত্যহিক চা খাওয়া (সশব্দ বা নিঃশব্দ) এবং হঠাৎ ভীষণ গরম চায়ে জিভ পুড়ে গেলে যে আর্তনাদের ভঙ্গিমা ও তার সঙ্গে অবলীলায় বেরিয়ে আসা

কথা ('ইসস্ জিভটা পুড়ে গেল!' জাতীয় কিছু) সবই পারফর্ম্যান্স। এক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি ও শব্দের পুনঃপৌনিকতা থাকবে। এমনকি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে করা কোনো কাজ বা ভাষার ব্যবহার মৌলিক মনে করা হলেও আদতে তা প্রত্যেকের অজান্তেই অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় একটি পন্থা। যা বলা হয় এবং যা করা হয়, সেই কথা ও কাজ আগেই কোনো না কোনো ভাবে বলা অথবা করা হয়েছে।

কীর্তন সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় রিচুয়ালের পর্যায়ভুক্ত। কীর্তনে আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণের প্রতি অগাধ ভক্তিভাব ও বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। কীর্তনের সেবায়তদের মধ্যে ধর্মীয় চিহ্নের বা আচার-আচরণের পারস্পরিক সংযোগস্থাপনে সমস্যা হয় না। কীর্তনের বিধি-নিয়মের ফারাক থাকলেও সর্বভারতীয় স্তরে (ভারতের বাইরেও) ভক্তিভাব আদান-প্রদানে সমস্যা হয় না। ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা এবং তার অবতার রূপে গৌরাঙ্গের মূর্তি, পটচিত্র, পাটাচিত্র, গাছ, পাথর, জীবনীগ্রন্থ, বাদ্যযন্ত্র (শ্রীখোল ও করতাল) ইত্যাদির পূজা প্রচলিত আছে। এছাড়া তাঁর সাধনার অঙ্গ রূপে কীর্তনের উপস্থাপন ও এর সঙ্গে যুক্ত বিধি-নিয়ম সবটাই ধর্মীয় রিচুয়াল পারফরম্যান্স বলে গণ্য করা যায়।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলে কীর্তন উপস্থাপন করা হলে সেখানে বিধিবিধানের কঠোর শাসন থাকে না। তবে আনুষ্ঠানিক সংকীর্তনে বৈষ্ণব, গোস্বামী-মহন্ত এবং পুরোহিত নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মান্য করা হয়। প্রহর অনুসারে সংক্ষীপ্ত ও দীর্ঘতর পরিসরে সংকীর্তন আয়োজিত হয়। সময়ের নিরিখে অষ্ট-চব্বিশ প্রহর, পঞ্চরাত্র, নবরাত্র, চৌদ্দমাদল, হরিহাট, হরিবাসর প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায়। শুভ দিন দেখে সংকীর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শুভারম্ভের আগের দিন অধিবাস ও সঙ্কল্প অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাস এবং সংকল্পের মতো মঙ্গলসূচক ক্রিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির অংশ। এমনকি বিবাহ অনুষ্ঠানেও তা পরিলক্ষিত হয়। মৃদঙ্গ বাদনে অধিবাসের পদ গাওয়া সম্পন্ন হলে পুরোহিত বা বৈষ্ণব-মহন্ত গোছের ব্যক্তি সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করান। সঙ্কল্পকারী ব্যক্তিবর্গ হাতে কাঁসা অথবা তামার পাত্র (গঙ্গাজল, তামা, তুলসী, পুস্প ইত্যাদি) সঙ্কল্পচিহ্ন রূপে ধারণ করেন। অষ্টসখীর প্রতীক রূপে বস্ত্রাদি সহযোগে অষ্টস্তম্ভ সমন্বিত মণ্ডপ সজ্জিত হয়। অনেকসময় পূর্বেই স্থায়ী মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বৃন্দবনের কুঞ্জের অনুরূপ মণ্ডপের মাঝামাঝি দেবতার বেদী সাজানো হয়। বেদীর উপর রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও তার দুই পাশে গৌর-নিতাই, জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্তি স্থাপন করা হয়। কুঞ্জাভিষেকে থাকা মণ্ডপ প্রদক্ষীণ

করে সখী-মঞ্জরীভাবের অনুবর্তী হয়ে কীর্তনীয়া নামকীর্তন করেন। মণ্ডপের সামনে অথবা পাশে আসর বা মঞ্চ রচিত হয়। আমন্ত্রিত কীর্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলকে 'বরণ-দল' রূপে সম্মানিত করা হয় যাঁরা নামকীর্তনের সূচনা করেন। পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রিত সম্প্রদায়গুলি নিজেদের সুবিধা বুঝে বিশ্রাম নিয়ে সহযোগী মনোভাবাপন্ন হয়ে নামযজ্ঞের অখণ্ডতা বজায় রাখেন। কোনো কোনো মণ্ডপে অখণ্ড নামযজ্ঞের প্রতীক রূপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন একটি আনুষ্ঠানিক মাত্রা পায়।

অনুষ্ঠান সাধারণত বিকেল থেকে শুরু হয় ভাগবত পাঠ করে। সন্ধ্যেবেলা ঘটস্থাপন করে নামকীর্তন শুরু হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় নামগানের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ জয়সূচক কীর্তনগান করেন অথবা বিশিষ্ট কীর্তনের দলকে বায়না করা হয়। অখণ্ড নামকীর্তন সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা থেকে একদিন বাদে সকালবেলা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। সকালবেলায় নগরসংকীর্তনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের পথে-প্রান্তরে এবং শহরাঞ্চলে নির্দিষ্ট অলিগলি দিয়ে ভ্রমণ করা হয়। এই নগরকীর্তনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণের বাঁধানো ছবি থাকে। ছবিটি মাল্য ও চন্দন দিয়ে সাজানো হয়। অনেক সময় চৈতন্যের সাজসজ্জায় যেকোনো বালক এই কাজে নিযুক্ত হয়। সঙ্গে থাকেন এক বা একাধিক শ্রীখোল ও মন্দিরাবাদক। নৃত্য ও বাদ্যের তালে তালে তাঁরা নামসংকীর্তন করেন। প্রতিটি বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে জল ঢেলে দেওয়া হয়। সেইস্থানে ঐ ছোট দলটি কিছুক্ষণ নামগান করে অন্য বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। দলের সঙ্গে থাকা শিশুরা সেই কাদাজলে লুটোপুটি খায় এবং গৃহস্তের হরিরলুটের বাতাসা সংগ্রহ করে। যদিও এই সমস্ত প্রক্রিয়া স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বদলায়। শহরাঞ্চলে এরূপ হরিরলুট বা কাদাজলে লুটোপুটি কিছুই দেখা যায় না। এছাড়া গৃহকর্তার কাছ থেকে দক্ষিণাবাবদ টাকা ও চাল-সব্জী সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নগরকীর্তনের অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নগরকীর্তন সমাপন হয় মন্দির বা মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে এসে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় নগরকীর্তনের সময় একটি অভিনব লোকবিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মৌশল গ্রামে নগরকীর্তনকালে কিছু কিছু বাড়িতে অধিক সময় অতিবাহিত করেন নগরকীর্তনের দল। সেক্ষেত্রে বাড়িতে থাকা সদ্য বিবাহিত অথবা নিঃসন্তান নারী গৌর-নিতাইয়ের ছবি বুকে জড়িয়ে কান্নার ভঙ্গি বা অভিনয় করেন। তিনি কিছুতেই তাঁর সন্তানকে ছাড়তে চাইছেন না এমন

একটা ভঙ্গি তাতে প্রকাশ পায়। কিন্তু কীর্তনের দল তো কিছুতেই চৈতন্যকে ছেড়ে যেতে পারেন না। তাদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষ সন্ধি ঘটে। যদি তাঁদের ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবেই সেই নারী চৈতন্যকে (চৈতন্যরূপী বালক ও গৌর-নিতাইয়ের ফটোফ্রেম) ছাড়বেন। দলের সঙ্গে একধরনের নাটকীয় সমঝোতা করে, উপযুক্ত দক্ষিণা সংগ্রহ করা হলে গৌরাঙ্গকে (গৌরাঙ্গবেশী বালক ও গৌরাঙ্গের বাঁধানো ছবি) ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় নগরকীর্তনে যুক্ত ব্যক্তিদের জল-বাতাসা ও অন্যান্য মিষ্টিদ্রব্য খাওয়ানো হয়। এই লোকবিশ্বাস সেখানকার মানুষের কাছে স্বাভাবিক একটি ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু বহিরাগত হিসেবে যে কোনো মানুষকেই এই অভিজ্ঞতা আশ্চর্যচকিত করে। সন্তান কামনার কৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কীর্তন এক যুগ্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে।

নগরকীর্তন অবসানে মৃত্তিকা নির্মিত মালসায় ভোগ সাজানো হয় যা 'মালসাভোগ' নামে পরিচিত। মালসায় দুধ, চিঁড়া, গুড়, বাতাসা, মুড়কী, ফল, মিষ্টি, কাজু, কিসমিস ইত্যাদি সহযোগে সাজান হয়। মালসার সঙ্গে একটি করে ডাব এবং সাধ্যানুসারে দানবস্ত্র দেওয়া হয়। যাঁদের দানবস্ত্র দেবার সাধ্য থাকে না তাঁদের মালসার উপর একটি বস্ত্র মেলে দেওয়া হয়। মালসা সাজানোর সময়েও কোথাও কোথাও ভোগের পদ গাওয়া হয়। এরূপ মালসা সাজিয়ে পূজা সমাপন হয় প্রায় বিকেল অথবা সন্ধ্যায়। ভগবানের কাছে নিবেদনের পর মালসা 'মহাপ্রসাদ' নামে অভিহিত হয়। সকলে নিজ নিজ মালসাভোগ নিয়ে গেলে সেই সন্ধ্যায় পালাকীর্তনের ব্যাবস্থাপনা করা হয়। সেই সন্ধ্যে থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বা তার পরদিন একইভাবে সঙ্ঘটিত হয় এবং ভোরবেলা কুঞ্জভঙ্গের গান গেয়ে লীলাকীর্তন সমাপ্ত হয়। কীর্তন চলাকালীন ভক্তদের অনেকের মানত বা মানসিক অনুসারে মাঝে মাঝেই 'হরিরলুট' দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বসে থাকা ভক্তদের উদ্দেশ্যে বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেকসময় সিক্ত বস্ত্রে সধবা নারীদের আসর ও মণ্ডপ পরিক্রমা করতে দেখা যায়।

পালা সমাপ্ত হলে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের অবসান ঘটাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান 'দধি-মন্থন' বা 'দধি-উৎসব' নামে পরিচিত। রাধা-কৃষ্ণের দ্বাপর-লীলার অনুকরণে দধি-হাঁড়ি নিয়ে এক বা একাধিক সম্প্রদায় মিলে কীর্তন সহোযোগে নগর বা গ্রাম পরিক্রমা করেন। নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে পরিক্রমা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। একটি নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধ, হলুদ, মধু, জল, দূর্বা ও

আতপ চাল ভরে দধির হাঁড়ি প্রস্তুত করা হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এই দধিমন্থনে সামিল হন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যে দধি-মন্থনকালে দধিমঙ্গল পদ গাওয়া হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে দধির দল সমবেত হলে সেখানে জল ঢেলে কাদা করা হয়। উপস্থিত সকলে মিলে কাদা মাখামাখি করে এক অপূর্ব ক্রিড়ায় মেতে ওঠেন। প্রচলিত বিশ্বাস, এভাবে ভক্তভগবানের পদরেণু সকলে আশির্বাদের মতো গ্রহণ করার সৌভাগ্য পান।

অষ্টকালীন লীলাকীর্তনে একটি ক্রম প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়। ক্রমটি এইরূপ- রসোদগার, দেবগোষ্ঠ, সূর্যপূজা, উত্তরগোষ্ঠ, রূপাভিসার, আক্ষেপানুরাগ, রাসলীলা ও কুঞ্জবিলাস। দু'দিন জুড়ে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হলে ক্রমের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এলেও কৃষ্ণের গোষ্ঠ, উত্তর গোষ্ঠ, রাসলীলা ও কুঞ্জভঙ্গ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ কৃষ্ণ গোষ্ঠে যেতেন দুপুরে এবং ফিরতেন সন্ধ্যায়। রাসলীলা দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ কুঞ্জ সাজে রাতের বেলা। অনেক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে শেষ দিনে হয় খিচুড়ি বিতরণ।

কীর্তনানুষ্ঠানে প্রতি ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা, সহজ বিশ্বাস, ঘটনার পারম্পর্যে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান (sacred ritual) পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতায় পূর্বস্মৃতি সহায়কের ভূমিকা পালন করে। প্রতি বছর একই তিথিতে কীর্তনানুষ্ঠানের কথা অঞ্চলের মানুষের স্মরণে থাকে। সাধারণ মানুষ চাঁদা দিয়ে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কীর্তনের আসরে বলে যাওয়া প্রতিটি কথার প্রতি ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এইভাবেই নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে কীর্তন নামক ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান (sacred ritual performance) সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

কীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজক

মধ্যযুগের ধর্মীয়ভাবাপন্ন মানুষ নিজ বাড়িতে ও মন্দিরে কীর্তনের অনুষ্ঠান করতেন। চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-সমসাময়িক সময়ে কীর্তন করা বেশ দোষের কাজ ছিল। কীর্তন করলে মানুষে নিন্দা করত। *চৈতন্যভাগবত* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এর প্রমাণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শ্রীবাসের গৃহে কীর্তনের

অনুষ্ঠান হত। তবে সেই সময় নামকীর্তনই বেশি প্রচলিত ছিল। তবে আজকের দিনের মতো জাঁকজমকপূর্ণ কীর্তনের অনুষ্ঠান তখন হত না। কীর্তন ছিল নিত্যপালনীয় কৃত্যানুষ্ঠান।

চৈতন্য-সমসাময়িক সময়ে কীর্তন করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কাজীদলনে চৈতন্যদেব গৃহবন্দি কীর্তনকে মুক্তি দেন এবং নগরকীর্তনের প্রচলন করেন। মধ্যযুগে প্রতিনিয়তই কীর্তনের আসর বসত। তবে বিশেষ তিথি অনুযায়ী কীর্তনের আয়োজন হত। চৈতন্যদেব দোলপূর্ণিমা পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের সময় কীর্তন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছেল বলে জানা যায়। এছাড়া মানুষ দূরদেশে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে কীর্তন করতেন। বাংলা থেকে উড়িষ্যার রথযাত্রায় যাওয়ার সময় কীর্তন করতে দেখা যায়। রথযাত্রার অনুষ্ঠানে দলভিত্তিক কীর্তনের কথা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে পেশাভিত্তিক কীর্তনের দল হয়তো উনিশ শতকের পূর্বে ছিল না। কীর্তনের বিনিময়ে অর্থের কথা মধ্যযুগে কল্পনাই করা যায় না। বিশেষভাবে দলভিত্তিক কীর্তনে অর্থের বিনিময় করা ছিল দোষের কাজ। মানুষ স্বেচ্ছায় কীর্তন করতেন। মানুষের গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি অফুরন্ত সময় থাকত। চাষাবাদেও অগাধ অবসর তৈরি হয়। এই সময়কে ধর্ম-কর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে মানুষ আগ্রহী হতেন। কীর্তন, পাঁচালি ইত্যাদির মাধ্যমে অবসর বিনোদন করা হত। বর্তমানে প্রচলিত কীর্তনানুষ্ঠান মধ্যযুগের তুলনায় অনেকটাই আলাদা।

বর্তমানে প্রচলিত কীর্তন একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা পায়। বিভিন্ন ক্লাব-কমিটি, মন্দিরের সেবায়তবর্গ এবং একক গৃহস্থের উদ্যোগে কীর্তনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত বিভিন্ন তিথি যেমন জন্মাষ্টমী, দোল, ঝুলন প্রভৃতি অনুযায়ী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব নির্দিষ্ট তিথি ছাড়াও বিভিন্ন দিন-ক্ষণ, পালা-পার্বণেও কীর্তনের আয়োজন হয়ে থাকে। ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আয়োজকেরা কীর্তনীয়াদের বায়না করেন। বায়না সুনিশ্চিত করার জন্য মূলগায়েনের ফোনে বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আগাম টাকা পাঠানো হয়। তবে পরিচিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের সুসম্পর্ক থাকায় পালা শেষে তাঁরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। আয়োজকেরা কীর্তন সম্প্রদায়ের থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। বায়না করার সময় দলকে অনেক সময় আগে থেকে বলা হয় না তাঁরা হরিবাসরে কোনো রসপর্যায়ের পালা উপস্থাপন করবেন। প্রতিটি দল কম-বেশি

ছয় থেকে বারো হাজার টাকা পান। দূরত্ব ও সুনাম অনুযায়ী বায়নার টাকা নির্ভর (কমবেশি) করে। কীর্তন সম্প্রদায়ে মূলগায়েন অন্যান্য সদস্যের তুলনায় বেশি টাকা পান। কারণ সমগ্র উপস্থাপনায় তাঁর পরিশ্রম সবথেকে বেশি হয়। লীলাকীর্তনে সম্প্রদায়ের পালা সমাপন হলে সাজসজ্জা পরিবর্তন করে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান। যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি গাড়ি ভাড়ার ব্যাবস্থা নিজেরাই করেন। তবে কোনো দলের পর পর দু'দিন বায়না থাকলে তাঁরা সেখানেই থেকে যান। ফাঁকা মাঠ বা মন্দির প্রাঙ্গণে হরিবাসর আয়োজিত হয়। স্কুল ঘর, হল ঘর, সেবায়তদের বাড়ি প্রভৃতি স্থানে শিল্পীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পালার সূচনা এবং সমাপ্তি নির্ধারণে আয়োজকের নির্দেশ মান্য করা হয়। দল সাধারণত এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা ধরে পালা উপস্থাপন করেন। কিন্তু আয়োজকের অনুরোধে এই সময়সীমা বাড়ানো বা কমানো হয়। আয়োজক কর্তৃক ভক্তবৃন্দদের জলপানের ব্যবস্থা করা হয় হরিবাসরেই। এঁদের অনেক সময় আলাদা রঙের (হলুদ, গেরুয়া) পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। এছাড়া আয়োজকেরা কীর্তন চলাকালীন ভক্তবৃন্দদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। কীর্তনানুষ্ঠানে উপস্থাপনের অঙ্গ রূপে আয়োজকের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মূলগায়েন, দোহার ও বাদ্যকর

মধ্যযুগে দলগত উপস্থাপনের প্রচলন ছিল প্রায় সকল উপস্থাপনমাধ্যমে। দলে থাকতেন সাত থেকে পনেরো জন সদস্য। নারীদের কীর্তনে অধিকার ছিল না। জয়দেবের ঘরোয়া দলের কথা সকলের জানা আছে। তিনি ছিলেন প্রধান অধিকারী বা মূল গায়েন। উপস্থাপিত পালার নিয়ন্ত্রণকর্তাও তিনি। তাঁকে সংগীতে সাহায্য করতেন এক বা একাধিক দোহার। পদ্মাবতী ছিলেন নর্তকী। রাজসভা ব্যাতীত অন্য স্থানে কৃষ্ণকথা উপস্থাপনে সাধারণত নারীদের দেখা যেত না। পালা উপস্থাপন করার সময় গান করতেন মূলগায়েন এবং তাঁর গানের শেষ অংশ বারবার নানা সুর ও তালে গাইতেন একজন দোহার। এইভাবে মধ্যযুগে ধুয়ার বা ধ্রুবপদের প্রচলন হয়েছিল। কখনো কখনো এই ধ্রুবপদ পৃথক পদ আকারে গীত হত। পদাবলী কীর্তনে সে সুযোগ যদিও অনেক কম। পদকর্তাদের পূর্বনির্ধারিত পদ রচনায় ধুয়ার বৈচিত্র্য অনেক কমে যায়। তবে দোহারের ভূমিকা তাতে কিছু কমে যায় না। মূলগায়েন ও দোহারের পাশাপাশি দলে থাকতেন একাধিক বাদ্যকর। পুরীর রথযাত্রায় সাতটি কীর্তন সম্প্রদায় বা দল তৈরি

হয়েছিল। দলে ছিলেন একজন মূলগায়েন, নর্তক এবং একাধিক বাদ্যকর। প্রথম অধ্যায়ে সাতটি সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে একটি কীর্তনে সাধারণত পাঁচ থেকে আটজনের দল হয়। দলে একজন মূল গায়েন, দু'জন খোল-বাদক, একজন করতাল বা ঝম্পবাদক এবং একজন হারমনিয়াম বাদক থাকেন। অনেক সময় বেহালা, বাঁশি, সিন্থেসাইজার ইত্যাদি বাদকদেরও দেখা যায়। মূল গায়েন সমস্ত কীর্তন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি কীর্তনকালে ভক্তদের কোলাহল নিয়ন্ত্রণ করেন। কখনো কীর্তনীয়া পালা বন্ধ করে বিশেষ বিশেষ দর্শককে সতর্কও করেন। কীর্তনের তাল ও লয় কেমন হবে (ধীর না দ্রুত) তাও তিনি হাতের ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। বাদক ও দোহারদের সুর ও তালের মাত্রা কীর্তনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে তুলতে মূল গায়েন সর্বদা তৎপর থাকেন।

লীলাকীর্তনে মূল গায়েনের প্রধান কাজের মধ্যে একটি অভিনয় করা। নাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে ভরত বলেছেন অভিনয় হল 'অবস্থানুকৃতি'। অবস্থার অনুকৃতি হতে পারে চারভাবে। যথা— অঙ্গভঙ্গি, বাক্য, বেশভূষা এবং রোমাঞ্চ স্বেদোদম প্রভৃতির দ্বারা। *নাট্যশাস্ত্র* –এ নির্দেশিত অঙ্গভঙ্গি বা আঙ্গিক অভিনয় লীলাকীর্তনে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। বিশেষভাবে নৃত্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তির প্রকাশ এতে লক্ষণীয়। এছাড়া *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত বাগাভিনয়ের লক্ষণযুক্ত 'গুণকীর্তন' কীর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি।

একের পর এক সংলাপ বলে যান কীর্তনীয়া যেখানে চরিত্রানুগ (রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, জটিলা, কুটিলা, দূতী, সখী ইত্যাদি) বাক্যের অনুকৃতি ঘটে। ভাব প্রকাশে চরিত্রের অঙ্গভঙ্গিও অনুকরণ করা হয়। সংলাপ অভিনয় প্রসঙ্গে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* –এ যে 'রূপানুরূপ' অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ নারী পুরুষের ভূমিকায় ও পুরুষ নারীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। লীলাকীর্তনে মূল গায়েন পুরুষ কিংবা নারী যেই হন না কেন তাঁরা নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রে পালার উপস্থাপন করেন। নারীর সংলাপে কণ্ঠস্বরের কোমলতা বজায় রেখে সংলাপ বলার প্রবণতা পুরুষ কীর্তনীয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বেশভূষা বা আহার্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে কীর্তনীয়া বিশেষ যত্নশীল হন। লালচেলি, বাঁশি, তিলক, কণ্ঠী, নুপুর ইত্যাদি

বিভিন্ন চরিত্রের নিরিখে ব্যবহার করেন কীর্তনীয়া। এছাড়া সাত্ত্বিক অভিনয়ে কীর্তনীয়া চরিত্রানুগ রোমাঞ্চের (কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ও বিরহে) প্রকাশ অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলেন।

অভিনয় বিদ্যার বিশিষ্ট প্রবক্তা জেফ্রি সি. অ্যালেকজান্ডার অভিনেতা-দর্শক-টেক্সট এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল—

> In psychological terms, the relation between actor and text depends on cathexis. The relation between actor and audience, in turn, depends on the ability to project these emotions and textual patterns as moral evaluations. If those who perform cultural scripts do not possess the requisite skill (Bauman 1989), then they may fail miserably in the effort to project their meanings effectively.[৫]

একজন অভিনেতা একটি টেক্সট থেকে বিষয়বস্তু নিজের মতো করে সাজিয়ে দর্শকের কাছে উপস্থাপন করেন। এতে টেক্সটের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। টেক্সট থেকে নেওয়া বিষয়বস্তু একজন অভিনেতা তাঁর নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে সাজিয়ে অভিনয় ক্ষমতার দ্বারা একধরনের নৈতিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। দর্শক অভিনেতার অভিনয়ে অভিভূত হয়ে তিনি নিজেকে মানসিকভাবে একাকার করে ফেলবেন কাহিনির চরিত্রের সঙ্গে। এভাবে টেক্সটের চরিত্র অভিনেতার মাধ্যমে সার্থকরূপে প্রকাশিত হলে ক্যাথেক্সিস (cathexis) ঘটে।

লীলাকীর্তনে *গোবিন্দলীলামৃত* -এর মত গ্রন্থকে যদি টেক্সট হিসেবে ভাবা যায় তবে সেই অনুরূপ কাহিনির উপস্থাপন কীর্তনকালে করেন মূলগায়েন বা অভিনেতা। মূলগায়েন নিজের মতো করে ভক্তের সামনে রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ চরিত্রে অভিনয় করেন এবং চরিত্রানুগ সংলাপ বলেন। আসরে অভিনীত পালার উপস্থাপনে কৃষ্ণ, রাধা, সখী ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে মূল গায়েনকে একাকার করে ফেলেন ভক্ত-দর্শকবৃন্দ। পালা উপস্থাপনকালে আবেগাত্মক কান্না এবং পারস্পরিক কোলাকোলি করতে দেখা যায়। এক দিক থেকে এই যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ পালা উপস্থাপনের অংশ হয়ে ওঠে। একজন অভিনেতা হিসেবে মূলগায়েন তাঁর টেক্সটের সত্যতা খুঁজে পেলে তবেই অভিনয় সম্পূর্ণতা পায়। কীর্তনকালে কীর্তনীয়া এমনই একাত্ম হন যে তাঁর থেকে বয়সে বড় কোনো ব্যক্তি ভক্তিভরে পদস্পর্শ করলেও অভিনেতারূপে তাঁকে কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায় না। কারণ যখন তিনি আসরে ওঠেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় লোপ পায়।

পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন উদ্বোধনী বন্দনা সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়। এরপর গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে কখন পালায় প্রবেশ করবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মূলগায়েনের ইচ্ছার উপর। এরপর মূল পালায় প্রবেশ করে সমাপ্তিতে মিলনের পদ গাওয়া হয়। মূল গায়েন আখর, কথা, তুক ইত্যাদি সংযোজনে যত পটু হন ততই লীলারস জমে ওঠে। ঘটনার প্রেক্ষিতে সংলাপ জুড়ে দেওয়ার কৌশল না জানা থাকলে কীর্তন বড্ড ফিকে ও সংলাপ ভীষণ বেমানান লাগে। মূলগায়েন একাই কৃষ্ণ, রাধা, ললিতা, জটিলা, কুটিলা, বড়াই প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ একাই বলেন। *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত 'আকাশভাসিত' অভিনয় দেখা যায়। অভিনয়ে দক্ষতা এক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজন। আবার কখনো কখনো দোহার এবং খোলবাদক সংলাপে অংশ নেন। অভিনয় কালে একা মূল গায়েনই নানাবিধ মৌখিক অঙ্গভঙ্গি, হস্ত ও পদ সঞ্চালনে সুশোভিত নৃত্যকালার মাধ্যমে মধুর-শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতিও রসের আস্বাদন ঘটান। অবলীলায় তিনি কাঁদতে, হাসতে, নৃত্য করতে পারেন। বিভিন্ন চরিত্রে একক অভিনয়ে মূলগায়েন লীলাকীর্তন উপস্থাপন করেন। এতে কীর্তন উপস্থাপনের বিচারে নাট্যের গুণপনায় ভরে ওঠে।

নৃত্যপটুতা একজন কীর্তনীয়ার বৈশিষ্ট্য। বিশেষত লীলাকীর্তনে নৃত্য একটি আবশ্যক অঙ্গ। বিশেষ বিশেষ পালা যেমন রাসলীলা, কুঞ্জভঙ্গ, সূর্যপূজা প্রভৃতি পালায় মূল গায়েনকে অনেক বেশি নাচতে হয়। তবে নৃত্য পেশাদার দলের লীলাকীর্তনে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কারণ কীর্তন এখন শুধুমাত্র ভক্তিভাবের সামগ্রী হয়ে নেই, তা হয়ে উঠেছে বিনোদনমূলক। তাই বিপ্রলম্ভ পর্যায়ের পালাতেও (যেমন- মাথুর, প্রভাসযজ্ঞ ইত্যাদি) নৃত্যের আধিক্য লক্ষ করা যায়। মাথুর পর্যায়ে করুণরস প্রাধান হয়। লাস্যময় নৃত্যের সংযোজনে একধরনের রসবিকার ঘটে। অনেক কীর্তনীয়া আছেন যাদের আসরে ওঠার আগে বলে দেওয়া হয় "দিদি/দাদা ভালো করে নাচবেন কিন্তু।" নৃত্যপটু গায়েনের বায়না তুলনায় বেশি। পেশাদারিত্বে দর্শকদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কথা প্রাধান্য দিতে হয়। কীর্তনে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গুরুত্ব অনেকটাই খর্ব হয়। অনেক বেশি দৃশ্যনির্ভর হয়ে ওঠে উপস্থাপন। কৃত্যমূলক ভক্তিভাব থেকে বেশি প্রধান হয় বিনোদন। মধ্যযুগীয় কীর্তনের ভাব ও অভিপ্রায় থেকে কীর্তন অনেকটাই সরে এসেছে। এক্ষেত্রে কীর্তন কৃত্যানুষ্ঠান (ritual performance) থেকে কৃত্যানুষ্ঠান জাতীয় উপস্থাপনের (ritual-like performance) গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছে।

কৃত্যের সঙ্গে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীকভাবে জড়িত। সেখানে বিশ্বাস না থাকলে সেই ক্রিয়াকর্মকে সম্পূর্ণভাবে কৃত্যানুষ্ঠান বা রিচুয়াল বলা যায় না। এখানে কৃত্যানুষ্ঠান থাকলেও তাতে ধর্মীয় ভক্তিভাব

অবহেলিত। যেসব বিধি একসময় পালন করা হত তা হয়তো এখনও পালিত হয় কিন্তু এতে বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে যায়। অনেক অনুষ্ঠানই কেবলমাত্র আনন্দের উদ্‌যাপনে (যেমন দধিমন্থন অনুষ্ঠানের সমাপনে কাঁদা খেলা আধ্যাত্মিকতা বর্জিত নিছক আনন্দের সামগ্রী হয়ে উঠেছে) পালিত হয়। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস কেবলমাত্র একটি পালনীয় বিষয়রূপে থেকে যায়। কীর্তনের বাইরের খোলসটা কৃত্যানুষ্ঠানমূলক হলেও তা অন্তরের ভক্তিভাব থেকে পৃথক পথ অবলম্বন করছে।

মূল গায়েনের চাকচিক্য ও মুখসৌষ্ঠব বর্তমানে একটি বিশেষ গুণাবলীর মতো যুক্ত হয়েছে। কীর্তনীয়া মনোরঞ্জন চক্রবর্তী জানান যে কীর্তনীয়াদের ‘গ্ল্যামার’ না থাকলে তারা কম বায়না পান। কারণ মূল গায়েনের সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। গলা ভালো হবার পাশাপাশি গৌরকান্তি দর্শকদের আকর্ষণ করে। মঞ্চে তালি তাদের জন্যই বেশি পড়ে যারা রূপে, নৃত্যে দর্শকদের মন ভোলাতে পারেন। চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক এবং যাত্রা-থিয়েটারের প্রভাব এক্ষেত্রে ভীষণভাবে কীর্তনের উপস্থাপনে পরিবর্তন এনেছে। দর্শননির্ভরতার কারণে কণ্ঠস্বরের ভূমিকা কীর্তনে প্রাধান্য হারিয়েছে।

পদ গাইবার পাশাপাশি মূল গায়েন দর্শকদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার মূলগায়েনই করেন। তাছাড়া ভক্তিভাব জাগ্রত করে কীর্তনকে আরও বেশি প্রচারমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে কীর্তনীয়া সর্বদা তৎপর থাকেন। পালা উপস্থাপনকালে একটা বড় অংশ জুড়ে এই প্রচার চলে। আয়োজক কর্তৃক সম্প্রচারের দায়িত্বও মূলগায়েনই পালন করেন। বিশিষ্ট পালা গায়কের গান শুনতে শ্রোতা-দর্শক বেশি আসেন। এক সময় পালা থামিয়ে মূল গায়েন মন্দির বা আয়োজকদের উদ্দেশ্যে দান করতে উৎসাহ দেন। ভক্তেরা কীর্তন চলাকালীন যে যার সাধ্য মতো অর্থ দান করেন।

ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক

কীর্তন কেবল দেখা বা শোনার বিষয় নয়, তা উপলব্ধির সামগ্রী। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এই উপলব্ধি সাহায্য করে। তাই যাঁরা কীর্তন দেখতে ও শুনতে যান তাঁদের দর্শক বা শ্রোতা নয়, ভক্ত বলা হয়। মূলগায়েন ও ভক্ত উভয়কেই ভক্তিভাবে ডুব দিতে হয়। কীর্তনে উপস্থাপক ও ভক্ত পরিবেশনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লীলাকীর্তনে ভক্তের ভূমিকা অসামান্য। মূল গায়েন ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথনের

মাধ্যমে পালা পরিবেশন করেন। অনেক সময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পালা এগিয়ে চলে। যেমন নবদ্বীপের কীর্তনীয়া গৌরী রায় পালা উপস্থাপনকালে প্রশ্ন করেন- "কারা কারা বৃন্দাবন যাবে?" ভক্তেরা হাত তুলে অথবা কথার মাধ্যমে সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি আবার কখনো জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা মা কোন্ মিলনটা বলতো মধুর মিলন?" এরপর কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন—"এই দেখ, কথা না বললে কী করে বুঝব যে আমার কথা তোমরা বুঝতে পারছ?" ভক্তদের মধ্য থেকে একজন ভক্ত (পুরুষ) বলেন "যুগল মিলন" অন্য এক ভক্ত (নারী) উত্তর দেন "রাগের পর অনুরাগে যে মিলন"। তখন গৌরী রায় বলেন "হ্যাঁ রাগের পর যে মিলন হয়, কলহ হওয়ার পরে যে মিলন হয় সেই মিলনটা মধুর মিলন। বুঝেছ মা?" কেবলমাত্র পালায় কৃষ্ণ-রাধা-বড়াই প্রভৃতি চরিত্রের কথোপকথনই নয় মূল গায়েন ও ভক্তের কথোপকথন লীলাকীর্তন উপস্থাপনের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে ওঠে। রাস্তায় চলতে চলতে পথচারীরাও কখনো কখনো থেমে যান ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মিশে যান। অনেক সময় নামকরা কীর্তন দলের উপস্থাপন দেখতে কীর্তনশিল্পীরাও সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে বসে পড়েন। এক্ষেত্রে নামকরা দলের উপস্থাপনভঙ্গি আয়ত্ব করার কথা তাঁরা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন একজন কীর্তনীয়াকে ভালো দর্শক-শ্রোতা হতে হয়। দর্শক ও উপস্থাপকের ভূমিকায় এমন অভূতপূর্ব রূপান্তর একে অপরের পরিপূরক হবার বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন ঘটায়। বর্তমানে এক ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় যেখানে নাটক উপস্থাপনকালে কীর্তনীয়া (অভিনেতা) কথকঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের সঙ্গে কথপকথনে অংশগ্রহণ করেন। নাটকের উপস্থাপনে ও নাট্যরসের আস্বাদনে কোনো মানসিক বাধা এতে তৈরি হয় না।

কীর্তন উপস্থাপনের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক কতটা নিবিড় সেই তথ্য একজন রেডিওশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উঠে আসে। রেডিওশিল্পী কৃষ্ণা বিশ্বাস জানান যে তিনি বেতার ও দূরদর্শনে কয়েকবার পদ গেয়েছেন। সেখানে তাঁকে লিখে নিয়ে যেতে হয়েছিল পালার কয়েকটি পদ। যদিও এই উপস্থাপনকে পালা বলা যায় কি না সন্দেহ রয়েছে। বেতারে উপস্থাপিত হলে পদ উপস্থাপনের সংরূপগত পরিবর্তন সাধিত হয়। কীর্তনীয়া আসরে পালা উপস্থাপনের সময় প্রস্তুতি নেন ঠিকই কিন্তু পালা লিখে আনেন না। কৃষ্ণা বিশ্বাস জানান যে, তিনি পদ গাইবার সময় বার বার ভুলে যাচ্ছিলেন। ভক্তেরা সামনে থাকলে এই অসুবিধে হয় না। মনে করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় আসরে। তাছাড়া ভক্তেরা না থাকলে পদ গাইবার

ক্ষেত্রে কোনো উন্মাদনা পাওয়া যায় না বলেও তিনি জানান। তাঁর ভীষণ একা লাগে। কীর্তন একা গাইবার বিষয় নয়। তাই ভক্তের অভাব কীর্তন উপস্থাপনায় বাধাস্বরূপ। সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি বা কম ভক্ত হলে তাঁদের কোনোটাতেই বিশেষ অসুবিধা হয় না। তবে ভক্তহীন আসর তাঁদের কখনোই কাম্য নয়। তাঁরা ভক্তের মধ্যে ভক্তিভাব থাকাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

পালা উপস্থাপনের সময় ভক্ত-দর্শক-শ্রোতার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে পারফরম্যান্স তত্ত্বের অনুষঙ্গ আসবে। দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কিত জেফ্রি সি. অ্যালেকজান্ডারের মতটি উল্লেখ্য—

> They decode what actors have encoded (Hall 1980), but they do so in variable ways. If cultural texts are to be communicated convincingly, there needs to be a process of cultural extension that expands from script and actor to audience. Cultural extension must be accompanied by a process of psychological identification, such that the members of the audience project themselves into the character they see onstage.[৬]

লীলাকীর্তনে মূলগায়েন কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ও লীলারসের যে স্বরূপ আয়ত্ব করেন তা ভক্তেরা আস্বাদন করেন উপস্থাপনের অভিনব (নৃত্য-গীত-বাদ্য যুক্ত অভিনয়) ভঙ্গিমায়। কেউ শুধুমাত্র নাট্যময় লীলারসের আস্বাদনে, কেউ ভক্তিভাবে, কেউ বা অবসর বিনোদনের মহৎ উপায় রূপে কীর্তনের আস্বাদন করেন। যদিও মঞ্জরি ভাবের সাধনা বৈষ্ণব মতে শ্রেয় তবু ভক্তমনে অভিনীত পালার নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ভক্তমন। একই লীলা একাধিকবার দেখার মধ্যে উৎসাহ দেখে অবাক হতে হয়। লীলার কাহিনি ভক্তের কাছে অজানা থাকে না, তবু ভোর রাত পর্যন্ত সেই লীলারস (রাসলীলা ও কুঞ্জভঙ্গ পালা) আস্বাদন করতে বহু দূর থেকে ভক্তেরা আসেন। নতুন গল্প হয়তো পাওয়া যায় না, কিন্তু আভিনয়ের তারতম্যে লীলারসের আস্বাদন অন্য মাত্রা পায়। পরিবেশনের বৈচিত্র্যে এক অভিনব লীলার আস্বাদন ঘটে।

কীর্তন চলাকালীন দর্শকেরা হাত তুলে উলুধ্বনি দেন। এই ক্রিয়াটির পারম্পর্য রয়েছে। মূল গায়েন লীলা চলাকালীন যখন “নিতাই-গৌর হরি হরি বোল”, “রাধে রাধে” বা হাত তুলে মাথার ওপরে ঘোরান তক্ষুনি ভক্তেরাও সেই অনুরূপ বাহু তুলে উলুধ্বনি দিয়ে সারা দেন। অনেক সময় মূলগায়েন জানান ‘ভক্তিমতি মায়েদের’ উলুধ্বনি যতক্ষণ চলবে তিনি ততক্ষণ নাচবেন। ভাবের আদানপ্রদানের সুফলে দীর্ঘক্ষণ ধরে নাচ ও উলুধ্বনি একই সঙ্গে চলতে থাকে। এদিক থেকে থিয়েটারের দর্শকদের সঙ্গে কীর্তনের ভক্তের পার্থক্য লক্ষণীয়। থিয়েটারে দর্শক উপস্থাপনকালে অংশগ্রহণ করেন না, কিন্তু

কীর্তনের ভক্ত উপস্থাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন। লীলাকীর্তনে কীর্তনীয়া ও ভক্তের সমন্বিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার রূপ প্রকাশ পায়।

'সূর্যপূজা' নামক পালায় রাধার সূর্যপূজার ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার বর্ণনা আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন গ্রামে এই পালা উপস্থাপনে মূলগায়েন (অভিনেতা) এবং ভক্ত এক হয়ে যাওয়ার সাক্ষী হতে হয়। এই পালা আয়োজনকালে ভক্তবৃন্দদের থেকে কয়েকজন নারীকে ডেকে নেওয়া হয় মঞ্চে। মঞ্চের কোণে একটি তুলসীগাছ থাকে। সেই তুলসীগাছের পূজা মূলগায়েন সুপ্রিয়া রায় এবং মঞ্চে উপস্থিত নারীভক্তেরা মিলে সম্পন্ন করেন। পূজা সমাপনকালে তাঁরা একই সঙ্গে নৃত্য করেন ও উলুধ্বনি দেন। তাঁরা নানা ধর্মীয় বিধি বিধানের সঙ্গে যুক্ত হন। যেমন– তিলক কাটা, ধুনো দেওয়া, সিঁদুর পরানো ইত্যাদি। অনেকে মানত করেন। স্নান করে সিক্তবসনেই মঞ্চ এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। ভক্ত সিক্তবসনে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে চলেন। কেউ আবার জলপূর্ণ কলসী মাথায় নিয়ে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন। সবটাই সূর্যপূজা পালার অংশ হয়ে ওঠে।

হরিবাসরে ভক্তদের বসার জন্য খোলা মাঠে বা প্রাঙ্গণে খড় বা ত্রিপল বিছিয়ে দেওয়া হয়। একটানা তিন-চার ঘন্টা ধরে পালা চলায় ভক্তেরা নিজেদের সুবিধার্থে আরাম করে বসেন। কিন্তু তাঁদের পা মন্দিরের দিকে বা মঞ্চের দিকে থাকলে কোনো কোনো কীর্তনীয়া ক্ষুব্ধ হন। এটিও কীর্তন উপস্থাপনের বিধি রূপে নির্দেশ করা হয়। একধরনের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে পালা এগিয়ে যায় এবং বারে বারেই কীর্তনীয়া ও ভক্তদের মধ্যে কথোপকথন ও সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পালা সমাপন করা হয়।

নৃত্য

পূর্বেই বলা হয়েছে কীর্তনে গীত-নৃত্য-বাদ্যের সম্মিলিত উপস্থাপন দেখা যায়। কীর্তনের উপস্থাপনে বুদ্ধ নাটকের নৃত্যগীতময় উপস্থাপনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জয়দেব ও পদ্মাবতী যথাক্রমে গান ও দেবদাসীনৃত্যের ভঙ্গিমায় পদাবলী উপস্থাপন করতেন। এক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরতনাট্যম নৃত্য সম্পর্কিত মত হল—

দেবদাসীরা যেমন মন্দিরে ভগবানের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করেছেন আবার সাধারণ লোকের সামনেও এঁরা নৃত্য করেছেন। পরবর্তীকালে মন্দির, রাজসভা নয় ভরতনাট্যম এসে পৌঁছল আধুনিক মঞ্চে। সেখানে দর্শকাসনে বসে আছেন নানা ধরনের ব্যক্তিত্ব।[৭]

কালানুক্রমে দর্শকের পরিবর্তনের সঙ্গে নৃত্য উপস্থাপনেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একই সঙ্গে উপস্থাপনের মঞ্চ পরিবর্তিত হয়েছে। মন্দির থেকে রাজসভা এবং সাধারণের সামনে নাট্য উপস্থাপিত হয়েছে। জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর মিলিত উপস্থাপনেও এই সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পদাবলী কীর্তনের ধর্মীয় আবহে নৃত্য মন্দির থেকে রাজসভায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কীর্তনের সঙ্গে দেবদাসীনৃত্যের যোগ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বহুকাল পর্যন্ত এই নৃত্যভঙ্গিমায় *গীতগোবিন্দ* –এর উপস্থাপন হত। পদাবলীর পাশাপাশি পাঁচালি উপস্থাপনের রীতিও ভীষণভাবে নৃত্যনির্ভর একটি উপস্থাপনমাধ্যম রূপে প্রচলিত ছিল। মেসোমশাই চন্দ্রশেখরের গৃহে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে তেইশ বছরের যুবক চৈতন্যদেব নৃত্যাভিনয় উপস্থাপন করেছিলেন। *রুক্মিণীহরণ* উপস্থাপনে তিনি রুক্মিণী এবং আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মীর ভূমিকায় ‘লাস্য-নৃত্য’ এবং ভরতাচার্য-কথিত ‘রূপানুরূপ’ (নারীর ভূমিকায় পুরুষের অভিনয়) নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। কাজীদলনে নগরকীর্তনকালে তাঁকে রৌদ্ররসে ‘তাণ্ডব নৃত্য’ করতে দেখা যায়। পুরীতে রথাগ্রে চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের নৃত্য ‘মণ্ডলী-নৃত্য-কীর্তন’-এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চক্রাকারে আবৃত হয়ে সংগঠিত এই নৃত্য ‘চক্রভামরী’ নামেও পরিচিত। চৈতন্যদেব বেড়াকীর্তন এবং লাঠিনৃত্য বা লগুড়নৃত্যে দক্ষ ছিলেন এবং কীর্তনকালে নৃত্যের সময় এই দেহভঙ্গিমা বেশ কার্যকরি হয়েছিল।

চৈতন্যদেব কীর্তনকে যেমন ঘর থেকে বাহিরমুখী করে তুলেছিলেন তেমনি নৃত্যকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অসামান্য। কালক্রমে কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের উপস্থাপনকে নৃত্য জনপ্রিয় করে তুলেছে। মন্দির, বৈষ্ণব আখড়া ও কীর্তনের আসর এখনও নৃত্যের এক গৌরবময় ইতিহাস বহন করে চলেছে। অধ্যাপক মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের মতটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

কীর্তন, বিশেষত: পদাবলী কীর্তনের মহাজন পদগুলি কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চণ্ড ও মধুর নৃত্য সহযোগে দুইভাবেই পরিবেশিত হয়। কীর্তন সংগীতে থাকে নবরস, নায়ক-নায়িকা ভেদ, পালা ইত্যাদির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ও কথোপকথন সহযোগে পরিবেশিত লাবন্যমণ্ডিত নৃত্য।[৮]

কীর্তনে শাস্ত্রীয় গানের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি শাস্ত্রীয় নৃত্যাঙ্গের ভূমিকাও কম নয়। *নাট্যশাস্ত্র* –এর চতুর্দশ অধ্যায়ে ধ্রুপদী নৃত্যচর্চার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়— অঙ্গা বঙ্গা (উৎ) কলিঙ্গা বৎসাসচৈবৌড্রমাগধাঃ।[৯] অর্থাৎ বাংলায় ঔড্র-মাগধী নৃত্যধারা প্রচলিত ছিল। পূর্বেই জানা গেছে, ভারতী ও কৈশিকী ছিল এই নৃত্যের বৃত্তি। ভারতী বৃত্তিতে কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চণ্ড বা তাণ্ডব নৃত্য এবং কৈশিকী বৃত্তিতে লাবণ্যমণ্ডিত বা লাস্যময় নৃত্য করার চল ছিল। ভরতমুনি নির্দেশিত নিয়মে কীর্তনেও কথোপকথনমূলক উচ্চণ্ড ও মধুর নৃত্যের সমাবেশ দেখা যায়।

কীর্তনকালে নৃত্য উপস্থাপনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন অনেক সময় নির্দিষ্ট নিয়মিত পদ্ধতিতে করা হয়। কীর্তনে বিবিধ প্রকার শাস্ত্রবর্ণিত হস্তকের ব্যবহার কথা বলেছেন মহুয়া মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে—

> কীর্তন-নৃত্যেও বিবিধপ্রকার শাস্ত্রবর্ণিত হস্তকের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত উচ্ছ্রিত হস্তে বা ঊর্ধবাহু পতাক বা অলপদ্ম এবং ঊর্ধমণ্ডলী হস্ত। এরও ভাস্কর্যে নিদর্শন পাই। কীর্তন-নৃত্যে পূর্বে আলোচিত শাস্ত্রসম্মত বিবিধ প্রকার চারী, ভ্রমরী, গতি, গ্রীবা, মস্তক দেখা যায়।[১০]

কীর্তন উপস্থাপনকালে নৃত্যাভিনয়ে সমস্ত হস্তের প্রদর্শনের সঙ্গে মুখ, ভ্রূ ও চোখের সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রদানের মাধ্যমে ভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য ও নাট্যে হস্তের ব্যবহার মনের ভাব প্রকাশের ভাষারূপে বিরাজ করেছে। একজন গুণী কীর্তনশিল্পীর নৃত্যনাট্যময় পরিবেশনায় হস্তগুলি শুধু সংকেত প্রদর্শনই করে না, নৃত্যে তারা কথা বলে।

বাংলার টেরাকোটা শিল্পে নৃত্যের নিদর্শন আজও রয়ে গেছে। তুর্কি আক্রমণের (ত্রয়োদশ শতক) পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় স্থাপত্যের ধ্বংসলীলা চলে। বাংলার স্থাপত্যশিল্পে এর গুরুতর প্রভাব পড়ে। তবে ষোড়শ শতক থেকে স্থাপত্যশিল্প পুনরায় নবপল্লবিত হতে শুরু করে। সপ্তদশ শতক ও তার পরবর্তী সময়ে নির্মিত মন্দিরে নৃত্যভাস্কর্য এবং মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা-নৃত্যভাস্কর্যগুলি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়বাহী। সপ্তদশ শতকের হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দির, বীরভূমের কেদুলির মন্দির, বর্ধমানের মন্দিরগুলিতে নর্তক-নর্তকী মূর্তির হস্তমুদ্রা, স্থানক ও নৃত্যের বিভঙ্গ এখনকার কীর্তনশিল্পীদের নৃত্যভঙ্গিমার সঙ্গে মেলানো যায়।

অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বর্ধমানের কালনার প্রতাপেশ্বর মন্দির, হুগলীর আঁটপুরের মন্দির, মুর্শিদাবাদের ভবানীশ্বর মন্দিরে একইভাবে নৃত্যশিল্পের পরিচয় বহন করে চলেছে। মহিষাসুরমর্দিনী, পুতনাবধ, কালীয়দমন, বস্ত্রহরণ ইত্যাদির নৃত্যময় উপস্থাপনে শিল্পী তাঁর নিপুণ হস্তে রূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির নাম বিশেষভাবে করতে হয়। বাংলার টেরাকোটা শিল্পে নৃত্যময় কীর্তনসংস্কৃতি বিশিষ্ট স্থান আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের মন্দিরে 'খোপ্যক করবীযুক্ত' অলঙ্কারমণ্ডিত রূপ, সুরসুন্দরী মৃদঙ্গসহোযোগে কখনো বীণা সহযোগে নৃত্যশীলা টেরাকোটা পাওয়া যায়। জোড়বাংলা মন্দিরে প্রাপ্ত টেরাকোটায় 'কাঞ্চীপোশাক' পরিহিতা যুগলনৃত্যবাদ্যময় রূপের পরিচয় মেলে। বামদিকের নর্তক গলায় মাল্য পরিহিত হয়ে 'উচ্ছ্রিত' বাহুসহ কুঞ্চিতপদে নৃত্যরত এবং ডানদিকে নর্তকী মৃদঙ্গসহ একটি সরার ওপর নৃত্যরতা। এরূপ বহু নৃত্য-বাদ্যমূলক উপস্থাপনভঙ্গি টেরাকোটায় পাওয়া যায়। যেমন— রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম নৃত্য, রাসমণ্ডল, রাসলীলা, দশাবতার, পুতনাবধ, নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ, কেশীবধ, কংসবধ, ননীচুরি, গোবর্ধনধারণ, চামর হাতে দেবদাসীনৃত্য, সরার উপর নৃত্য, মন্দিরা নৃত্য ইত্যাদি অজস্র মূর্তি বিষ্ণুপুর মন্দিরগাত্রে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের 'বালুচরি সিল্ক' নামক প্রসিদ্ধ শাড়িতে এই টেরাকোটার নৃত্যময় উপস্থাপনের চিত্রগুলিকে ছাপা হয়।

বর্তমানে বাংলার সমৃদ্ধ নৃত্যময় ঐতিহ্য কেবলমাত্র ধারক ও বাহকের অভাবে অবলুপ্তির পথে। কীর্তনের উপস্থাপনে নৃত্যের প্রচলন আছে ঠিকই কিন্তু বৈচিত্র্যের অবকাশ অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। অনেক পেশাদার কীর্তনীয়ার নৃত্য উপস্থাপন গানের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। লীলারসের মাধুর্যবিধানে এই নৃত্য রসবিপর্যয় ঘটায়। কীর্তনের মতো সম্মানীয় সংরূপের ক্ষেত্রে অনেকটা কুরুচিকর ও বেমানান মনে হয়। তবে উৎকৃষ্ট কীর্তনশিল্পীর উপস্থাপিত নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গিমায় রসাস্বাদনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে একজন সুগায়ক হলেই উৎকৃষ্ট কীর্তনীয়া হওয়া যায় না, তাঁকে নৃত্যশিল্পেও যথেষ্ট পারঙ্গম হতে হয়।

নাটকে দেহভাষা (body language) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুখের ভাষা বিবর্তনের আগে থেকেই মানুষ দেহভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহভাষার

অলংকরণ হতে থাকে। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের পরিস্ফুটনে মূলগায়েনকে তার দেহভাষাও বদলাতে দেখা যায়। পরিবর্তিত ভাবভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ভক্ত মণ্ডলীর মনে পালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রসসঞ্চার ঘটায়। হরিবাসরে মূলগায়েনের ভাব অনুযায়ী ভক্তদের হাসতে, কাঁদতে, বিমোহিত হতে দেখা যায়। নৃত্যের মাধ্যমে দেহভাষা শিল্পকলার চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য মঞ্চায়িত হতে দেখলে অনেকসময় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কীর্তনের আঙ্গিকগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শ্রুতিমাধুর্যের সঙ্গে দর্শননির্ভর শিল্প রূপে 'নৃত্য' কীর্তনের উপস্থাপনে নাটকোচিত ভাবধারা প্রদানে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

আসর পরিকল্পনা

কীর্তনের মঞ্চ বলতে আসর, হরিবাসর ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হয়। 'আসর' শব্দটি দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। মধ্যযুগের আসর বসত বৈষ্ণব মহন্তদের বাড়িতে। কখনো তা বসত বৈঠকি কায়দায়। রাজসভায় সভাসদদের সামনে পদাবলী কীর্তনের প্রচলন ছিল। তাছাড়া মন্দিরপ্রাঙ্গণ কীর্তনের আসর রূপে ব্যবহৃত হত। সেযুগে মাটিতে বসে কীর্তন গান করার চল ছিল। মাটিতে গোবর দিয়ে লেপা হত বলেই মনে হয়। তবে উঁচু বাধানো মঞ্চও ছিল। মঞ্চ বা আসর সাধারণত ভরত নির্দিষ্ট চতুরস্রের মতো বর্গাকার হয়। আয়তাকার মঞ্চের প্রচলন যে ছিল তার প্রমাণ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি আজও বহন করে চলেছে। বিষ্ণুপুরের পোড়া মাটির হস্তশিল্পের মতই বিখ্যাত মন্দিরগাত্রের টেরাকোটার কাজ। মন্দিরের পাশেই একটি আয়তাকার 'নাটমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আন্দাজ করা যায় সেখানে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে কীর্তনের আয়োজন হত। বিষ্ণুর অবতার রূপে কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের পূজা যেহেতু প্রচলিত ছিল তাই নাটমঞ্চে কীর্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিষ্ণুপুরের কয়েকটি মন্দিরে এখনও পূজা প্রচলিত হলেও বেশিরভাগ মন্দির ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু এক সময় মন্দিরগুলিতে জাঁকজমকপূর্ণ পূজা প্রচলিত ছিল। পূজার সঙ্গে কীর্তনের বহুল প্রচলন ছিল বলেই অনুমান করা যায়। সেই ইতিহাস খোদিত রয়েছে বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যে। মন্দিরগুলিতে নাটমঞ্চের সামনেই তুলসীমণ্ডপ অবস্থিত। কীর্তন আসরেও ঠিক একইভাবে তুলসী গাছ রাখা হয়। কীর্তনের আসরে প্রতীকী তুলসীগাছ রাখা কীর্তনের কৃত্যানুষ্ঠানের অঙ্গ।

সাম্প্রতিক কালে আসরের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কীর্তন একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় আসর নির্মাণ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। আসরের তিনদিক বা চারদিকেই ভক্তদের বসার স্থান করা হয়। মঞ্চ উঁচু (প্রায় এক থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত) বা সমতল দুইই হতে পারে। তবে সকল ভক্ত-দর্শক যাতে দেখার সুযোগ পায় সেজন্য আজকাল আসর উঁচু করে বাঁধার চল হয়েছে। এই আসরের প্রচলনে মঞ্চের (stage) ধারণা প্রতিফলিত। এখনকার বিভিন্ন শিল্পীদের গানের 'শো'তে এই ধরনের উঁচু স্টেজ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ভীষণভাবে দর্শননির্ভর নাট্যমাধ্যম হয়ে উঠেছে কীর্তন। আসরে কম লোক থাকলে সেই অসুবিধা হয় না বলে সেখানে মাটিতে গোবর কিংবা কাঁদা-মাটি দিয়ে লেপন করে তার ওপর ত্রিপল বা মাদুর পেতে দেওয়া হয়। আসর গড়া হয় দেববিগ্রহের কাছেই।

কীর্তন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হন। আসরের মাঝে থাকেন মূল গায়েন, তাঁর দু'পাশে দু'জন খোলবাদক, এবং পেছনের দিকে বাকিরা বসেন। খোল বাদকেরা এবং মূল গায়েন পালা চলাকালীন নিজ স্থান পরিবর্তন করেন বলে সব থেকে বেশি জায়গা তাঁদের জন্য বরাদ্দ করতে হয়। মঞ্চের একদিকে শিল্পীদের ওঠা নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়, মঞ্চ বাঁধা হয় কাঠ ও বাঁশ দিয়ে। আসরের চারদিকে ফুল, আমপাতা, দিয়ে সাজানো হয়। অনেক সময় তিনদিক খোলা হরিবাসরে মঞ্চের পেছনে আয়োজক সংস্থার নাম লেখা হয়।

আসরের পাশে বা অনতিদূরেই কীর্তন সম্প্রদায়কে থাকতে দেওয়া হয়। সেই ঘরটাই তাঁরা গ্রীনরুম হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেক সময় তাঁদের আসরের কাছে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কীর্তনীয়ার সমস্যা হয়। কীর্তনীয়াদের পালা সমাপনের কিছুক্ষণ আগে আয়োজক কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশমতো তাঁরা পালা সমাপ্ত করেন। অন্য সম্প্রদায়ের আসতে দেরি হলে সমস্যা হয়। দূরবর্তী স্থানে গ্রীনরুম থাকার জন্য এবং যোগাযোগের মেলবন্ধন না থাকায় কীর্তনীয়ারা অসুবিধায় পড়েন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বাণীবেড়িয়া গ্রামে পুরাতন বাজারের কাছে মন্দিরপ্রাঙ্গনে 'মহানাম সংঘ'-এর পরিচালনায় কীর্তনের আয়োজন করা হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিকেল ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত 'উত্তরগোষ্ঠ' পালা পরিবেশন করার জন্য নদিয়ার সিদ্ধার্থ শেখর দাসকে বায়না করা হয়।

কীর্তনানুষ্ঠান চলাকালীন সিদ্ধার্থশেখর দাস আসর থেকে গ্রীনরুমের দূরত্বজনিত সমস্যায় পড়েন। কীর্তনের আসর ফাঁকা রাখার নিয়ম নেই। অর্থাৎ এক সম্প্রদায় পালা শেষ করতে না করতেই পরবর্তী সম্প্রদায় খোল করতাল বাজাতে বাজাতে আসরে প্রবেশ করেন এবং নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করেন। আসর থেকে প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে স্কুল ঘরে দূরাগত শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী শিল্পী কৃষ্ণা বিশ্বাসের দলের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা থাকায় তাঁদের গ্রীনরুম থেকে বেরোতে দেরি হয়। এদিকে কীর্তনীয়া সিদ্ধার্থশেখরকে বলে দেওয়া হয় পরবর্তী শিল্পী আসছেন। সেইমতো তিনি পালা শেষের ঘোষণা করেন। কৃষ্ণা বিশ্বাসের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি আসরেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ আসরে কথা বা গান না গেয়ে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে এক ধরনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব তৈরি হয় মূল গায়েনের মধ্যে। শহর কলকাতায় একই সমস্যার সম্মুখীন হন কীর্তনীয়ারা। সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্কে ২৪/১২/২০১৯ তারিখে নামকীর্তনের দল নিয়মানুবর্তীতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যা সাতটায় তাঁদের নামকীর্তন শেষ হবার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী লীলাকীর্তনের দল উপস্থিত না হওয়ার দরুণ সাড়ে সাতটা বেজে গেলেও তাঁদের নামগান করে যেতে হচ্ছিল। অনেক সময় দেখা যায় মঞ্চ ও গ্রীনরুমের দুরত্ব বেশি হওয়ায় পালা শেষ করে দিয়ে মূল গায়েনকে প্যারডি জাতীয় গান গাইতে হয়। ধামুয়ার বাজারে আরেক কীর্তনানুষ্ঠানে কীর্তনীয়া সুপ্রিয়া রায়কে প্যারডির গান গাইতে শোনা যায়। তিনি "কৃষ্ণ যিসকা নাম হ্যায়/গোকুল উসকা ধাম হ্যায়" গাইবার পর পেছনে তাকাতেই দেখেন পরবর্তী সম্প্রদায় উপস্থিত হয়েছেন। তার পরেই পালা শেষ। কারণ প্যারডি স্বেচ্ছায় সমাপ্ত করা যায়। পদ গাইবার ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই। পদের আংশিক উপস্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত রয়েছে বৈষ্ণব সমাজে। গ্রীনরুম থেকে আসরের দূরত্ব তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আলো

মধ্যযুগে আসর আলোকিত করতে মশাল ব্যবহৃত হত। তখন বিদ্যুতের আবিষ্কার হয়নি। মশালের আলোকে পালা উপস্থাপনে একধরনের মায়াবী পরিবেশ তৈরি হত। তবে আলোর গুরুত্ব কীর্তনে সেভাবে ছিল না। কীর্তনীয়াকে দেখতে পাওয়াই যথেষ্ট ছিল। সাম্প্রতিককালে যে সব আসর বসে তাতে

হয়তো বৈদ্যুতিন আলোর চমক আছে তবে বৈচিত্র্য নেই। থিয়েটারে আলোকসম্পাতের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার নেই। সেই তুলনায় কীর্তনে আলোর ভূমিকা খুবই কম।

কীর্তন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভিসুয়াল ইফেক্ট সংযোজনের তাগিদ সেভাবে দেখা যায় না। তাছাড়া বৈচিত্র্যময় আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন তা আয়োজকের কাছে অনেক সময় থাকে না। গ্রামে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে একসময় হ্যাজাক জ্বালিয়ে পালা উপস্থাপন করা হত। এখন জেনারেটারের দৌলতে কৃত্রিম আলোর ব্যাবস্থাপনা করতে দেখা যায়। এখনকার সিনেমা-থিয়েটারের তুলোনায় কীর্তনের আসরে অতি সামান্য আলোকের ব্যবহার হয়। হেলোজেন (বড় আসরে) ও বাল্ব (ছোট আসরে) জ্বালিয়ে পালা উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে দর্শকদের অনেক বেশি কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়। অভিনয়ের গুণে এই অভাব পূরণ করা হয়। তবে রাতে কীর্তনের উপস্থাপনা আলো ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। হরিবাসরে কীর্তন সম্প্রদায় এবং ভক্তেরা প্রত্যেকেই আলোতে অবস্থান করেন। রাতে কীর্তন সম্প্রদায়ের ওপর আলো তুলনামূলকভাবে বেশি উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু তাঁরাই। তাই দিনের বেলা সূর্যালোকে আলোর সমতা বজায় থাকলেও রাতে অস্পষ্ট হয়ে যায় ভক্তবৃন্দের মুখমণ্ডল। তীব্র আলো চোখের উপর পড়ায় দর্শকদের দেখতে মূলগায়েনের অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক সময় মূল গায়েনকে চোখের ওপর হাত দিয়ে আলো প্রতিরোধ করে ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথন করতে দেখা যায়। কারণ আগেই জানা গেছে বর্তমান কীর্তনে ভক্তদের সঙ্গে কথোপকথন লীলাকীর্তনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

অতিরিক্ত উজ্জ্বল আলো মঞ্চ উত্তপ্ত করে তোলে। পালা যত এগিয়ে যায় মূল গায়েন ততই ঘামতে থাকেন। তাঁদের চন্দনচর্চিত মুখের বিকৃতি ঘটে, পোশাক গায়ে জড়িয়ে যায় এবং পালা উপস্থাপনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দিবালোকের চেয়ে রাতের তীব্র আলোতে এই সমস্যাটি বেশি হয় বলে জানিয়েছেন কীর্তনীয়ারা। কীর্তনীয়া তুলিকা সেন বঙ্গাল জানিয়েছেন, প্রখর আলোকে (সূর্য, কৃত্রিম আলো) জল তেষ্টা পেলেও তিনি জল পান করেন না কারণ তাতে গলা বসে যায়। কীর্তনে উঁচু স্কেলের ব্যবহার বেশি। ঠাণ্ডা জল খেলে গলা বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাঙা গলায় উঁচু স্কেলে গাওয়া যায় না। উজ্জ্বল আলো এক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। তবে উজ্জ্বল আলো না হলে দূর থেকে কীর্তনীয়াদের দেখা যায়

না। অনেকসময় কীর্তনীয়ার উচ্চারণভঙ্গিমা বোঝার ক্ষেত্রে আঙ্গিক অভিনয়ের চাক্ষুষ উপলব্ধি প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে কীর্তনের উপস্থাপনায় আলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাদ্য ও শব্দ-যন্ত্রাংশ

মধ্যযুগের কীর্তনে শ্রীখোল থাকলেই যথেষ্ট মনে করা হত। এর সঙ্গে থাকত মন্দিরা। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু বাদ্যযন্ত্র কীর্তনে যুক্ত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দেশনায় পুরীর রথযাত্রায় কীর্তন উপস্থাপন করার সময় সাতটি দল বাংলা থেকে গিয়েছিল। এই দলগুলিতে মূলগায়েন ও দোহার যেমন ছিলেন তেমনি একাধিক খোলবাদকও উপস্থিত ছিলেন। একেকটি সম্প্রদায়ে চার থেকে সাতজন বাদ্যকর নিযুক্ত হয়েছিলেন। খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তম দাস যে কীর্তনানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাতেও বহুজন খোলবাদকের পরিচিয় পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি আলাদাভাবে অনেকগুলি শ্রীখোল প্রস্তুত করিয়ে রেখেছিলেন বলে জানা যায়।

কীর্তনে শ্রীখোল, করতাল, ঝম্প, বাঁশি ব্যবহার করা হত, অনেক পরে বেহালা, হারমোনিয়াম ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। যদিও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম বেধে দেওয়া হয়নি। তবে কীর্তনে শ্রীখোল এবং করতাল ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে অনেক বৈষ্ণবই অবহেলার চোখে দেখেন। কীর্তনে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার বিষয়ক কীর্তনশিল্পী ও গবেষক ব্রজরাখাল দাসের মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> বর্ত্তমানে এই বিষয়ের কলিকাতার শিল্পবৃন্দ অনেকেই তানপুরা, হারমোনিয়াম, বেহালা ইত্যাদি সুরযন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন তাহার দেখাদেখি গৌড়মণ্ডল বা রাঢ়দেশের শিল্পবৃন্দ অনেকেই বিশেষ করিয়া হারমনিয়াম যন্ত্র সহযোগে পদাবলী কীর্ত্তন পরিবেশন করিতেছেন ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।[১১]

শহরের বাদ্যযন্ত্র গ্রামের উপস্থাপনকে প্রভাবিত করেছে। কেবলমাত্র খোল ও করতালে আটকে নেই কীর্তনের উপস্থাপন। বর্তমানে সিন্থেসাইজার বহু-বিকল্পযুক্ত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে বৈচিত্র্য অনেকটাই কমে গাছে। ঐতিহ্যময় বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্য যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বায়নার টাকা একটা বড় কারণ রূপে কাজ করেছে। বায়নার টাকা সকলের মধ্যে বণ্টিত হয়। সেক্ষেত্রে লোকসংখ্যা কমানো গেলে সুবিধা হয়। যেখানে বারো থেকে ষোলো জনের সম্প্রদায় গঠন করা হত সেখানে বর্তমানে কীর্তন সম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা অনেক কমে গেছে। কলকাতার কীর্তন গায়িকা

মিতালী দাসের সম্প্রদায়ে পাঁচজন সদস্য। তাঁদের স্বল্পসংখ্যা দেখে ধামুয়া গামের দর্শকদের অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আবহসঙ্গীত নির্মাণে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা অসামান্য। ঝড়-বৃষ্টির আবহ, করুণ সুরের বেহালা বা বাঁশি, হারমনিয়াম প্রভৃতির পরিবর্তে সিন্থেসাইজার দিয়েই কাজ চালানো হয়। একইসঙ্গে সম্প্রদায়ও সীমিত সংখ্যক মানুষের সহযোগে গড়া যায়।

শ্রীখোল হয় মৃত্তিকা নির্মিত। মৃদঙ্গকে শ্রীখোল বলার রেওয়াজ সম্ভবত চৈতন্য সমসাময়িক সময় থেকে শুরু হয়। মণিপুর অঞ্চলে কাঠের তৈরি শ্রীখোল বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়। শ্রীখলের পরিভাষাগত কিছু শব্দ কীর্তন সমাজে প্রচলিত রয়েছে। যেমন— লওয়া, প্রস্তুতি, পরণ, লহর, ছক্কা, মাতন, হাত, সাঁতু, তেহাই, প্যাচ, মাথেট, শ্রুতি, পাকছটা বা চক্রদার, একপদ, দ্বিপদী, ত্রিপদী, প্রবন্ধ, মূর্ছান, বামান ইত্যাদি। এসব বোলের গঠনভঙ্গি পৃথক হয়। একজন সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ এই পার্থক্য ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খোলবাদনে একজন কীর্তনশিল্পীকে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারি হতে হয়। মৃদঙ্গের তালে তালে করতাল ও অন্যান্য সুরযন্ত্রর সমন্বিত বাদনে লীলাকীর্তনের আসর জমে ওঠে।

বর্তমানে কীর্তন উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোনের ব্যবহার করা হয়। উন্নত শব্দযন্ত্রাংশ বা উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেমের (sound system) দৌলতে কীর্তনীয়ার কণ্ঠস্বর সকল শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়। তবে শব্দের সাম্যতা বজায় রাখতে গেলে একজন অভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রার প্রয়োজন। অনেকসময় অনভিজ্ঞ নিয়ন্ত্রকের সঞ্চালনে ত্রুটি থাকায় বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কীর্তনীয়ার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সমতা বজায় রেখে মূল গায়েনের কণ্ঠস্বরের সমতাবিধান করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। উপস্থাপনের ভালো-মন্দ অনেকাংশে নির্ভর করে সাউন্ড সিস্টেমের দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার উপর।

কীর্তনীয়াদের একাংশ মনে করেন ভালো শব্দযন্ত্রাংশ মূলগায়েনের গলার আওয়াজকে আরও শ্রুতিমধুর করে তোলে। তাই কীর্তন সম্প্রদায় আয়োজকদের ভালো সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে বলেন। এতে শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের কৌশল ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। মাইক ছাড়া চার-পাঁচশত দর্শকের কান পর্যন্ত কীর্তনীয়ার কণ্ঠস্বর কখনোই পৌঁছাবে না। অনেক সময় যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিধ্বনি ব্যবহার

করে স্বরবৈচিত্র্য তৈরি করতে দেখা যায়। আয়োজকের উন্নত শব্দযন্ত্রাংশ না থাকার কারণে বিশেষ বিশেষ কীর্তন সম্প্রদায় নিজেদের সাউন্ড সিস্টেম সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু সব জায়গায় তা নিয়ে যাওয়ার সুবিধা থাকে না। এতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা যায় বলে তাঁদের অভিমত।

কীর্তনে মাইক, উচ্চ ধ্বনি-তরঙ্গ বিশিষ্ট নানাবিধ যন্ত্রাংশের ব্যবহারে ভক্তদের মিলিত বিশৃঙ্খলা ছাপিয়ে যাওয়া যায়। কীর্তন সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর। ভক্তেরা বাড়িতে বসেই লীলারস আস্বাদন করতে পারেন এবং হরিবাসরের দিকে তাঁদের মন ছুটে যায়। কীর্তনের আসরে পূজাবিধি, অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিশেষ নির্দেশ প্রভৃতি কীর্তন চলাকালীন মূলগায়েনের মাইকেই ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে বর্তমান কীর্তনপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক সাউন্ড সিস্টেম।

সাজসজ্জা

চর্যাপদ -এর কালে রূপসজ্জার ('নড়এড়া' বা নটপেটিকা বা মেক-আপ বক্স প্রসঙ্গ) বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের চরিত্রাভিনয়কালে চরিত্রানুগ রূপসজ্জার বিবরণ থেকে লীলাকীর্তনে রূপসজ্জার ধরন অনুমিত হয়। সেই ধারার প্রচলন আজও কীর্তনের আসরে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব ধর্মমতে প্রাত্যহিক জীবনেও বিশেষ প্রসাধনের বিধি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্রজরাখাল দাসের মতটি উল্লেখ্য—

> সংকীর্তন বা পদাবলী গান করিলে কিংবা শ্রীখোল বাজাইলে গলায় কাষ্ঠমালা ও নাসায় তিলক ধারণ করিতে হইবে, এরূপ নির্দেশ কোথাও আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। তবে যাহারা সনাতন ধর্মীয় বিষ্ণু নামে দীক্ষিত হইবেন, তাহাদের ক্ষেত্রে বা তাহারা গলায় তুলসী কাষ্ঠের মালা সব সময়ের জন্য ও শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে মন্ত্রপূত তিলক ধারণের বিধি দিয়াছেন দিনান্তে একবার সাধনভজনের সময়। ইহা বৈষ্ণব সাধনভজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত।[১২]

কীর্তনে অত্যধিক প্রসাধনের ব্যবহার করতে হয় না। মূলগায়েন কপালে তিলক কাটেন ও সিঁদুরের টিপ লাগান। তবে অনেক মূলগায়েনকে (নারী কীর্তনীয়া) লিপস্টিক, মেকাপ পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাধারণত সকলের গলায় তুলসী কাঠের মালা দেখা যায়। পালা সমাপন হলে অনেকেই তা খুলে রাখেন। পেশা রূপে কীর্তনের প্রচলন হওয়ায় এমন করা হয় বলে মনে করা যায়।

কীর্তন উপস্থাপনায় প্রত্যেকেই আলাদা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করেন। পুরুষ ও নারী কীর্তনীয়ার বেশভূষা আলাদা হয়। নারী কীর্তনীয়া সাধারণত শাড়ি পরিধান করে কীর্তন উপস্থাপন করেন। শাড়ির ওপরে হলুদ বা গেরুয়া রঙের উত্তরীয় থাকে। কখনো রাধা সাজতে গিয়ে লাল চেলির সাহায্য নেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেক কীর্তনীয়াকে ফুলের (রজনিগন্ধা, গাঁদা ইত্যাদি) মালা দিয়ে বরণ করা হয়। পুরুষ কীর্তনীয়া হলুদ বা গেরুয়া রঙের ধুতি পরিধান করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরীরের বামদিক বরাবর উত্তরীয় রাখতে দেখা যায়। গলায় থাকে ফুলের মালা। শরীরের বাকি অংশ উন্মুক্ত থাকে। কেউ কেউ মাথায় ধুতি বেঁধে নেন। এছাড়া পায়ে নূপুর থাকে নৃত্য করার সময়। সম্প্রদায়ের অন্যান্য কীর্তনীয়ারা হলুদ, গেরুয়া বা সাধারণ পাঞ্জাবী এবং হলুদ, গেরুয়া বা সাদা রঙের ধুতি পরিধান করেন। এই পোশাক পরে থাকা অবস্থায় তাঁরা কোনো অসুদ্ধ (মল-মূত্র ত্যাগ) কাজ করেন না।

প্যারডি গান

সংগীতের ক্ষেত্রে প্যারডি কথাটি বহুমুখী অর্থে প্রচলিত। কোনো প্রচলিত বা পুরনো জনপ্রিয় সংগীত পুনরায় অন্য গানে ব্যবহার করা হলে তা প্যারডি গান রূপে আখ্যায়িত হয়। আবার জনপ্রিয় গানের সুর, কথা প্রভৃতি উপাদান অন্য গানে ব্যবহার করা হলেও তাকে প্যারডি গান বলে। লীলাকীর্তনে বিভিন্ন পদ গান করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় গান ব্যবহার করে থাকেন মূল গায়েন। এই ধরনের বিজাতীয় গানগুলিকে প্যারডি গান হিসেবে পরিগণিত করা যায়। বর্তমানে লীলাকীর্তনের আসরে এই ধরনের গানের চাহিদা তৈরি হয় নাচের ক্ষেত্রে। অনেকসময় গানের একঘেয়েমি দূর করতে তা করা হয়। প্যারডি গানের ব্যবহার কীর্তনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বলাই বাহুল্য প্রথাগত কীর্তনীয়া সমাজ প্যারডি গানের ব্যবহার ভালো চোখে দেখেন না।

কীর্তন উপস্থাপনকালে মূলগায়েন গানেরর ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন বাউল গান ও হিন্দি ভজন ভক্তিসঙ্গীত ব্যবহার করেন। অনেক সময় তা ভক্তদের মনোরঞ্জনের তাগিদে করা হয়। কীর্তনে বৈচিত্র্য আনে এই ধরনের গান। কিন্তু এতে গানের শুদ্ধতা বিনষ্ট হয় বলে অনেকেই মনে করেন। ধামুয়ায় শ্রীঅশোককুমার দাস কীর্তনকালে দেহতত্ত্বের বাউল গান ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়’ উপস্থাপন করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কীর্তনীয়া তাপসী দাসীকে ভজন গাইতে শোনা যায়, ‘এইসি

লাগি লাগন্, মীরা হো গই মগন'। হিন্দি ভজন গান করেন সুপ্রিয়া রায়, 'রাধে রাধে জপা করো, কৃষ্ণ নাম রোজ পিয়া করো', 'কৃষ্ণ যিসকা নাম হ্যাঁ, গোকুল উসকা ধাম হ্যাঁ', 'শ্রীরাধে রাধে রাধে, বরসানে বালি রাধে'। মিতালি দাস রাধা কৃষ্ণের পালা উপস্থাপন কালে রাম-ভজন করেন –'প্রভুকা নাম জপো মন্ মেরে, দূর করে ও সঙ্কট তেরে'। এই ধরনের প্যারডি গান একটি পালাকীর্তনে তিন থেকে সাতটি গাওয়া হাতে পারে।

স্থান-কালের গুরুত্ব

কীর্তনের পরিবেশনরীতি স্থান-কালের সূচকের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। সময়ের বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে সঠিকভাবে নাট্যরসের উপস্থাপনে পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। পালা উপস্থাপনের পূর্বে এই পরিকল্পনা কীর্তনীয়া করেন। পালা উপস্থাপনের সময়কাল বাড়াতে বা কমাতে হয় আয়োজকের চাহিদামতো। সচরাচর তিন ঘন্টার পালা উপস্থাপন করার জন্য কীর্তনীয়ারা প্রস্তুত থাকেন। সেই পালা বিভিন্ন কারণে (রেডিয়ো ও টেলিভিশনে সম্প্রচারে, শিক্ষাকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান, পূর্ববর্তী দলের বেশি সময় ধরে পালা উপস্থাপন ইত্যাদি) কম সময়ে উপস্থাপনের নির্দেশ থাকে তবে অনেক পদ, সংলাপ, প্যারডি গান বাদ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বন্দনা, গৌরচন্দ্রিকা, রাগ ও তালের বিন্যাসে সময় লাঘব করতে হয়। আবার সেই একই পালা উপস্থাপনের সময় বিভিন্ন কারণবশত (পরবর্তী কীর্তনেরদল সঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে, আসর থেকে গ্রীনরুমের দূরত্বজনিত কারণে, আয়োজক কর্তৃক অধিক সময়ের জন্য বায়না করা ইত্যাদি) পালা উপস্থাপনের সময়কাল বাড়িয়ে দেওয়া হলে একইভাবে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নির্দিষ্ট কিছু পালার (গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ, সূর্যপূজা, রাস, কুঞ্জভঙ্গ ইত্যাদি) জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সময়ের নিয়মনীতি সম্পর্কিত একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে— 'রাতে গোষ্ট দিনে রাস তার হয় সর্ব্বনাশ'। এক্ষেত্রে কীর্তনশিল্পী ব্রজরাখাল দাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে দেওয়া হল—

> এই রূপ একটি রাত্রিবেলার অনুষ্ঠানে পেশাদার কীর্তনীয়াঁ শচীনন্দন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, শ্রোতাগণ তাহাকে পদাবলী কীর্ত্তন শুনাইবার অনুরোধ করিলে, তিনি উক্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া নিশাকালীন 'খোয়াড় ভাঙ্গা গোষ্ঠ' পালাটি অপূর্বভাবে পরিবেশন করিলেন। শ্রোতাগণ খুবই আনন্দ পাইলেন ও নিশাকালে এমন সুন্দর একটি গোষ্ট' পর্য্যায় আছে জানিতে পারিলেন।[১৩]

তবে আয়োজকের ধরন অনুসারে ও চাহিদামতো সময়কালের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। ধর্মীয় বিধিবিধানের উল্লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-কীর্তনীয়ার বিশ্বাস এবং স্থানকালের গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচনা প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, একজন কীর্তনীয়া এবং ভক্ত-দর্শকদের অনেক বেশি কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়। নাটকের উপস্থাপনায় কল্পনার ভূমিকা অসামান্য। সাংকেতিক ইঙ্গিত (ধ্বজা, বিশেষ বাদ্য, আনুষঙ্গিক উপকরণ) বুঝতে বা আঙ্গিক অভিনয়ে (মূল গায়েন কৃষ্ণকে দেখার ভাবে আনন্দাশ্রু নির্গত হওয়া) কল্পনাশ্রয়ী হয়ে উঠতে হয়। কীর্তনের উপস্থাপনেও ব্যাপকভাবে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায় কীর্তনীয়াকে। একই সঙ্গে কীর্তনীয়া আসর (বন্দনা কীর্তনে), নবদ্বীপ (গৌরচন্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পালা), এবং শ্রীকৃষ্ণের বিচরণক্ষেত্র (বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা) একই স্থানে উপস্থিত থেকে স্থান-কালের দূরত্ব ঘুচিয়ে পালা উপস্থাপন করেন। স্থানকালের এরূপ জটিলতর উপস্থাপন বুঝতে কল্পবিলাসী ভক্তদের অসুবিধা হয় না। আধুনিক নাটকেও ব্যাপকভাবে প্রতীক, ইঙ্গিত, অভিনয় ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়।

কীর্তন কোন জায়গায় পরিবেশিত হবে তার উপরেও উপস্থাপনা নির্ভরশীল। স্থানের পরিবর্তনে কীর্তনেও বদল লক্ষ করা যায়। প্রত্যন্ত গ্রাম, শহর ও শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থাপিত একই পালার উপস্থাপন এক রকম হয় না। একই সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতি উপস্থাপনে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে। ভাষাগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকতা, বিধিনিষেধ পরিবর্তিত হয়। বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার মণিপুর অঞ্চলে এক স্বতন্ত্র নৃত্যবৈচিত্র্যপূর্ণ 'নটসংকীর্তন' –এর মাত্রা পায়। মণিপুরী বৈষ্ণব নাট্যভঙ্গিতে নৃত্য সংগীতের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। আবহ (শহর, গ্রাম) এবং দর্শক (শিক্ষিত, অশিক্ষিত) স্থান-কালের পরিবর্তনে বদলে যায়। এতে পালা উপস্থাপনও পরিবর্তিত হয়। আসরের আয়তন এবং দর্শকদের বসার জায়গা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হয়। কীর্তনীয়া ও দর্শকের পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানে এই সূচক দু'টি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানের বৈচিত্র্যে এবং দর্শকদের ভক্তিভাব ও বিশ্বাসের পরিবর্তনে পালা উপস্থাপন সর্বত্র এক থাকে না। একারণে নাটকের মতই কীর্তনের উপস্থাপনে স্থান-কালের গুরুত্ব অপরিসীম।

একই দল কর্তৃক উপস্থাপিত নির্দিষ্ট একটি পালার স্থান-কালগত পরিবর্তনে দু'টি ভিন্ন স্বরূপযুক্ত পালার আস্বাদ পাওয়া যায়। দু'টি উপস্থাপনকে এক করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। এই দু'টিকে ভিন্ন পালা রূপে স্বীকার করাই শ্রেয়। স্থান-কালের গুরুত্ব নিরূপণে একই দলের স্থানভেদে বিশেষ পালা (রাসলীলা) উপস্থাপনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা বিধেয়। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত রাসলীলা এবং নিউ আলিপুরে আয়োজিত রাসলীলা একই শিল্পী (তুলিকা সেন বঙ্গাল) দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু দুটি উপস্থাপন এক থাকেনি। স্থান-কালের পার্থক্যে দুটি পালা অনেকটাই আলাদা হয়ে যায়। এই দুটি পালাকে পৃথক উপস্থাপন রূপে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

একই কীর্তনশিল্পীর একই পালা স্থান-কালের তারতম্যে দু'টি আলাদা উপস্থাপন হিসেবে পরিগণিত হয়। একটি সাহিত্যচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে 'প্রোজেক্ট পালাগান' কর্তৃক আয়োজিত হয়। অন্যটি নিউ আলিপুর বাজারে ভক্তিভাবুকতার আবেদনে আয়োজিত হয়। একই শিল্পীর দু'টি ভিন্ন স্থানে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপন ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। স্থানকালের ভিন্নতা, পালা পরিবেশনের অন্যান্য সূচকগুলিকে প্রভাবিত করে।

যাদবপুরের আসরে তুলিকা সেন বঙ্গাল সকলের সামনে প্রথমে সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ে থাকা সদস্যদের পরিচয় দেন। এরপর তিনি পালা আরম্ভ করেন। নিউ আলিপুর বাজারে তিনি প্রতি বছর ডাক পান। তাই সেখানে কোনো পরিচয়পর্ব ছিল না। সেখানে উপস্থিত সকলকে 'বাবা-মা' বলে সম্বোধন করা হয় যা পূর্বোক্ত আসরে ছিল না। সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়নি যাদবপুরের দর্শকদের সঙ্গে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দর্শকদের ঠিক ভক্ত বলা যায় না। যে বিশ্বাস ও কৃষ্ণভক্তি ভক্ত-শ্রোতা-দর্শকের থাকা বাঞ্ছনীয় তা ছিল না যাদবপুরের আসরে। এই আসরের মুখোমুখী বসেছিলেন দর্শক ও উপস্থাপক। কিন্তু নিউ আলিপুরে কীর্তনীয়ার তিন দিকে দর্শক বসেছিলেন। পদাবলী, শ্লোক ইত্যাদি ব্যাখ্যায় এর প্রভাব পড়েছিল। মূলগায়েনকে তিনদিক ঘুরে গান ও ব্যাখ্যা করতে হয়।

নিউ আলিপুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-চৈতন্য মন্দিরের পাশে লীলাকীর্তনের আসর বসেছিল। মন্দির থেকে পূজারি পুষ্প, অর্ঘ্য ইত্যাদি সজ্জিত করে সকল কীর্তনীয়াদের চন্দনের ফোঁটা দেন। এরপর তুলসী গাছে এবং কোর্তনীয়াদের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। মূলগায়েন তুলিকা সেন বঙ্গালকে মাথায় ফুলের মুকুট ও বাহুতে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রাধা সাজতে লাল চেলি পরিধান

করছেন। কীর্তনীয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভক্তেরা সময়ানুসারে দু'হাত তুলে উলুধ্বনি দিচ্ছিলেন। পালা চলাকালীন হরিরলুট দেওয়া হচ্ছিল। ভক্তেরা সেই বাতাসা প্রণাম করে তুলে নিচ্ছিলেন। যাদবপুরের আসরে এরূপ কৃত্য পালন করা হয়নি। কৃত্যানুষ্ঠানের তাগিদ থেকে সেখানে কীর্তন আয়োজিত হয়নি। মূলগায়েনও বাড়তি রূপসজ্জায় সজ্জিত হননি।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে উপস্থাপিত নাটকে একটি স্ক্রিপ্ট (script) থাকে। স্ক্রিপ্ট মুখস্ত করে অভিনেতা সংলাপ বলেন। সাধারণত স্ক্রিপ্টের বদল করা হয় না। তবে নাট্যকার চাইলে স্ক্রিপ্টের বদল করতে পারেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুবার তাঁর নাটকের বদল করেছেন। স্ক্রিপ্টের বদলে নাটকে পরিবর্তন আসে। এতে দু'টি ভিন্ন নাটকের আস্বাদ পাওয়া যায়। লীলাকীর্তনে কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে না। দীর্ঘ দিন ধরে পালা উপস্থাপন দেখতে দেখতে কীর্তনীয়ার তা মুখস্ত হয়ে যায়। এই দেখা হতে পারে গুরুর কীর্তন প্রণালী অথবা জনপ্রিয় কীর্তনীয়ার পালা উপস্থাপন। কখনো দেখা যায় মূলগায়েন পূর্বে কোনো কীর্তন দলের দোহার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজে মূলগায়েনের ভূমিকায় থেকে নতুন দল গঠন করেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর নিজস্ব সংযোজন ও বিয়োজন চলতে থাকে। এইভাবে তিনি তাঁর পালাকে অন্যের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তোলেন। একরকম মৌখিক পরম্পরা অনুসারী উপস্থাপন কীর্তনে দেখা যায়। কোনো স্ক্রিপ্ট না থাকায় এবং মূলগায়েন নির্ভর একক অভিনয় হওয়ায় পালা উপস্থাপনের সমস্ত দিক তাঁর উপরেই নির্ভর করে। তিনিই ঠিক করেন কোথায় ব্যাখ্যা করবেন আর কথায় করবেন না। কোথায় নৃত্য আবশ্যক, কোথায় অপ্রয়োজনীয় তা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র মূলগায়েনেরই রয়েছে। সংলাপ বলবেন, না সেই অংশ সংগীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন তা তাঁর ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। একজন মূলগায়েন কখন কোথায় কী ধরনের অভিনয় করবেন তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পরিবেশ ও দর্শক-ভক্তের উপর। স্থান-কালের তফাৎ এই কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যাদবপুরে লীলাকীর্তন করতে এসে তুলিকা সেন বঙ্গাল জানান যে তাঁকে আসরে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে নাচতে বলা হয়। যেখানে যেমন নাচার কথা বলা হয় তিনি সেখানে তেমন নাচেন। কিন্তু যাদবপুরের আসরে তেমন তাগিদ না থাকায় তাঁকে নাচার থেকেও বেশি পদাবলী এবং কৃষ্ণলীলা উপস্থাপনের উপর নজর দিতে হয়েছে। পদ গাইবার সময়তেও তিনি বিভিন্ন তাল ও রাগের ব্যবহার করেছে। এই ধরনের রাগ-তাল নির্ভর সংগীত তিনি আসর বুঝে গান। নিউ আলিপুরের আসরে

প্রায় সবসময় তাঁকে নৃত্য করতে দেখা যায়। তিনি বৈচিত্র্যময় তালের গান সেখানে খুবই কম গেয়েছেন। গানের পরিবর্তে চরিত্রের কথোপকথন এবং পরিস্থিতির ব্যাখ্যা তাঁকে বেশি করতে দেখা যায়।

গোষ্ঠ থেকে ফিরে গোপাল মায়ের কাছে আসেন এবং মায়ের আদর ও শেবা লাভ করেন। গোপালকে ঘুম পারানোর দৃশ্যে যশোদা গোপালকে গান শোনাচ্ছেন। নিউ আলিপুরে কীর্তনীয়া তাঁর উত্তরীয় ও গলার ফুলমালা হাতে নিয়ে সন্তান স্নেহের অভিনয় করেন। সন্তানের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন ঘুম পারানো হচ্ছে এমন ভান করেন। এখানে তিনি প্রচলি বাংলা গানের সুরে ঘুম পাড়ানি গান করেন। এরূপ ঘুম পারানোর অভিনয় যাদবপুরে দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গটি বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র এক প্রসঙ্গে কৃষ্ণ সকল গোপীদের বাড়ি গিরে যেতে বললে গোপীরা তাঁদের মনের ভাব কৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করেন। একজন গোপী নিজ স্বামীকে চিত্রপট এবং কৃষ্ণকে রক্তমাংসের স্বামী রূপে তুলনা করেন। যাদবপুরের আসরে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি। নিউ আলিপুরে রাধার মদন ভুজঙ্গের দ্বারা দংশিত হওয়ার ঘটনাটি যেভাবে মূলগায়েন উপস্থাপন করেছেন তাতে সাময়িক কালের যাত্রাগানের অতিনাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। তিনি সর্পাঘাতে বিষের যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। খোলবাদকদের খোল ধরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছেন এবং নৃত্যও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গটি যাদবপুরের আসরে কেবলমাত্র ব্যক্ত করা হয়েছে। সর্পাহত ব্যক্তির মতো অভিনয় করতে দেখা যায়নি। এখানকার দর্শক নিউ আলিপুরের মতো নয়। অতিনাটকীয়তার পরিবর্তে তারা পদাবলী গান শুনতে পছন্দ করেন। এরূপ মনস্থির করেই হয়তো মূলগায়েন প্রথাগত ধরন বদলেছেন। এরূপ আরও অনেক প্রসঙ্গই দু'টি পালায় রয়েছে যা দুই ভিন্ন স্থানের উপস্থাপনে ভিন্নতর হয়ে উঠেছে।

বন্দনা ও গৌরচন্দ্রিকা গাইবার পর মূলগায়েন রাসলীলায় প্রবেশ করেন। তবে দু'জায়গায় এর স্বরূপ কিছুটা ভিন্ন হয়। নিউ-আলিপুরে মূলগায়েন তুলিকা সেন বঙ্গাল পিতামাতা, উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, গুরুদেব (দীক্ষা গুরু ও কীর্তনের গুরু) ও মদনমোহনের চরণে প্রনাম জানান। এরপর 'চলরে আমার মন/সেই মধুর বৃন্দাবন/যমুনারও ধারে আছে তমালেরও বন।' আখেরি গান গেয়ে লীলায় প্রবেশ করেন। এরূপ পরিচয় দেওয়ার পরিবেশ যাদবপুরের আসরে ছিল না। তিনি সেখানে লীলায় প্রবেশ করার আগে সকলকে রাধানামে উজ্জীবিত করতে হিন্দি ও বাংলাভাষা মিশ্রিত 'রাধে রাধে বোল' নামক প্যারডি গান করেন। এতে দু'টি পালা ভিন্নতর রসাস্বাদন ঘটায়।

নিউ-আলিপুরে কীর্তন শুরু হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পরে আসরে একজন মদ্যপ ব্যক্তি প্রবেশ করে এবং পালা উপস্থাপনে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কখনো সে খোলবাদকদের মালা পরিয়ে দিতে চায় তো কখনো হরির লুটের বাতাসা ছিটিয়ে কীর্তনীয়াদের উত্যক্ত করে। এতে কীর্তনীয়ারা পালা থামিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে যান এবং সেই ব্যক্তিকে আসর থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পালা গাওয়ার সময় কীর্তনীয়াদের অসুবিধা হয়। এরূপ ভক্ত কখনোই কীর্তনে কাম্য নয়। এতে পালা উপস্থাপন বিঘ্নিত হয়। আসরের ভিন্নতায় এমন ধরনের ঘটনা ঘটে। এতে পালার স্বরূপ বদলে যায়। কীর্তনীয়ারা সবসময় এমন আসর কামনা করেন যেখানে ভক্তদের জন্য তাঁদের কোনো রকম অসুবিধায় পড়তে না হয়। যাদবপুরের আবহে তাঁরা পালা উপস্থাপনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাঁদের কাছে এমন আসরই কাম্য বলে জানান।

লীলাকীর্তনে প্যারডি গান ব্যবহারের চল সাম্প্রতিককালের ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাদার কীর্তনীয়ারা এই গান তাঁদের কীর্তনে ব্যবহার করলেও প্রথাগত কীর্তনীয়ারা এর ব্যবহার এড়িয়ে চলেন। তুলিকা সেন বঙ্গাল একজন পেশাদার কীর্তনীয়া। তিনি রাসলীলায় চার থেকে পাঁচটি প্যারডি গান ব্যবহার করেন। দুই ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত পালায় পদাবলী, আখেরি গান ও পদাবলীর ব্যাখ্যা কম বেশি একধরনের হলেও প্যারডি গানে কোনো মিল পাওয়া যায় না। নিউ আলিপুরের আসরে তিনি যে প্যারডি গান করেন তার কয়েকটি হল— ‘তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না’, ‘ছোটি ছোটি গইয়া ছোটি ছোটি গোয়াল/ছোটে সে মেরো মদন গোপাল’, সুন্দর রাধিকার সনে মিলিল কানাইয়া গো সুন্দর সুন্দর কথা কইয়ো’ ইত্যাদি। এই গানগুলির একটিও তিনি যাদবপুরের আসরে পরিবেশন করেন না। সেখানে তিনি গেয়েছেন— ‘রাধে রাধে বোল’, ‘সহাগ চাঁদ বদনী ধনি নাচো তো দেখি’, ‘রাধে রাধে বরসানে বালি রাধে’ ইত্যাদি। যাদবপুরের আসরে তিনি কীর্তন করতে আসেন দোল উৎসবের একদিন আগে। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর জুড়ে রং খেলা চলছিল। কীর্তনীয়া সময় উপযোগী একটি দোলের গান গেয়েছেন। গানটি হল— ‘আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমারই সনে/ একলা পেয়েছি তোমায় নিভুবনে’। এই গানটি গেয়ে পালা শেষ হয় যাদবপুরে। অন্যদিকে নিউ আলিপুরে ‘সুন্দর রাধিকার সনে’ গান গেয়ে

পালা সমাপ্ত হয়। পালা শেষ করে কীর্তনীয়ারা পাশের মন্দিরে যান এবং দেবতার আশির্বাদ গ্রহণ করেন।

উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ

মধ্যযুগে প্রচলিত বাংলা নাট্যসংরূপে উক্তিপ্রত্যুক্তি ব্যবহৃত হত। তবে এর ধরণ ছিল কিছুটা আলাদা। নাটগীত নাট্যসংরূপে উক্তিপ্রত্যুক্তি সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হত। আকাশভাষিত অভিনয় পদ্ধতি তখন একটি প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। একজন অধিকারী রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, সখীদের উক্তি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করতেন। বৈষ্ণব পদাবলীতেও একজন পদকর্তা অন্যের অনুভূতি নিজের মুখে বর্ণনা করেন। সেই পদ যখন আসরে পরিবেশিত হত তখন মূলগায়েনের চাতুর্যে সংলাপ বুঝতে ভক্তদের অসুবিধা হত না। তবে একজন কীর্তনীয়া গদ্যসংলাপের ব্যবহার করতেন কি না তা স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

এখনকার নাটক হয় সর্বাংশ সংলাপময়। গদ্যে সংলাপ ব্যবহার করার চলন রয়েছে। তবে গদ্যের সংলাপ অনেক সময় স্বগতোক্তিমূলক হতে পারে। কিন্তু নাটকে সংলাপ সম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত হবার কথা চিন্তা করেই লেখা হয়। সাম্প্রতিককালে প্রচলিত পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনে গদ্য সংলাপের ব্যবহার দেখা যায়। পদাবলী কীর্তনের উপস্থাপনে বহুবিধ চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। প্রতিটি চরিত্রের হয়ে সংলাপ বলেন মূল কীর্তনীয়া। রাধা, কৃষ্ণ, সখী, বড়াই, আইহন, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ মূল গায়েন বেশিরভাগ সময় একাই উপস্থাপন করেন। অনেক সময় খোলবাদক ও দোহার সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। কীর্তনে 'কথা' (কীর্তনের পঞ্চাঙ্গের একটি) অংশ অনেক সময় সংলাপাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। 'কথা' –র প্রচলন সম্পর্কিত কীর্তনশিল্পী ও গবেষক ব্রজরাখাল দাস মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> সত্তর পঁচাত্তর বর্ষ পূর্বেও এই লীলাকীর্তন গীত ধারায় পদ বহির্ভুত কথার সংযোজন ছিল না। অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক ও পদাবলীকীর্তন গায়ক ছিলেন তিনিই সর্বপ্রথম এই লীলাকীর্তনে ভাগবতীয় কথার অনুপ্রবেশ ঘটান বা প্রচলন করেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী কীর্ত্তনাচার্য্য গৌঁরগুণানন্দ ঠাকুর, পাঁচথুপী নিবাসী রাঁমগোপাল আচার্য্য ও স্বর্ণহাটি নিবাসী শঁচীনন্দন ঘোষ ইঁহারা কেহই এই লীলাকীর্ত্তন মধ্যে পদ বহির্ভূত কোন কথা ব্যবহার করিতেন না। এবং বৈষ্ণব মহাজনকৃত পদাবলী ভিন্ন কথার সংযোজনকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন।[14]

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কীর্তনের অঙ্গ 'কথা' অংশ খুব প্রাচীন নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কীর্তনের উপস্থাপনে কথা সংযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে থিয়েটারের নাট্যসংলাপের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া জনপ্রিয় যাত্রার প্রভাবও কিছু কম নয়।

কীর্তনে সংলাপ অংশ বলে নেবার পর সেই অংশটি অনেকসময় পুনরায় গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সংলাপের গুরুত্ব ও গভীরতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় গানের মাধ্যমে। সংলাপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পালার কাহিনি এগিয়ে যায়। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া গেলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাবে।

দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বাণিবেড়িয়ায় কীর্তনীয়া অশোক দাস গোষ্ঠ পালা উপস্থাপনকালে রাধা এবং ললিতা-বিশাখার সংলাপের কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। কৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠিতা রাধা ললিতাকে বলছেন—

> রাধা- জানিস ললিতা, আমার কী মনে হয় জানিস? বিধি বোধ হয় সৃজন জানে না।
> ললিতা- কেন?
> রাধা- জানিস ললিতা জগতের যত দুঃখ যত যন্ত্রনা, যত কষ্ট সবই বোধহয় নারী জাতিকে দিয়েছে ভগবান। তাই নারী জনম কেবল কাঁদবার জনম। (গীতাকারে এই সংলাপ পুনরায় উপস্থাপন করা হয়)
> ললিতা- সেটা কেমন রাধে? সেটা ভালো করে বলো।
> রাধা- ললিতা নারীকুলে জনম নিয়েছিলাম ভেবেছিলাম বড় দুঃখের জনম। তাই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু জানিস সেদিন সুখ পেলাম।
> ললিতা- কোন দিন?
> রাধা- নারী জীবনের সকল দুঃখকে ভুলে গেলাম। কোন দিন জানিস? যেদিন যমুনার জল আনতে গিয়ে আমার প্রাণগোবিন্দের বাঁশি শুনেছিলাম।...

এখানে কীর্তনীয়া আশোক দাস একাই সংলাপের অংশ বলে যান। পালায় অনেকসময় দোহার এবং বাদ্যকরেরা এতে অংশ নেন। তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য।

নৌকাবিলাসের পালা দ্বৈত-উপস্থাপন পদ্ধতিতে নাটকীয় ভঙ্গিমা আরও স্পষ্ট করে তোলে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ধামুয়ায় কীর্তনশিল্পী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী সুচিত্রা চক্রবর্তীর মধ্যে সংলাপাত্মক অভিনয় পদ্ধতি লীলাকীর্তনে অভিনব নাট্য উপস্থাপনার সংযুক্তিকরণ ঘটায়। কীর্তনের আঙ্গিকে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগে। সচরাচর যুগ্ম অভিনয় এবং দু'জন মূলগায়েন লীলাকীর্তনে দেখা যায় না। রাধা নদী পার করতে চাইলে কৃষ্ণ ভান করেন—

রাধা- তুমি আমাদের এই ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরে গেছ যে আমরা বৃন্দাবনের গোয়ালিনী।
কৃষ্ণ- কেন কেন?
রাধা- তাই তো বোকা বানাবার চেষ্টা করছো।
কৃষ্ণ- কেন?
রাধা- তা তোমার তরীটা ঘূর্ণিপাকে পড়েছে?
কৃষ্ণ- হ্যাঁ।
রাধা- তা তোমার ঐ কাঠের তরীটা যদি ঘূর্ণিপাকে পড়ত তাহলে পাক খেত। সে তো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে তো পাক খায়নি। তবে কোন তরী, কোন ঘূর্ণিপাকের কথা বলছ?
কৃষ্ণ- আরে ও গোয়ালিনী!
রাধা- বল।
কৃষ্ণ- তোমার যা ড্যাবড়া ড্যাবড়া চোখ না।
রাধা- তাতে কী হয়েছে?
কৃষ্ণ- ঘূর্ণিপাকে আমার কাঠের তরী পড়েনি গো।
রাধা- তাহলে?
কৃষ্ণ- ঘূর্ণিপাকে পড়েছে আমার মনতরণী।
রাধা- মনতরণী আবার কোন ঘূর্ণিপাকে পড়েছে?
কৃষ্ণ- ঐ নয়নঘূর্ণিতে পড়েছে গো তরী।

এর পর গান গেয়ে উক্তিটি উপস্থাপন করে আবার সংলাপ। চরম নাট্য ভঙ্গিমায় নৌকাবিলাস পালা চলতে থাকে, কাহিনি এগিয়ে যায়। সংলাপের বিপুল ব্যবহার অনেক সময় কীর্তনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবে কীর্তনীয়ার কৌশলময় উপস্থাপনে সংলাপ গানের মাত্রা পায়। অনেক সময় কীর্তন উপস্থাপনকালে উচ্চতরঙ্গবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে অথবা নীম্নমানের শব্দযন্ত্রাংশের কারণে কীর্তনীয়ার পদ শুনতে ও বুঝতে অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে সংলাপ অনেক বেশি কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। সংলাপ বলার সময় খোল-করতাল বাজানো বন্ধ রাখা হয়। এই সময় সংলাপের মাধ্যমে পালার রসাস্বাদন করতে অনেক সুবিধা হয়। এই দিক দিয়েও কীর্তনে সংলাপ অংশ বেশ উপযোগী।

নাট্যদ্বন্দ্ব

প্রতিটি পালায় পদ উপস্থাপনকালে চরিত্রের কথোপকথন ও কাহিনি অগ্রসরের পাশাপাশি নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হতে থাকে। নিউ আলিপুর বাজারে 'প্রভাসযজ্ঞ' নামক লীলাকীর্তনে এই নাট্যদ্বন্দ্বের সুন্দর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা। যজ্ঞের আয়োজনকালে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে মা যশোদাকে ডাকা হবে কিনা সে নিয়ে কথা হচ্ছিল। কৃষ্ণ যশোদাকে নিমন্ত্রণ করলেও তিনি মথুরায় যেতে পারছেন না। যশোদা দ্বারকা নগরে এলে সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার সময় প্রহরীরা তাঁকে আটকে

দেয়। তখন যশোদা তাঁর মাতৃত্বের পরীক্ষা দেন। কৃষ্ণ তাঁদের চিনতে পারবে কিনা এই নিয়ে যশোদা ও নন্দের মনে নানান দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই পর্যায়ে তাঁদের কথোপকথনে অসাধারণ নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

রাধার মনে কৃষ্ণকে নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। রাধা দ্বিধাগ্রস্ত হন। যেমন- কৃষ্ণ তাঁকে ভালোবাসেন কিনা, অন্য কোনো সখী বা দূতীর সঙ্গে প্রেমবিলাসে মত্ততার সংবাদ সত্য না মিথ্যা, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় কানাই দেখা করতে আসবেন কিনা ইত্যাদি নিয়ে যাবতীয় টানাপড়েন নাট্যদ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে তোলে। কীর্তনীয়া ও ভক্ত উভয়েই ঘটনাক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও নাট্যদ্বন্দের উদ্বেগ (suspense) সমপরিমাণে বজায় রাখা হয়।

হাস্যরসের সঞ্চার

নাটক যখন ক্রমেই গম্ভীর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে একঘেয়ে হয়ে ওঠে তখন হাস্যরসের সঞ্চারের মাধ্যমে তার স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনা হয়। কিছু হাস্যকর চরিত্র নাটকে রাখা হয় যারা নাটকে comic relief দিতে সাহায্য করে। লীলাকীর্তনে তেমন ষঠ ও হাস্যকর চরিত্রের মধ্যে বড়াই, জটিলা ও কুটিলা শ্রেষ্ঠা। বড়াই তার কপটকুশলতার সীমাকে অতিক্রম করে কোথাও কোথাও স্নেহ-মমতা বিজরিত একটি মানবিক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং কাহিনির প্রয়োজনে বড়াই এসেছে ও তার উপস্থিতি নাট্যক্রিয়াকে তরান্বিত করেছে। তার রূপবর্ণনা যথেষ্ট হাস্যকর তা আমরা আগেই জেনেছি। জটিলা ও কুটিলা এই দুই মা ও মেয়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলনে বাধাস্বরূপ। ‘সূর্যপূজা’ নামক পালায় কুটিলা সন্দেহের বশে বৌদি রাধার সঙ্গে সূর্যের পূজা দিতে তাঁর সঙ্গে যায়। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে নটবর কৃষ্ণের ছলনায় তাদের (জটিলা ও কুটিলা) ভীত হওয়ার ঘটনা হাস্যরসের সঞ্চার করে। লীলাকীর্তনে হাস্যরস সঞ্চারে মূলগায়েন বাস্তব জীবন থেকে নানাবিধ ঘটনাকে কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপন করেন। বিশেষত পুরাণ কথিত গল্প, *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর হাস্যকর গল্পাংশ, প্রচলিত বৌমা-শাশুড়ি কলহ কীর্তনীয়ারা ব্যবহার করেন।

কাহিনির বিকাশ

ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-এ যে রসবিভাজন করেছেন সেই অনুযায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিত ব্যক্তিরা বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। রসের বিভাজনেও তাই দেখা যায়। বৈষ্ণব দর্শন রচনার পূর্বেও পদাবলী লিখেছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখেরা। তাঁদের পদগুলিকে বৈষ্ণবীয় রসবিভাজনে ফেলতে অসুবিধা হয় না। কারণ এই পদসমূহের মধ্যে একটি নিটোল কাহিনি বর্তমান। এই কাহিনি অংশকে নিয়ে রচিত পদসমূহকে রসবিভাজনের ছকে সহজেই ফেলা যায়। কাহিনি ছাড়া নাটক সম্ভবপর নয়। লীলাকীর্তনেও খণ্ড খণ্ড কাহিনির এক একটি পালা সাজিয়ে বৃহৎ আখ্যানকে পরিবেশন করতে দেখা যায়। কাহিনি বিকাশের এই ধারা চমৎকার নাট্যপারম্পর্য তৈরি করে। অষ্টকালীয় কীর্তনে যে বিভাজন দেখতে পাওয়া তা নাট্যপারম্পর্যকেই (dramatic sequence) প্রতিষ্ঠা করে।

৪:২ উপসংহার

পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন সংরূপগুলিকে উপস্থাপনের নিরিখে নাটকের আঙ্গিকে দেখা প্রয়োজন। সংরূপগুলিকে নাটক রূপে মেনে নেবার ক্ষেত্রে অনেকেরই আপত্তি আছে ও থাকবে। তবে কীর্তনের তাতে কিছু আসে যায় না। একরকম আপত্তি উপেক্ষা করেই কীর্তন কৃত্যানুষ্ঠানমূলক নাট্য উপস্থাপনের মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী ও পদাবলী কীর্তনকে আলাদা রূপে পাঠ করার মধ্যে সংকীর্ণতা দূর করে এর সামগ্রিক পাঠে ব্রতী হলে এই সহজ সত্য উপলব্ধ হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্যের ইতিহাস, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, লোকসাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি পঠন-পাঠনের যে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল কঠোর মানসিকতা রয়েছে তার উর্ধ্বে উঠে এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হবে পাঠক সমাজকে। তবে নিয়ম-নিষ্ঠার অচলায়তনের অভেদ্য দ্বার উন্মুক্ত হলে অবহেলিত সাহিত্যজগৎ নতুন চিন্তাচেতনার ফুলে-ফলে ভরে উঠবে।

মূলগায়েন একজন অভিনেতারূপে লীলাকীর্তনের উপস্থাপনে নিযুক্ত থাকেন। নাটকের অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে মূলগায়েন ও ভক্তের মধ্যে। নৃত্য ও বাদ্যের মেলবন্ধনে সংলাপের উপস্থাপন কীর্তনকে মেলানো যায় সাময়িক কালের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সঙ্গে। কীর্তনে গীত ও গীতিময় সংলাপের উপর নির্ভর করে নাট্য উপস্থাপন

সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্বের বিন্যাসে উপস্থাপনগত সূচকের তুলনামূলক বিচারে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন উৎকৃষ্ট নাটকের আঙ্গিক। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই নাট্য-আঙ্গিকে পরিবর্তন এসেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বদল ঘটবে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মূল বৈশিষ্ট্য গীত-নৃত্য-বাদ্য কখনোই হয়তো কীর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না।

---

[১] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭। পৃ. ১৪২

[২] Schechner, Richard. *PERFORMANCE STUDIES: An Introduction*. New York: Routledge. 2013. P. 52

[৩] Alexander, Jeffrey C. *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy*. vol-22. American Sociological Association. 2004. P. 527

[8] Schechner, Richard. *PERFORMANCE STUDIES: An Introduction*. New York: Routledge. 2013. P. 52

[৫] Alexander, Jeffrey C. *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy*. vol-22. American Sociological Association. 2004. P. 531

[৬] তদেব। P. 531

[৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি। *নৃত্য: অন্তরে বাহিরে*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬। পৃ. ৪৫

[৮] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭। পৃ. ৩৫

[৯] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ১৯৯৬। পৃ. ১১৮

[১০] মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭। পৃ. ২৫৮

[১১] রায়, অভিজিৎ (সম্পা.)। *নৃত্যরসমঞ্জরী নৃত্যবিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮। পৃ. ৫৬

[১২] তদেব। পৃ. ৫৮

[১৩] তদেব। পৃ. ৪২

[১৪] তদেব। পৃ. ৪১

অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিকাশে পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা

৫.০ ভূমিকা

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কায়েম হলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় তার প্রভাব পড়ে এবং আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আনুমানিক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক তিনটি বড় গ্রামের (কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর) সমন্বয়ে ‘ক্যালকাটা’ শহর পত্তন করেছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা পরিণত হয় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে। যা ছিল একসময় গ্রাম, তা ক্রমেই পরিণত হচ্ছিল শহরে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদের ছায়াতলে লালিত হয় ‘বাবুসংস্কৃতি’।

নতুন আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় মূল্যবোধের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকতে পারেনি এই নতুন সমাজ। ফলে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিল্প সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন সংরূপের জন্ম দেয়। যেমন— কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, টপ্পা, ঢপকীর্তন ইত্যাদি। আবার কখনো পুরাতন সংরূপ যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্যের সংযোজনে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন— যাত্রা, খ্রিস্টকীর্তন ইত্যাদি। এই সকল সংরূপ ছিল নাটগীত, পাঁচালি, লীলানাটক, পদাবলী কীর্তন, প্রণয় উপাখ্যান ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা দ্বারা প্রভাবিত।

দেশীয় নাট্য ঐতিহ্যের প্রভাবে থিয়েটারের আদলে তৈরি হওয়া নাটকের সংরূপেও বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়। গীতাভিনয় ও পৌরাণিক নাটকগুলিতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাট্য রচনায় বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর নাটক বাংলার মেঠো গন্ধে ভরপুর। গীত-নৃত্য-বাদ্যের অপূর্ব মেলবন্ধনে কল্পনাকে মুক্তি দেয় তাঁর নাটক। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পথে হেঁটে শম্ভু মিত্র মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছেন। বাদল

সরকারের থার্ড থিয়েটার প্রথাগত প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভাঙার ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে গৌতম হালদার ও শ্রমণ চ্যাটার্জীর মতো অনেকেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী নাট্য-উপস্থাপনকে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছেন। এই পর্বের আলোচনায় পদাবলী কীর্তন আধুনিক যুগে পদার্পণ করে কীভাবে বিভিন্ন নাট্যসংরূপকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তা বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

৫.১ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে নবরূপে উদ্ভূত ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক অবস্থান্তর ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে এমন এক প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, যেখানে সাহিত্য ও শিল্প-কলা চর্চার পরিসর কখনোই অনুকূল ছিল না। পাঁচালি, ব্রতকথা, বিবিধ বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, পদাবলী ইত্যাদি রচনা তখনও মধ্যযুগীয় ধারাকে অতিক্রম করতে পারছিল না। এই সময়কালে বড় মাপের কবি-প্রতিভার অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। পদাবলী, লীলানাট্য, পাঁচালি ইত্যাদির প্রধান আশয় ছিল ধর্মকথা। এর পাশাপাশি রোমান্টিক প্রণয়-আখায়িকার প্রচলন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে ফর্মের দিক দিয়ে নতুনত্ব দেখা যায়নি। যুগের প্রবণতা অনুসারে মানব-মানবীর আদিরসাত্মক গল্পের বেশ ভালো চাহিদা ছিল। এই প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হল—

> তখনও বৈষ্ণব আখড়ায় পদ রচনা চলছিল, কীর্তন চলছিল, পদের সংকলন-চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বৈষ্ণব সহজিয়ারাও নিজেদের রহস্যময় সাধনার বিষয়ে রহস্যময় ইঙ্গিতের সাহায্যেই অনেক গদ্য পুস্তিকা এবং পদ রচনা করেছিলেন। তবে দেখা যাচ্ছে, সমাজে মুসলমানি আদিরসের কাহিনী (অর্থাৎ 'কিস্‌সা' বা 'কেচ্ছা') বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বে উপনীত হয়ে বাংলার গ্রামাঞ্চল এবং গঙ্গাতীরবর্তী শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ঢঙের গান ক্রমেই সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছিল। জয়নারায়ণ ঘোষালের *করুণানিধানবিলাস* (১৮১৩-২৪ খ্রি.) নামক বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে বিচিত্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনার পাশাপাশি সেই সময়কার বাংলা গানের বিবরণ পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানি ও বাংলার গীতরীতির পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—

> হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার।
> বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার।।
> সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
> গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ মাথুর।।১৩।।

অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর।।১৪।।
পাঁচালি অনেক ভাতি রামায়ণ সুর।
কত কথা তরজাতে শারিতে প্রচুর।।১৫।।
ভবানী ভবের গান মালসীমায়ূর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর।।১৬।।
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।।১৭।।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর।।১৮।।
কালিয় দমন রাস চণ্ডীযাত্রাধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপুর।।১৯।।
সাপুড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগানে নূতন ঝুমুর।।২০।।[২]

এই বর্ণনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গড়াণহাটী, রানিহাটি প্রভৃতি ঘরানায় লীলাকীর্তন প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। এছাড়া কবিগান, পাঁচালি, তরজা, রামায়ণ গান, সারি, মালসী, বিজয়াসংগীত, আখড়াই, জারি, ঝুমুর, সাপুড়ে গান উপস্থাপনের পাশাপাশি *গোবিন্দমঙ্গল* ও *চৈতন্যচরিতামৃত* পাঠের প্রচলন ছিল। সেই সময় কালিয়দমন-রাস-চণ্ডী-চৈতন্য যাত্রা রচনা ও উপস্থাপনের প্রসঙ্গ এখানে পাওয়া যায়।

প্রাচীন পদাবলী কীর্তনের ধারা বিবিধ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আজও বেশ জনপ্রিয় এবং জোরালভাবে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। মধ্যযুগীয় লীলানাট্যের প্রভাবে কীর্তনে গীত-নৃত্য-বাদ্যময় উপস্থাপনের সঙ্গে চরিত্রাভিনয় যুক্ত হয়। তবে বলাই বাহুল্য যে এক মূলগায়েনের অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্র প্রকাশ করা হত। কালে কালে কীর্তন সংরূপটি যেমন বদলেছে, তেমনি প্রভাবিত করেছে অন্যান্য সংরূপগুলিকেও। এক্ষেত্রে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক—

> ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় ও তাহার আগে রামায়ণ গান কি ভাবে হইত জানি না, তবে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে রামায়ণ-পাঁচালি যে কীর্তনের ঢঙে গাওয়া হইতে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর প্রভাবও পড়িতেছিল।[৩]

পাঁচালির মতো একটি শক্তিশালি সংরূপের উপর যদি পদাবলী কীর্তনের এরূপ প্রভাব পড়ে তবে অনুমান করতে দোষ নেই, অন্যান্য সংরূপগুলিও কীর্তনের প্রখর তেজ উপেক্ষা করতে পারেনি।

রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লীলাকীর্তনের প্রচলন হয়েছিল খেতুরী মহোৎসব থেকে। অষ্টাদশ শতকে উপনীত হয়ে কীর্তনের প্রচলনে খানিকটা ভাঁটা পড়ে। তবে কীর্তনগান চর্চা থেমে থাকেনি, তা নিয়ে ভাঙা-গড়া চলেছে। এই সময়ের প্রতিকূল পরিবেশে যে নতুন ঢঙের গান ও গীতিময় নাট্যের প্রচলন হয় তাতে কীর্তন সংরূপটি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কীর্তনের বিষয়, পদ, সুর, রাগরাগিণী ও উপস্থাপনকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যত্রতত্র। এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত অথবা গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ কাজ করেনি। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে উদ্ভূত বিভিন্ন সংরূপে কীর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করার মাধ্যমে বাংলা নাটকের ক্রমবিবর্তনে এর ভূমিকা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খেউড় ও কবিগান

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের তিরোধানের পরবর্তী সময়ে একধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যা কবিগান নামে পরিচিত। ড. ভূদেব চৌধুরী কবিগান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> 'অশিক্ষিত পটু' কবিরা এর স্রষ্টা; 'হঠাৎ রাজার' মনোরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষায় রচিত এই সব কবিগান হঠাৎ-কবিদেরই ক্ষণস্থায়ী কীর্তি। এদের যথাযথ 'কাব্য'-নামের মর্যাদা দেওয়া কঠিন; তাই এই শ্রেণীর সব রচনাই সাধারণভাবে 'কবিগান' নামে পরিচিত। রচয়িতা সকলেই 'কবিওয়ালা',—'কবি' নন কেউই।[৪]

ড. সুকুমার সেন মেয়েমহলে আবদ্ধ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গেয় 'খেউড়'-কে কবিগানের এক পূর্বরূপ[৫] হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। একাধিক কবিওয়ালাদের দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা বাদাবাদি কবিগানের বিশেষত্ব। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বক্তব্য এই বিষয়ে উল্লেখ্য—

> The kavi is sung between two parties, and there are wit-combats between the two parties relating to Shakti, Shiva, Krishna and other mythical topics.[৬]

একদল যে বিষয়ে প্রশ্নগান বা 'চাপান' গাইবেন তারই জবাবগান বা 'উতোর' দেবেন অন্য দল। গানের প্রশ্নোত্তর পর্বে জয়ী এবং উৎকৃষ্ট গায়নের বিচারে বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করা হত। কবিগানের চারটি বিভাগ রয়েছে। এগুলি হল— গুরুদেবের গীত অর্থাৎ বন্দনা, সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড়। এতে টপ্পা গানের ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয়। কবিগানের কয়েকজন নামকরা কবিওয়ালা হলেন— নীলমণি পাটনী, নিতাই বৈরাগী, বলরাম বৈষ্ণব, রামসুন্দর স্যাকরা, ভোলা ময়রা, জগন্নাথ বেনে, কেষ্টা মুচি, ভীমদাস মালাকার, মতি পসারী, গুরো দুম্বো, রাম বসু, হারু ঠাকুর, রাসু-নরসিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।

কবিগানের আদি সূত্র অনেকেই বড়ুচণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ খুঁজে পেয়েছেন। অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়ার মত এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> কবিগানের জন্ম এ সময়ে হলেও বাঙালি সংস্কৃতির বহু প্রাচীন উপাদানের মধ্যে কবিগানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান ছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা ও কৃষ্ণের যে উক্তি-প্রত্যুক্তি পাওয়া যায়, তা কবিগানের 'কেউড়' বা 'জোটের পাল্লা'র অনুরূপ।[৭]

অপরপক্ষে ড. ভূদেব চৌধুরী কবিগানকে বিভিন্ন সংরূপের খোলসে আবৃত স্বতন্ত্র্য রূপবদ্ধ একটি সংরূপ বলার পক্ষপাতী। তাঁর মতে—

> কেবল কীর্তন পালার প্রসঙ্গকে পূর্বসংস্কারমাত্র রূপে গ্রহণ করে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম সম্বন্ধে কবিওয়ালারা নূতন কথা বলেছেন নূতন ভঙ্গিতে। বাচ্য-বিষয়ের সেই স্থূলতা হয়ত আদিমতাধর্মী কৃষ্ণধামালি বা ঝুমুরের সঙ্গেও সাদৃশ্য-যুক্ত। কিন্তু কবিগান স্বভাবত কৃষ্ণধামালি বা ঝুমুরের স্বজাতি নয়, যেমন সমজাতীয় নয় বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা শাক্ত-সঙ্গীতের।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো এক বিশৃঙ্খল সময়ে দাঁড়িয়ে, একক সংরূপকে পুরোপুরি অনুসরণ করে নির্দিষ্ট অবয়ব তৈরি করা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। চটুল জনপ্রিয় পদ্ধতির অনুসরণ বারে বারে করতে দেখা যায় বিভিন্ন সংরূপে। সেই কারণে পদাবলী কীর্তনের মতো বিভিন্ন সংরূপের আকর্ষণীয় দিক কবিয়ালরা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও সেই কাজ করতে গিয়ে কবিয়ালরা রুচিশীলতার পরিচয় রাখতে পারেননি। এই দিকটি সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁর *কবিসঙ্গীত* প্রবন্ধের সামান্য অংশ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> পূর্ববর্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ। তাহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল, এখানে তাহা বাসি ব্যাঞ্জন-আকারে সন্মিশ্রিত।[৯]

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সমকালীনতার প্রভাব পড়েছে। সেই গলিত সমাজব্যাবস্থাকে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন—

> এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্মল নহে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা এক প্রকার শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে, তাহার সৌন্দর্যপরিবেষ্টন হইতে, বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষা এবং শিথিল ছন্দ-সহযোগে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য মূর্তি ধারণ করে।[১০]

তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কবিগান সংরূপটি পদাবলী কীর্তনের অনুসরণ করেছে। হয়তো সেই অনুসরণে রুচিবোধ সেভাবে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তবে কবিয়ালরা যে কেবলমাত্র অশ্লীলের আরাধনাই করেছিলেন এমনটাও নয়। এই যুক্তির সমর্থনে রাজনারায়ণ বসুর *সেকালের আমোদ* প্রবন্ধ থেকে তাঁর মত উল্লেখ্য—

> কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন, এমন নহে, কবি গাইবার সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীতও গাইতেন।[১১]

তখনকার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আসরে, কেবলমাত্র গানের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভাব প্রকাশ করলে চলত না। প্রয়োজন হয়েছিল সংলাপের। কাজেই কবিগান কেবলমাত্র গানের দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকেনি, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গেয় নাট্যের আকারে জনপ্রিয়তার শিখরে থেকেছে। যাত্রা সংরূপকেও এই কবিগান ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে কবিগান যে সংরূপের দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল তা পদাবলী কীর্তন।

ড. সুকুমার সেন কবিগানের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় পদের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন যা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> তিনরাত্রি কবি গায় দু দল হইয়া, হারিজিত শব্দগুণে শুন মন দিয়া।
> গোপিতে করিল সৃষ্টি কবির কীর্ত্তন, অদ্যাবধি সেই গান করে নরগণ।[১২]

কীর্তন আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল এবং 'অদ্যাবধি' অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিয়ালদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তা গীত হত। অধ্যাপক সাইমন জাকারিয়া কবিগানে শাক্ত গান ও বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা নিরূপণ করে বলেছেন—

> কবিগানের প্রথমে ডাক-মালসি বা ভবাণী-বিষয় নামে যে গান গাওয়া হয়, তা শাক্ত গানের উত্তরাধিকার বহন করে; একইভাবে সখীসংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, ভোর প্রভৃতি গান বৈষ্ণব-গীতিকারই রূপবিশেষ।[১৩]

কবিগান বেশ জনপ্রিয় নাট্যমাধ্যম রূপে আজও পল্লীসমাজে আদৃত। এক প্রতিযোগিতামূলক আবহে কবিগানের পথ চলা শুরু হয়েছিল। এর দিকদ্রষ্টা রূপে যেমন পদাবলী কীর্তন ছিল তেমনি অন্যান্য সংরূপগুলিও বাদ থাকেনি। প্রতিযোগিতার আবহে কবিরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংরূপগুলির আশ্রয় নিয়েছেন। এতে তাঁদের বাছবিচার করতে দেখা যায়নি। পদাবলী কীর্তনের পাশাপাশি পাঁচালি,

গীতিকা, বাউল গানের মতো বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশে কবিগান উপস্থাপিত হয় এবং তা বাঙালির নাট্যপিপাসা তৃপ্ত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

ঢপ-কীর্তন

কীর্তনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত ঢপ-কীর্তন। নামকরণেই তা প্রতিফলিত হয়। ঢপ বা ঢপ কীর্তনে সাধারণত রাধাকৃষ্ণলীলার কাহিনি পরিবেশিত হত। তবে রাধাকৃষ্ণলীলা ছাড়াও *পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত,* মনসামঙ্গলের বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় কাহিনি এতে পরিবেশিত হত। ঢপে কাহিনি যেমন থাকে তেমনই থাকে পাত্রপাত্রীর উল্লেখ। কাজেই এতে নাট্যরসের খামতি নেই। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের সংগীতমূলক নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে থাকত কথকতা। একসময় এতে নারীশিল্পীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই রীতি উনিশ শতকে 'নতুন ঝুমুর' নামেও পরিচিত হয়। পদাবলী কীর্তনের অস্তিত্ব বজায় থাকলেও কেন আলাদাভাবে ঢপ-কীর্তনের প্রচলন হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> পদাবলী কীর্তনগান ধর্মঘটিত অনুষ্ঠানের অঙ্গে পরিণত হওয়ায় এবং আখরের বোঝা চাপানোয় সাধারণ লোক কীর্তনের স্বাদ হারাইতেছিল। তাহারা ঝুঁকিল নূতন পাঁচালি ও ঢপের দিকে।[১৪]

পদাবলী কীর্তনের ধর্মীয় পরিমণ্ডল, রসপর্যায় ভিত্তক আলাপ, ঘরানা অনুসারী দীর্ঘ রাগরাগিণীর ব্যবহার, শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ বোঝার মতো ধৈর্য-স্থৈর্য ছিল না বাবুদের। তাই কীর্তন ভেঙে তৈরি হচ্ছিল হালকা চালের ঢপ-কীর্তন। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কীর্তনীয়া রূপচাঁদকে আদি ঢপ-কীর্তনের স্রষ্টা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন—

> মনোহরসাহী কীর্তনের সুর ভাঙ্গিয়া রূপচাঁদ হাল্কা সুরের সৃষ্টি করেন। রূপচাঁদের কীর্তনই 'ঢপ' নামে পরিচিত।[১৫]

একজন কীর্তনীয়া পদাবলী কীর্তন এবং ঢপ কীর্তন উভয়ই গাইছেন। এক্ষেত্রে কীর্তন থেকে ঢপ-কীর্তনের উত্তোরণ হয়েছে বলেই মনে হয়। কীর্তনের আসরে কীর্তনীয়া সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ যে পর্যায়ের পদই উপস্থাপন করুন না কেন তা মিলনের পদ গেয়েই শেষ করার নিয়ম। ঢপ-কীর্তনেও এই প্রথা পালন করা হয়। মাথুর পালার মতো বিরহের পালায় শেষপর্যন্ত মিলন দিয়েই সমাপ্ত হয়। এই রীতি ঢপ-কীর্তনে 'মেলতাই' নামে পরিচিত। ঢপ-কীর্তনে কীর্তনাঙ্গীয় 'মেলতাই' এবং 'তুক্কো' প্রথা

যাত্রা নাটকেও ব্যবহার করা হত। তবে ড. সুকুমার সেন পাঁচালিকেই ঢপ-কীর্তনের উৎস রূপে বলার পক্ষপাতী। তাঁর মতটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—

> পাঁচালির দুই প্রধান রীতি—(১) প্রাচীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের পায়ে নূপুর ও হাতে চামর-মন্দিরা থাকিত, আর (২) নবীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের কোন বিশিষ্ট সাজ ছিল না। এই নবীন পদ্ধতির নারীকণ্ঠ রূপান্তর "ঢপ-কীর্তন" নামে প্রসিদ্ধ।[১৬]

সুকুমার সেন মহাশয়ের পাঁচালির প্রতি অত্যধিক আবেগ ও নির্ভরযোগ্যতার কারণে বহুক্ষেত্রেই তিনি পাঁচালি সংরূপকে উৎস রূপে পরিগণিত করেছেন। যাত্রার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যদিও পাঁচালির দ্বারা তখনকার অন্যান্য দেশীয় সংরূপগুলির মতো ঢপ-কীর্তনও প্রভাবিত হয়েছিল তবে এর উৎপত্তি কৃষ্ণলীলানির্ভর কীর্তন থেকে হওয়াই অত্যধিক যুক্তিপূর্ণ। এক্ষেত্রে ভূদেব চৌধুরীর মত উল্লেখ্য—

> কীর্তনের পালা এবং সঙ্গীতের সঙ্গে যাত্রাধর্মী সংলাপ এবং চরিতাবতারণার নাটকীয়তা যুক্ত করে ঢপ গানের জন্ম।[১৭]

নাট্যকার সেলিম আল দীন ঢপ-কীর্তনের সঙ্গে লীলানাট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> ঢপ কীর্তনের পরিবেশনরীতি মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতিরই বিশিষ্ট ধারা। উপরন্তু এই বিবরণে ঢপের সঙ্গে লীলানাট্য প্রভাবিত যাত্রার ঘনিষ্ট সম্পর্কও প্রমাণিত হচ্ছে।[১৮]

ঢপ-কীর্তনের প্রচলন হওয়ার পর এর জনপ্রিয়তা যাত্রা সংরূপটিকেও আকর্ষণ করেছিল। লীলানাটক ও লীলাকীর্তন থেকে উদ্ভূত ঢপ-কীর্তন রূপান্তরিত হয়ে যাত্রা সংরূপে পর্যবসিত হয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয়তো সেকারণেই 'ঢপ যাত্রা' কথাটির প্রচলন হয়েছিল। এর উল্লেখ ও ব্যাখ্যা যথা স্থানে করা হবে। তবে এই সংরূপগুলির মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সম্পর্কের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রভাতকুমার গোস্বামীর বক্তব্যে। তিনি বিখ্যাত ঢপ-কীর্তন গায়ক মধুসূদন কানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> যশোহরের মধুসূদন কানও (জীবৎকাল ১৮১৩-১৮৬৮) প্রাচীন আদর্শে কীর্তনাঙ্গিক 'ঢপ যাত্রা' (বা ঢপ কীর্তন)-এর প্রচলন ক'রে উন্নত রুচির তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি 'অক্রূর সংবাদ', কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর, প্রভাস প্রভৃতি পালা রচনা করেন। তাঁর গানেও ভক্তিভাবের প্রাধান্য এবং ভাষার দিক থেকে কৃষ্ণকমলের মতই যমক ও অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি।[১৯]

উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট 'কীর্তনাঙ্গিক ঢপ যাত্রা'-র উল্লেখ থেকে কীর্তনের সঙ্গে ঢপ-কীর্তনের সম্পর্ক স্পষ্ট বোঝা যায়। নাগরিকসমাজে মানবিক আদিরসে পরিপূর্ণ কাহিনি শোনার শ্রোতা যেমন ছিল, তেমনি ভক্তিভাবের গান শোনার লোকও কম ছিল না। এই সকল মানুষের মনকে তৃপ্ত করতে কীর্তনাঙ্গীয় ঢপ-কীর্তন ও যাত্রা-ধারার সজল গতি অব্যাহত ছিল।

আখড়াই ও টপ্পা গান

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় কবিগানের প্রতিযোগিতামূলক গানের ভঙ্গিমা প্রভাবিত করেছিল আখড়াই এবং টপ্পা গানকে। দুই গানের দলের মধ্যে গান-বাজনা ও সুরের ভাল-মন্দ বিচার করে বিজয়ী ঘোষিত হত। সেই সময়ে বৈঠকি গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবকৃষ্ণ দেব। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত হতেন কয়েকজন বিশেষ সংগীতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে একজন কুলাইচন্দ্র সেন আখড়াই গানকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। 'আখড়াই' অর্থাৎ আখড়া বা সংগীতশালার উপযুক্ত করে গাওয়া গান। সকলেরই জ্ঞাতব্য যে বৈঠকি গানের ধরন অষ্টাদশ শতকের আগেও প্রচলিত ছিল। বৈঠকি গানের প্রচলন হতে দেখা যায় খেতুরী মহোৎসবে। লীলাকীর্তন বা রসকীর্তনের প্রচলন হয়েছিল বৈঠকি কায়দায়। আখড়াই গানে পাঁচালি ও কীর্তনের ঢঙ অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের পরিবেশন ছেড়ে অল্প সময়ের উপস্থাপন-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ড. সুকুমার সেনের মত এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> আখড়াই-গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও প্রগাঢ়। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত, প্রথমে "মালসী" অর্থাৎ মালবশ্রী রাগিণীতে গেয় ভবাণীবিষয়ক, তাহার পর প্রণয়গীতি (সাধারণত মিলনের ব্যাকুলতাসূচক), শেষে প্রভাতী (রজনীপ্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ)। ইহাতে ধ্রুপদ-খেয়ালের মতো রাগের আলাপ ও সুরের পরিচারণ দীর্ঘবিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেইজন্যই।[২০]

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনের অবসর অনেক কমে আসে। অবসর কমার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়িত পালাও সংক্ষেপিত করার প্রক্রিয়া চালু হয়। তবে হঠাৎ করে এর বিষয় কী একেবারে পালটে যেতে পারে? রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদলে মানব-মানবীর প্রেমমূলক ভাব প্রাধান্য পায় এই সময়। যমুনা নদীর তীর বদলে সাধারণ নদী বা সরোবরের কথা হয়তো উঠে আসে কিন্তু প্রেমের গাঢ় ভাব প্রকাশে পদাবলীর অনুকরণ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। 'প্রণয়গীতি' ও 'প্রভাতী' গানে যে মিলন ও বিরহের সুর ধ্বনিত হয় তা পদাবলীর সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভকেই মনে করিয়ে দেয়। আখড়াই ও টপ্পা গান এই দিক থেকে পদাবলী কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

টপ্পা গানের বিষয়বস্তু ও সুর মর্ত্যকেন্দ্রিক। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রমুখ নাম টপ্পা গানের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এঁরা যখন টপ্পা গান রচনা করছেন তখনও গীতিকবিতার রূপ বিকশিত হয়নি। তাঁদের কাছে আদর্শ ছিল পদাবলীর রূপ ও রাধাকৃষের প্রেমলীলা। টপ্পা গানে মাঝেমধ্যে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ থাকলেও নিধুবাবু এবং তাঁর অনুচরেরা হালকা চালে মানব-মানবীর প্রেমের হাসিকান্না মার্গরীতিতে ফুটিয়ে তুলতেন। পদাবলী কীর্তনের সরাসরি অনুসরণ না হলেও এতে আংশিক অনুসরণ অবশ্যই ঘটেছিল।

যাত্রা

সংস্কৃত 'যা' ধাতু থেকে 'যাত্রা' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ গমন। মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের যুগে বাৎসরিক পূজা অথবা পালাপার্বিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তদের উৎসব যেমন— রথযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি যাত্রা রূপে প্রচলিত ছিল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রার উদ্ভব সূর্যোৎসব থেকে হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে সূর্যের নব নব যাত্রার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসারে কৃষ্ণবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি যাত্রা নামে চিহ্নিত হত। যেমন— ঝুলন বা হিন্দোলযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি।[২১] ড. সুকুমার সেন উৎসব উপলক্ষে যাত্রার উৎপত্তি স্বীকার করেন। সংরূপগত বিচারে এর উদ্ভব রূপে বলেছেন— পাঁচালি হইতে যাত্রার উদ্ভব।[২২] যাত্রার বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণ-যাত্রা অথবা কালিয়দমন। তাহার পর চৈতন্য-যাত্রা। চণ্ডী-যাত্রার নামটুকু শোনা যায়। অবশেষে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা।[২৩]

এখানে বিষয়ভিত্তিক বর্ণনার পাশাপাশি একটি কালানুক্রমিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। যাত্রা যে কখনোই নির্দিষ্ট দৈবসত্ত্বার মাহাত্ব-কীর্তনে আবদ্ধ থাকেনি তা স্পষ্ট। আধুনিক কালেও সামাজিক ও স্বাদেশিক বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের *যাত্রা* প্রবন্ধে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে অন্য ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা হল—

> পূর্বে যাত্রাকে দেবলীলা বলিত। বৈষ্ণবদের সময় হইতে কৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রার নাম দেওয়া হয়—কৃষ্ণলীলা। এই সব যাত্রায় ছিল কীর্তনাঙ্গ সুরেরই বেশি প্রভাব। প্রথমে মহড়া দেওয়া হইত, তারপর 'গৌরচন্দ্র'-পাঠ, অতঃপর কৃষ্ণের নৃত্য হইত, তারপর "মণি গোসাঞি" আসিত। পরবর্তীকালে শুধু কৃষ্ণ বিষয় লইয়া নহে, পুরাণ ও

কাব্যের বহু ব্যাপার যাত্রার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা তো ছিলই, তাহাদের সঙ্গে জুটিল মনসার ভাসানযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি।[২৪]

কীর্তন এবং লীলা জাতীয় নাট্যের সঙ্গে গভীর যোগের কথা তিনি বলছেন। এই যাত্রার ধারা মধ্যযুগ থেকে বৈষ্ণবদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে মধ্যযুগে যে 'যাত্রা' কথাটি প্রচলিত ছিল তা কী আদৌ নাটকের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হত? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করাটা খুব জরুরি।

যাত্রার উদ্ভব প্রাচীনকালে নির্দেশিত হলেও নাটক অর্থে যাত্রার প্রচলন হয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে। নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য— মধ্যযুগে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নাটক অর্থে যাত্রা, কোথাও দেখা যায় না।[২৫] ঠিক একই ধরনের ইঙ্গিত পূর্বেই ড. শশিভূষণ দাসগুপ্তের কণ্ঠেও শোনা যায়। তাঁর যাত্রা সম্পর্কিত মতটি হল—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আবার নূতন করিয়া নূতন বৈশিষ্ট্য লইয়া যাত্রাগান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের এই যাত্রাগান আমরা ঠিক প্রাচীন যাত্রারীতিরই অবিচ্ছিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; ইহা তৎকালীন জনসাধারণের ভিতরকার সাহিত্য-সামাজিকগণের চাহিদার ফলে জনসাধারণের ভিতরকার প্রতিভা অবলম্বনে অভিব্যাক্ত নাট্যকৃতি। মানুষের মনের যে মৌলিক চাহিদার নাটকের উৎপত্তি সেই মৌলিক চাহিদাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নূতন করিয়া আবার যাত্রার উৎপত্তি।[২৬]

এর আগে প্রচলিত 'যাত্রা' শব্দটি গমনার্থে অথবা শোভাযাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে যখন নতুন নতুন নাট্য-আঙ্গিক গড়ে উঠছিল তখন যাত্রা সংরূপের নবজন্ম হয়। এর আগে যাত্রা নাটক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। *চৈতন্যভাগবত*-এর অন্ত খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণসংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন।[২৭]

এখানে 'কৃষ্ণযাত্রা' অর্থে কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে শোভাযাত্রা বা উৎসব অনুষ্ঠানের কথা বোঝানো হয়েছে। শোভাযাত্রা করে মানুষ কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতেন। উক্ত গ্রন্থের অন্ত খণ্ডের দশম অধ্যায়ে যাত্রা প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

যাত্রা আসি' বাজিল 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্।।
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেই মত দাসে করে।।
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরো লই' সর্বভক্তগণ।

আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন।।[২৮]

বলা বাহুল্য এখানে 'যাত্রা' নিছক উৎসব অর্থে নির্দেশিত হয়েছে। 'ওড়ন-ষষ্ঠী' উপলক্ষে জগন্নাথের মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরাবার উৎসব মাত্র। হ্যাঁ, তবে এই উৎসবে নাট্যানুষ্ঠান হতে বাধা নেই। এই সূত্রেই হয়তো যাত্রার সঙ্গে নাটকের যোগ তৈরি হয়েছে। তখনকার 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহারে নাটকের অনুষঙ্গ কোথাও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। তবে প্রশ্ন হল, কেন শুধু যাত্রার মধ্যে বাঙালির নাট্যচর্চার প্রাচীনতর ঐতিহ্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়? এর উত্তর নাট্যকার সেলিম আল দীন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

> অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকের পাশে এক প্রবল স্বজাত্যবোধ ও ঐতিহ্য অন্বেষণের প্রেরণায় বাঙলার নিজস্ব নাট্যরীতি খুঁজে বের করার তাগিদ থেকেই সম্ভবত 'যাত্রা' কে বাঙলা নাটকের প্রাচীনতম রূপে দেখার প্রয়াস জন্মলাভ করে।[২৯]

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে "বাংলা ভাষায় নাটক নেই"-এর যে রব উঠেছিল তা প্রশমিত করার সহজ উপায় ছিল যাত্রাকে একমাত্র নাট্যরূপে প্রমাণ করা। সুচিন্তিত গবেষণায় কালযাপন না করে এই চটজলদি নেওয়া সিদ্ধান্তই একরকম প্রতিষ্ঠিত মত হয়ে ওঠে। যাত্রার সংরূপগত বিচারেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষত পাঁচালি থেকে এর উদ্ভব বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করাটা ভীষণ জরুরি।

সুকুমার সেন যাত্রার সঙ্গে পাঁচালির তফাত দেখিয়েছেন শুধুমাত্র বহু চরিত্রের এবং একক চরিত্রের। তাঁর মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> যাত্রার সঙ্গে পাঁচালির পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালিতে মূলগায়েন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রায় একাধিক—সাধারণত তিনটি।[৩০]

এই যুক্তিতে বাংলার সমস্ত নাট্যসংরূপের সঙ্গেই যাত্রার মিল পাওয়া যাবে। তবে যাত্রার সঙ্গে সর্বাধিক যে সংরূপটির মিল পাওয়া যায় তা প্রাচীন লীলানাট্যের। চরিত্রানুগ সাজসজ্জায় উপযুক্ত স্থান-কালের ঘেরাটোপে উপস্থাপিত হত লীলানাট্য। বহু চরিত্রের সমাবেশে কৃত্যানুষ্ঠান সহযোগে তা পরিবেশিত হত। লীলানাটক চৈতন্য-সমসাময়িক সময়ে বা তার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান (কৃষ্ণের জন্মযাত্রা, রথযাত্রা উপলক্ষে নাট্যানুষ্ঠান) ও উৎসব ছাড়াও তা উপস্থাপনের (শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রমুখের গৃহে নাট্যাভিনয়) নিদর্শন পূর্বেই মিলেছে। যাত্রার বৈশিষ্ট্য লীলানাট্যের অনুরূপ।

পাঁচালি থেকে কেন যাত্রার উদ্ভব হতে পারে না তার যৌক্তিক কারণ নির্দেশ করেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। তিনি বলেছেন—

> যে-কালে লীলানাট্য চরিত্রাভিনয়ের ধারায় আত্মপ্রকাশ করে, পাঁচালি সেকালেও নিজস্ব বর্ণনাত্মক-পালাভিনয়ের ধারায় উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। কাজেই পাঁচালি থেকে লীলানাটকের উদ্ভব হয়নি। অন্যদিকে যাত্রা-উৎসবে লীলানাটক অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও যাত্রার নাট্যরূপান্তর লীলানাট্য থেকে না হয়ে কেন পাঁচালি থেকে হবে, তার কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। এদেশে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে যাত্রা-নাটকের অস্তিত্ব ছিল, এরূপ প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, লীলাশ্রেণির নাটক থেকে পরবর্তীকালে যাত্রানাটকের উদ্ভব।[৩১]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলায় লীলানাট্য এবং কীর্তনের বিপুল প্রসারে পাঁচালি ব্যতীত অন্যান্য সংরূপগুলি ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছিল। বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তদের বা অপৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের দ্বন্দ্বের কথা নতুন করে বলবার নেই। মনে রাখতে হবে, মঙ্গলকাব্যগুলি পাঁচালি আকারে লেখা ও উপস্থাপন করা হত। মনসামঙ্গল কাব্যে অন্যতম প্রভাবশালী দেবী সর্প অধিষ্ঠাত্রী। কৃষ্ণলীলার কালিয়দমন কাহিনি বৈষ্ণবদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে যাত্রা-নাটকের একটি জনপ্রিয় রূপ লাভ করে কালীয় নাগ দমনের কাহিনি। কৃষ্ণ কেবল সর্পভীতি নিবারণকারীই নন, তিনি সর্প-পীড়নকারী দেবতাও বটেন। অর্থাৎ কালিয়দমন কাহিনির সম্প্রচারে মঙ্গলকাব্যের মনসা দেবীর বিকল্প রূপে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করা সহজ। কৃষ্ণের সর্পপীড়ন রূপের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ কোথাও সর্পদেবী মনসাকে কোণঠাসা করার ঐকান্তিক ইচ্ছা কি না বলা যায় না। একই সঙ্গে মঙ্গলকাব্য যে ফর্মে (পাঁচালি) লেখা হচ্ছে তার প্রতিও বৈষ্ণবদের নিস্পৃহ ভাব দেখানটা অস্বাভাবিক নয়। কালিয়দমনের কাহিনি লীলানাটকের ধারায় রূপান্তরিত হবার পেছনে হয়তো এই অভীপ্সা প্রথিত ছিল। পাঁচালির নাট্য-আঙ্গিকে কালিয়দমন যাত্রা উপস্থাপনের যুক্তি তাই দুর্বল মনে হয়। তুলনায় লীলানাট্য ও পদাবলী কীর্তনের আকারে যাত্রা পরিবেশনের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী এমন একটা সময় যখন সাংস্কৃতিক রদবদল খুব বড়মাত্রায় হয়েছিল। লীলানাট্যের কৃত্যরীতির ঐতিহ্য থেকে বিনির্গত হয়ে নতুন নতুন বিষয়কে আত্মস্থ করে উনিশ শতকে আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির এক বিশেষ ধারা। এই ধারার নাট্য ‘কালিয়দমন’, ‘সীতার বনবাস’, ‘চৈতন্য-সন্ন্যাস’ ইত্যাদি আখ্যানের অনুসারী নামে, অথবা এর সঙ্গে

‘গান’, ‘পালা’ কিংবা কখনো ‘যাত্রা’ নামে অভিহিত হত। কালিয়দমন গান, কালিয়দমন পালা, কালিয়দমন যাত্রা —এই তিনটি একই কাহিনির অন্তর্গত হলেও উপস্থাপনগত তারতম্যের কারণে বা অঞ্চলভেদে প্রচলন অনুসারে ভিন্ন নামে পরিচিত হত। নাট্যকার সেলিম আল দীন মনে করেন পেশাগত প্রয়োজনে নাট্যদল ভ্রমণ বা যাত্রা করত। হয়তো এই অর্থে ‘যাত্রা’ কথাটির প্রচলন হয়েছিল।[৩২] ‘যাত্রা’ শব্দটির প্রচলন হয়তো নাটকের সঙ্গে ছিল। কিন্তু নাটক অর্থে তা প্রচলিত ছিল না। যাত্রার নির্দিষ্ট সংরূপগত বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী সময়ে।

একই সংরূপ হওয়া সত্ত্বেও কালিয়দন ‘যাত্রা’ নামে এবং রুক্মিণীহরণ ‘পালা’ নামে পরিচিত হয়। কালিয়দমন নাট্যে পেশাগত প্রয়োজনে জলে অভিনয়ের ব্যবস্থাপনা করা যায়, কিন্তু অন্যটিতে সেই সুযোগ না থাকায় এরূপ নামকরণ হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে শশিভূষণ দাশগুপ্ত ‘যাত্রা’ শব্দ ব্যবহারের প্রেক্ষিত নির্ধারণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গীতাভিনয়কে আমরা মোটামুটিভাবে এক যাত্রানামে অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এই যাত্রাগানের আমাদের কোনও একটা সুস্পষ্ট আদর্শ বা কাঠামো কখনও গড়িয়া ওঠে নাই; জনসাধারণের ভিতর হইতে সহজাত নাটকীয় বোধের দ্বারা যতরকম অভিনয়-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে অনেক সময় তাহাদের সকলের জন্য আমরা শিথিলভাবে যাত্রা কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকি।[৩৩]

উক্ত দু’জনের বক্তব্যের নিরিখে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যাত্রা সংরূপ খুব বেশি প্রাচীন নয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন নাট্য সংরূপের ক্ষেত্রে যেমন পালা বা লীলা যুক্ত হয়েছে, তেমনি সেই ধারায় উনিশ শতকে ‘শিথিলভাবে’ যাত্রা কথাটি প্রচলিত হয়েছিল। এর উদ্ভব সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণায় যথেষ্ট ভ্রান্তি রয়েছে। তবে উনিশ শতকে আবির্ভূত হয়ে যাত্রা সংরূপটি উদ্‌বর্তনের সকল পথ খোলা রেখেছিল।

বিবর্তনমূলক এক বিশেষ সময়ে উপনীত হয়ে যাত্রা সংরূপটি শুধুমাত্র লীলানাট্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থকতে পারেনি। যাত্রার উপস্থাপনকে লীলাকীর্তন বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মত উল্লেখ্য—

> খেতুরীর উৎসবের পর হইতে বিভিন্ন ঢঙের কীর্তন গান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকায় অভিনয়ের সঙ্গীতাংশে ইহারও প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। বৈষ্ণব অধিকারীদের কালিয়দমন যাত্রায় কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীত নিশ্চিত-ভাবে প্রচলিত

হইয়াছিল। অন্যান্য যাত্রাও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকে নাই। কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা প্রচলিত হইবার পর হইতে কৃষ্ণযাত্রার পালায় প্রত্যেক যাত্রাভিনয়ে মোহড়া স্বরূপ সর্বাগ্রে গৌরচন্দ্রী পাঠ হইত।[৩৪]

লীলাকীর্তনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন খেতুরী মহোৎসবে হওয়ার পর থেকে অভিনয় উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পদাবলী সংযোজন করে এর গীতি অংশ ঋদ্ধ হয়েছিল। লীলাজাতীয় হওয়ায় এই কীর্তনে লীলানাটকের প্রভাব পড়েছিল। বিশেষভাবে নিত্যানন্দ এবং চৈতন্যদেবের লীলানাট্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এর সংরূপগত পরিবর্তন সাধন হওয়াটাই স্বাভাবিক। যাত্রার উদ্ভবও হয়েছিল এই লীলানাট্য থেকেই। আঙ্গিক এবং বিষয়গত (কৃষ্ণকথা) সাদৃশ্য থাকায় কীর্তনের গীতাংশ এবং উপস্থাপনকৌশল যে যাত্রার উপর প্রভাব ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। তার উপর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি তখনও। লীলাকীর্তনের মতই গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার চল ছিল যাত্রার সূচনালগ্নে। কালিয়দমন যাত্রায় গৌরচন্দ্রিকার ব্যবহার যাত্রা সংরূপে কীর্তনের প্রভাবকেই প্রমাণ করে। উপরন্তু কীর্তনের জনপ্রিয়তায় কখনোই ভাঁটা পড়েনি। যাত্রা সংরূপটিও হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়তা পিপাসু সংরূপবিশেষ। কীর্তনকে আদর্শ করে যাত্রার উপস্থাপন অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ যাত্রার সূচনালগ্নে সম্ভব ছিল বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে নাট্যকার সেলিম আল দীন এর মন্তব্য উল্লেখ্য—

যাত্রার গদ্যাংশ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হত। বিষয় অনুসারে এতে সাধারণ গান ছাড়া কীর্তন প্রভৃতি সংযুক্ত হতো। ঊনিশ শতকের কৃষ্ণকমল গোস্বামী কীর্তনাঙ্গের গানই যাত্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে রামপ্রসাদী সুর, চণ্ডী প্রভৃতি যাত্রায় প্রবেশ করেছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।[৩৫]

যাত্রা ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত হয়ে যুগের চাহিদায় ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছিল। যতই দর্শননির্ভরতা বাড়ুক না কেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার গীতাংশকে কখনোই যাত্রা থেকে বাদ দেওয়া যায়নি।

সংগীতনির্ভর হওয়ায় কীর্তনের অনেক দল রূপান্তরিত হয়েছিল যাত্রাদলে। কীর্তনের অনেক পালাই হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয় যাত্রাপালা। ড. শশিভূষণ দাসগুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লীলাকীর্তন থেকে যাত্রাপালার রূপান্তর সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই অংশটি বড় হলেও উল্লেখ না করে উপায় নেই—

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রথমে একজন কীর্তনীয়াকে দেখিলাম ঢপগানের ভঙ্গিতে রাই-উন্মাদিনী কৃষ্ণলীলা গান করিতেছেন; তাহার সঙ্গে খোল-করতাল ব্যতীত আর কোনও

> সাজসরঞ্জাম নাই। দেখিলাম তিনি নাচিয়া নাচিয়া কৃষ্ণদরশনে পাগলিনী রাধিকাকে পথে বার বার যেন বাধা দিতেছেন—এই ভঙ্গিতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রসিদ্ধ গান গাহিতেছেন—
>
> ধীরে ধীরে চল গজগামিনী।
> তুই অমনি করে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনী।।
> তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি,
> না জানি কোন্ গহন বনে প্রাণ হারাবি—
> ইত্যাদি।
>
> কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়বার আবার সেই একই অধিকারীর গান শুনিলাম, দেখিলাম আর সবই পূর্বের ন্যায় আছে, শুধু ছোট্ট একটি ছেলেকে রাধা সাজাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া বাধা দিবার ভঙ্গিতে গান করিতেছেন। তৃতীয়বার আবার দেখিলাম, রাধার সঙ্গে দুই একটি সখীও জুটিয়াছে, অধিকারী নিজেও গান গাহিতেছেন, রাধা ও সখীরাও কিছু কিছু গান গাহিতেছে। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু সংলাপও দেখা দিয়াছে। কয়েক বৎসর পরেই জানিয়াছিলাম উপরি-উক্ত অধিকারী বড় কৃষ্ণযাত্রার দল করিয়াছেন।[৩৬]

উক্ত বিবরণে লীলাকীর্তন থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে যাত্রাপালায় পরিণত হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত যখন প্রথমবার কৃষ্ণের লীলাকীর্তন দেখছেন তখন কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত গানের মাধ্যমেই রাধাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এককাভিনয়ে গানের এবং বাদ্যের স্বল্প আয়োজনে তা অভিনয় করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সেই একই অভিনয় দেখছেন তখন আর একক অভিনয় থাকছে না। উপযুক্ত চরিত্রে অভিনয় করতে একটি বালককে রাধা সাজিয়ে তার পথ আটকে দেওয়া হচ্ছে। একসময় যা ছিল কল্পনানির্ভর তা চরিত্রনির্ভর বাস্তবতার কাছাকাছি করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। তৃতীয় বার একই পালা দেখার সময় রাধা চরিত্রের সঙ্গে সখীদের যুক্ত করা হয়। শুধু চরিত্র বাড়ানোই হয় না তাদের মুখে চরিত্রানুগ সংলাপ যুক্ত করা হয়। যেখানে একমাত্র মূলগায়েন এবং তার সঙ্গে দোহার গান করত সেখানে প্রতি চরিত্রই কমবেশি গান করছে। শেষ পর্যন্ত কীর্তন সংরূপের কৃষ্ণলীলা পরিণত হচ্ছে কৃষ্ণযাত্রায়। বহু চরিত্রের সমাবেশে সংলাপমুখর যাত্রা সংরূপ তৈরি হলেও গান কিন্তু বাদ পড়েনি। উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায়, গানের সঙ্গে এক থেকে বহু চরিত্রের সমাবেশ তৈরি হওয়ায় নৃত্যের ভূমিকাও অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। এরই সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে বদল হওয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলমান শাসনের অন্তিম লগ্নের কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম ধর্মীয় শৈথিল্য দেখা যায়। তাঁর *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২ খ্রি.) কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশে জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত করেছিল সেই সময়ের মানুষের

মনকে। মুসলমান আমলের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্নের এই সময়কাল সম্পর্কে ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী মন্তব্য করেছেন—

> মানুষের হীন প্রবৃত্তি তখন অগ্রাধিকার লাভ করেছে : অবাধ কামকেলি, লাম্পট্য এবং মদ্যপের নারকীয় উল্লাস ওপর তলার সমাজকে করে তুলেছিল পঙ্কিল। নৃত্য-গীত, হাসি-তামাসা, ভাড়ামি, নারী দেহের তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা—এ সবের ব্যাপক আয়োজন চলছিল সাহিত্য ও সমাজে।[৩৭]

কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬১-৬২ খ্রি.) গ্রন্থে সেই সময়কার সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা পদাবলী, পাঁচালির পরিবর্তে বাইজিদের হিন্দুস্থানি রাগরাগিণী প্রধান সংগীতের প্রতি বাড়তি ঝোঁক এই সময় দেখা যাচ্ছে। আসরে খোলের পরিবর্তে বাজছে তবলা। এক্ষেত্রে ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> Khola and Nupurs gave place to Tobla and ghunghur. The old Vaishnaba lyric and songs (Mahajani Padas) were placed by newly composed songs. They were set to new songs and the up-country tune of the tappas was gone. These Yatras delighted the people greatly because they were new. When those Yatras became regularly professional parties, they were even then called Sakher Yatras or Yatra for recreation’s sake.[৩৮]

ধনী বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ‘সখের যাত্রাদল’ লালিত হচ্ছে, তাতে বাবুদের রুচিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যাত্রাগানের চরিত্র-বদল ঘটছে। পৌরাণিক আখ্যান এবং কৃষ্ণকথার (কালিয়দমন যাত্রা) পরিবর্তে ‘বিদ্যাসুন্দর’ ও ‘নলদময়ন্তী’ অর্থাৎ মানবীয় কাহিনি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করছে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনি থেকে বড় হয়ে উঠছে বিদ্যা ও সুন্দরের মানবীয় প্রেমমূলক আখ্যান। এই ধরনের যাত্রা ‘নূতন যাত্রা’ নামে পরিচিত। তবে যাত্রায় প্রযুক্ত আদিরস প্রধান স্বেচ্ছাচারের বিরোধী কণ্ঠ যে ছিল না তা একেবারেই নয়। অনেকেই যাত্রার বিষয়বস্তু নির্বাচনে রুচিশীলতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকে আবার এই বিরোধী মনোভাব থকে সাহেবদের থিয়েটারের দিকে মুখ ফেরান। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে ভাবিত হয়ে নাটক রচনার তাগিদ থাকলেও, বিষয় নির্বাচনে সংস্কৃত সাহিত্য এবং পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়। এই সময় একের পর এক সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ নাটক রচনার প্রয়াস দেখা যায়। তবে তাতে গানকে প্রাধান্য না দিয়ে কেউই এগোতে পারেননি। যাত্রার গীতিবাহুল্যের সমালোচনা করে গীতিবহুল নাটক রচনা চলতে থাকে।

এই পরিবেশেও যাত্রার পৌরাণিক ঐতিহ্য যাঁরা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাম শিশুরাম। তাঁর যাত্রা 'কালিয়দমন যাত্রা' নামেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শিশুরাম যাত্রার সংস্কার সাধন সূচনা করলেও তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীকে এই কাজের অগ্রদূত বলা হয়। তিনি নিজে দূতীর অভিনয় করতেন, যার সবটাই ছিল গান। প্রভাতকুমার গোস্বামীর মতে— যতদূর জানতে পারা যায় তিনিই প্রথমে যাত্রার গানের সঙ্গে গদ্য-সংলাপ যোজনা করেন।[৩৯] তিনি কীর্তনের সুর যাত্রায় ব্যবহার করতেন যা 'তুক্কো' প্রথা নামে পরিচিত হয়। তাঁর যাত্রারীতির উপস্থাপন স্বচক্ষে দেখে ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

> There was not too much abundance of songs in Parma's Yatra. For producing poetic effect Parma used dialogues in greater proportion and the songs that followed those conversations were composed in Payar (or rhymed couplets) and they were often sung in the tune with which payars were were used to be sung. At the last end of that rhymed couplets, he used to sing in the tone of Kirtan and that distilled nectar to the ears of the audience. That was known us "Tukko" and Paramananda was its creator.[৪০]

পরমানন্দ অধিকারী যাত্রায় দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ভাঁড় (clown) এবং অঙ্গভঙ্গি (jestures) প্রচলনের বিরোধী ছিলেন। যখন শ্রোতারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত তখন যাত্রাওয়ালারা এর সাহায্যে মনযোগ ফেরানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু পরমানন্দের গানে এমনই মহিমা ছিল যে বাড়তি চটুল চরিত্র হাজির করতে হত না। এই প্রয়াসে কীর্তন যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরমানন্দের সমসাময়িক সময়ের আরেকজন যাত্রাওয়ালা প্রেমচাঁদ। তিনি 'তুক্কো' ব্যবহার না করলেও বৈষ্ণব পদাবলী থেকে পদ নিজের মতো ব্যাখ্যা করে যাত্রাগানে ব্যবহার করেন। তিনি চৌপদী গাইতেন। তখনকার সাধারণ মানুষ প্রাচীন প্রখ্যাত পদকর্তাদের পদের মানে বুঝতে পারত না। প্রেমচাঁদের সহজ সরল ভাষার ব্যাবহারে উপস্থাপিত কীর্তনের পদ, যাত্রার দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর যাত্রারীতির একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা জানা যায় ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। তাঁর মতে—

> ইতিপূর্বে মহিলার কণ্ঠে কীর্তন গান নিষিদ্ধ ছিল, প্রেমচাঁদের এই চর্চিত কীর্তন নারীকণ্ঠে স্থান পেল।[৪১]

কীর্তনে নারীশিল্পীর আনয়ন তখন থেকেই প্রচলিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। প্রেমচাঁদ ‘তুক্কো’ ব্যবহার না করলেও তাঁর শিষ্য বদন অধিকারী এই রীতির উৎকর্ষবিধান করেন তাঁর যাত্রাগানে। তিনি রাধাকৃষ্ণের দান, মান এবং মাথুর ইত্যাদি লীলার কাহিনি নিয়ে যাত্রাপালা রচনা করেন। গুরুর দেখানো পথে হেঁটে তিনিও বৈষ্ণব পদ সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করে যাত্রাগানে ব্যবহার করেন। প্রখ্যাত পদকর্তাদের পদের রূপান্তর কীভাবে করা হত তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেলে বিষয়টি পরিষ্কার হত। এক্ষেত্রে প্রভাতকুমার গোস্বামী কর্তৃক আলোচিত বিদ্যাপতির পদের রূপান্তর উল্লেখ্য—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পলটি চলব হম ঈষৎ হাসিয়া।...[৪২]

এর সহজ ভাষান্তর করে বদন অধিকারী যে গানটি যাত্রায় ব্যবহার করছেন তা হল—

আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ারে।
কব কব কব কথা, কথা কব না গো।।...[৪৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর পরিবর্তন করে ব্যবহার করা ছাড়াও তিনি মৌলিক গানও রচনা করেছিলেন। বদন অধিকারী গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেপরেই বদলাতে থাকে কৃষ্ণযাত্রার সাবেক রীতি। তবে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, যাত্রার সূচনালগ্নে লিখিত আকারে বৈষ্ণব পদাবলী এবং উপস্থাপন আকারে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের আঙ্গিক অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন যাত্রাওয়ালারা।

যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী (জন্ম ১৭৯৮ খ্রি.) ছিলেন কৃষ্ণনগর নিবাসী। কীর্তনীয়া গোপালদাস অধিকারীর কাছে কীর্তন গান শিখে তাঁর দলেই তিনি দোহারী করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের কীর্তনের দল গঠন করেন। সেই কীর্তন দলকেই যাত্রাদলে বদল করেন। এই ঘটনায় বোঝা যায় সেই সময়ে যাত্রার সঙ্গে কীর্তনের গভীর যোগের কথা। তাঁর যাত্রায় যে কীর্তনের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তিনি কালিয়দমন যাত্রায় দূতী চরিত্রে অভিনয় করতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত ‘নতুন যাত্রা’-র রুচিহীন উপস্থাপন তাঁর ভালো লাগেনি। নতুন যাত্রায় নাচ-গানের সাহায্যে দর্শকদের আনন্দদানের ব্যবস্থা ছিল ঠিকই, কিন্তু এতে অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গি, ভাড়ামি, নানারকম সং, মেথর-মেথরাণী, কালুয়া-ভুলুয়া, নাপিত-নাপিতানী এবং ভিস্তির

নিম্নমানের নৃত্য-গীত চালু হয়েছিল। এই প্রতিকূল সময় গোবিন্দ অধিকারীর ভূমিকা সম্পর্কে ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন—

> But even then, Krishna Yatra did not entirely lose its popularity: the old sentiments yet survived. On the one hand there were Sakher Jatra and theatres and on the other side was the indigenous Yatra of Govinda Adhikary. But it was often found that Govinda always used to command a huge crowd. Govinda, too, as we have seen, had to make some changes according to the taste of the time.[88]

সেই সময়কার কালিয়দমন যাত্রাও সখের যাত্রা দ্বারা সংক্রামিত হচ্ছিল। এই অবস্থা থেকে যাত্রাকে মুক্ত করার প্রয়াসে গোবিন্দ অধিকারী গীতিময় নতুন পদ্ধতির উপর জোর দেন। তাঁর নতুন যাত্রা শৈলীর শুক-শারি এবং চূড়া-নূপুর দ্বন্দ্ব তখনকার শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি স্ত্রীলোকের পোশাক পরে দূতী সেজে আসরে নামতেন। মধুর কীর্তনাঙ্গের গীতে তিনি সকলকে মোহিত করতেন। দূতীর চরিত্রাভিনয়ে তাঁকে বেমানান লাগত না। সাময়িককালে প্রচলিত পালায় একজন পুরুষের নারী সেজে আসর জমানোর সঙ্গে হয়তো এই ঘটনাটি মেলানো যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাতন যাত্রাপদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ধর্মচর্চায় মন ছিল। বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এর প্রভাব পড়ে তাঁর যাত্রাগানে। তাঁর ব্রজলীলারসাত্মক রচনায় তা প্রতিফলিত হয়। যেমন— *স্বপ্নবিলাস, দিব্যোন্মাদ* বা *রাই উন্মাদিনী* এবং *বিচিত্র বিলাস*। তাঁর যাত্রায় গদ্য-সংলাপের তুলনায় গীতি-সংলাপ প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর পালার গান ছিল কীর্তনাঙ্গিক। যাত্রাগানে আঙ্গিকগত পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যাত্রারম্ভে বা গাওনার মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে সং বার করার রীতি কৃষ্ণমঙ্গল গোস্বামীর বিদ্যাসুন্দর যাত্রা থেকে প্রচলিত হয়েছিল।[৪৫]

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্য নীলকণ্ঠ অধিকারী এবং কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে যাত্রার পালা যেমন— *যযাতির যজ্ঞ, কংস বধ* ইত্যাদি রচনা করেন। এঁদের যাত্রাগানের আঙ্গিক সম্পর্কে ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন—

গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ এবং পরে কৃষ্ণকমল গোস্বামী যে 'কৃষ্ণযাত্রা' শুরু করেন, তাঁদের যাত্রায় যে গান ব্যবহার করা হয় সেই গান কীর্তন গান নয়— কীর্তন-ভাঙ্গা গান। এই সব গানে কীর্তনের মত আখর ব্যবহার করা হতো না; তবে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীই অনুসরণ করা হত।[৪৬]

'কীর্তন-ভাঙা' বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন, তাতে সম্পূর্ণরূপে কীর্তনের পদ্ধতি ব্যবহার করা না হলেও কীর্তনাঙ্গীয় বিভিন্ন পদ, ঘরাণা, এবং সুর, রাগ ও তালের ব্যবহার করা হত।

যাত্রার আঙ্গিক গঠনে যে সমস্ত সংরূপগুলি সাহায্য করেছিল তার মধ্যে কীর্তন সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাধাকৃষ্ণের কাহিনি প্রাথমিক পর্বের যাত্রার উপস্থাপিত বিষয় হওয়ায় লীলানাট্য এবং কীর্তন এর ভরকেন্দ্রে অবস্থান করেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রাগানের যতই পরিবর্তন সূচিত হোক না কেন গানকে বাদ দেওয়া যায়নি কখনোই। সমকালীন ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাবে যতই সংলাপময় হয়ে উঠুক না কেন বাংলার দর্শক-শ্রোতাদের মনের পিপাসা দূর করতে গানের ব্যবহার করতেই হয়েছে। এদিক দিয়ে থিয়েটারের উপর যাত্রার প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল। লেবেদেফ *The Disguise* নাটকের অনুবাদ করেন *কাল্পনিক সংবদল* নামে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাভাষায় রচিত প্রথম নাটকের অভিনয় হলেও মঞ্চস্থ করার সময় সাধারণ মানুষের রুচি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই নাটকে ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এর গান ব্যবহার করেছিলেন। বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছিল। যাত্রার মতো অঙ্কের বিরতি পর্বে চিত্তাকর্ষক গান এবং সঙ, ভাড়ামি ইত্যাদি বিনোদনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে পৌরাণিক নাটক এবং গীতাভিনয়ের রচনাতেও যাত্রা এবং পদাবলী কীর্তনের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

গীতাভিনয়

যাত্রাগানের অশ্লীলতা বর্জন এবং থিয়েটারধর্মী বাংলা নাটকে গানের অভাব দূর করতে গীতিবহুল নাট্যমাধ্যম গীতাভিনয়ের জন্ম। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিনোদনের ধারা পালটাতেই সৃষ্টি হয়েছিল নতুন যাত্রা যা 'গীতাভিনয়' নামে পরিচিত হয়েছিল। সংরূপটি সমকালীন মঞ্চনাটক ও সাবেক যাত্রার মধ্যপন্থা।[৪৭] ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় *শকুন্তলা* নামে একটি গীতিবহুল নাটক রচনা করেন, যা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গীতাভিনয়ের মর্যাদায় ভূষিত। গীতাভিনয়ে দৃশ্যপটের প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ স্বগত ও প্রকাশ্য উক্তির সাহায্যে এতে দৃশ্যপটের অভাব

পূরণ করা হত। উঁচু মঞ্চ ছাড়াও যে আসরে যথাযথভাবে অভিনয় করা যায় তা গীতাভিনয় আঙ্গিক প্রমাণ করে। তখন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ছিল যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই স্বল্প খরচে আসরে উপস্থাপনযোগ্য গীতাভিনয়ের প্রতি তৎকালীন দর্শক আকৃষ্ট হয়েছিল। এতে বিভিন্ন রাগরাগিণী এবং দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হত। এতে থাকত অনেক গান। গানে একটানা সুরস্রোত বজায় রাখার জন্য দোহারের সাহায্য নেওয়া হত। এতে চরিত্র সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারীর বক্তৃতা বিশেষ ক্ষেত্রে সংযোজিত হত।

গীতাভিনয় সম্পূর্ণরূপে নাট্যাঙ্গিক। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য গীতাভিনয়ের আঙ্গিক নির্ধারণ করে বলেছেন—

> আঙ্গিকের দিক দিয়া স্থুল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে ইহার গীত, নূতন যাত্রা হইতে ইহার নৃত্য, ও তদানিন্তন বাংলা নাটক হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে।[৪৮]

গীতিবাহুল্যের কারণে অনেকে 'অপেরা'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন গীতাভিনয়ের। কিন্তু অপেরা এবং গীতাভিনয় এক নয়। ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মতে, গীতাভিনয় একটি সংগীতবহুল নাটক। বিশেষ রীতির সংগীত, নৃত্য ও লিরিক উচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে গীতাভিনয় অপেরা থেকে আলাদা।[৪৯]

গীতিবাহুল্য, নৃত্য ও বাদ্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের অঙ্গ। গীতাভিনয়ে সংলাপ থাকলেও তা থিয়েটারের সংলাপবহুলতা পরিহার করেছিল। গানের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকায় গীতাভিনয় অনেকাংশেই যাত্রাকে অনুসরণ করেছিল। তবে এতে 'রুচিশীল' দর্শকের অস্তিত্ব প্রকট ছিল। ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী এ সম্পর্কে বলেছেন—

> যাত্রার মত এতে ভক্তি ও করুণ রসের প্রাবল্য, সাজপোষাকের বৈচিত্র্য ভাষার শালীনতা এবং পরিপাট্যের দিক থেকে প্রাচীন যাত্রার চেয়ে নিঃসন্দেহে গীতাভিনয় অগ্রগামী।[৫০]

ভক্তিভাব এবং করুণ রসের উৎস্রোত বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন। স্বাভাবিকভাবে এই দিকগুলি (ভক্তি ও করুণ রস) ফুটিয়ে তুলতে নিশ্চই পদাবলী কীর্তন এবং কীর্তনাঙ্গীয় যাত্রা গানের অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু যাত্রা নাটকে কারণে-অকারণে গীতের প্রয়োগ থেকে মানুষ সরে আসতে চেয়েছিল গীতাভিনয় নাট্যসংরূপের মাধ্যমে। কিন্তু তাতে কি গানের ব্যবহার খুব একটা কমেছিল? মনে হয় না।

সারা রাত্রিব্যাপী পালাভিনয়ের দায় গীতাভিনয়ে ছিল না। কৃষ্ণকমল গোস্বামী এবং মনোমোহন বসু উভয়েই রাধাকৃষ্ণের কাহিনি নিয়ে নাট্যরসের স্ফিতি ঘটিয়েছেন যথাক্রমে যাত্রা ও গীতাভিনয় রচনার মাধ্যমে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী *দিব্যোন্মাদ* যাত্রায় কৃষ্ণবিরহে ব্যথিত রাধার চিত্তকে প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে মনোমোহন বসু *রাসলীলা* (১৮৮৯ খ্রি.) গীতাভিনয়ে রাধাকৃষ্ণের *ভাগবত* ও *গীতগোবিন্দ* বর্ণিত কাহিনির অনুসরণ করেছেন। তবে কৃষ্ণকমলের *দিব্যোন্মাদ* যাত্রায় গদ্য সংলাপ নেই বললেই চলে। সেখানে *রাসলীলা* গীতাভিনয়ে গানের আধিক্য অনুপস্থিত। তবে দু'টি নাট্যাঙ্গিকেই কৃষ্ণকথার আধিক্য থাকায় কীর্তন গানের প্রচলন থাকা অস্বাভাবিক নয়।

নাট্যগুণ থাকায় অনেক সময় যাত্রার মতই গীতাভিনয়কেও নাটক আখ্যা দেওয়া হত। গীতাভিনয়ের মাধ্যমে যাত্রার দর্শকদের ক্ষুধা নির্বাপণ করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভক্তিভাব পুষ্ট যাত্রার আদর্শে লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গীতাভিনয় হল— পূর্ণচন্দ্র শর্মার *শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান* (১৮৬৬ খ্রি.), তিনকরি ঘোষালের *সাবিত্রী সত্যবান* (১৮৬৭ খ্রি.), যাদবেন্দ্র বিদ্যারত্নের *কীচক বধ* (১২৭৪ বঙ্গাব্দ), শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীর *লক্ষণ বর্জন* (১৮৭০ খ্রি.), হরিশ্চন্দ্র মিত্রের *আগমনী* (১৮৭০ খ্রি.) ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রে থিয়েটার ধর্মী নাটকের তুলনায় যে গীতের আধিক্য দেখা যায় তাতে দেশীয় রাগাশ্রয়ী সংগীতের মধ্যে কীর্তনাঙ্গীয় সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ সেই সময়ের সঙ্গীতে ভক্তিমূলক শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ যুক্ত উপস্থাপন রূপে পদাবলী কীর্তনের জুড়ি মেলা ভার।

সমসাময়িক ও পরবর্তী পৌরাণিক নাটকে গীতাভিনয়ের রীতি অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিষয়ের দিক থেকেও গীতাভিনয়ে পৌরাণিক আখ্যানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌরাণিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে একদিকে যেমন গীতাভিনয় রচিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি 'পৌরাণিক যাত্রা' নামে একশ্রেণির নাট্যাঙ্গিকের জন্ম হয়। পৌরাণিক যাত্রার জন্ম প্রসঙ্গে ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি উল্লেখ্য—

> তবু যে একই সময়ে 'পৌরাণিক যাত্রা' রূপে একশ্রেণীর রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার কারণ গীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশকে কিঞ্চিৎ পরিবর্জিত করে এক শ্রেণীর দর্শক সংলাপধর্মী অভিনয়ের প্রত্যাশা করছিল। গীতাভিনয় অপেক্ষা সঙ্গীত কম থাকলেও পৌরাণিক নাটকের মত নিটোল নাট্যরীতি না থাকায় 'পৌরাণিক যাত্রা' নামে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়।[৫১]

এই ধরনের গীতাভিনয় সদৃশ পৌরাণিক যাত্রায় পুরোনো যাত্রার ভক্তিরস আবার নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পৌরাণিক যাত্রার ভক্তির স্বরূপ সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> ভক্তির কথা হইলেই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা আসিয়া যায়, কারণ, কৃষ্ণ-উপাসনা অবলম্বন করিয়াই এই জাতিয় ভক্তির ভাব বিকাশলাভ করিয়াছে; সুতরাং পুরাণের যে অংশে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, পৌরাণিক যাত্রার তাহাই অবলম্বন হইয়াছে।[৫২]

ভক্তিভাবকে প্রাধান্য দিয়ে যখনই নাটক রচিত হয়েছে তখনই কৃষ্ণকথা প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনি যাত্রা ও নাটকের বিষয় আবলম্বন করার ক্ষেত্রে কৃষ্ণকথার দেশীয় নাট্য ঐতিহ্য অনুসরণ করাটাই স্বাভাবিক। কাজেই লীলানাট্য ও কীর্তনের প্রভাব কৃষ্ণকাহিনিতে পরিলক্ষিত হয়। বিরহান্তক পৌরাণিক যাত্রা উপস্থাপিত হলেও, শেষ পর্যন্ত মিলনাত্মক গানের প্রচলন থাকা, কীর্তনের রীতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

পৌরাণিক নাটক জোর কদমে লেখা হতে থাকলে, গীতাভিনয় রচনা ও তার উপস্থাপন দেখার প্রচেষ্টা অনেকাংশেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় গীতাভিনয় এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ পর্বের সাক্ষ্য রূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। প্রথম দিকে রচিত অনেক পৌরাণিক নাটককে গীতাভিনয়ের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। এই প্রসঙ্গে মনোমোহন বসুর পুরাণাশ্রয়ী নাটক সম্পর্কিত ড. প্রভাতকুমার গোস্বামীর মত উল্লেখ্য—

> তিনি যে নতুন ধরনের পৌরাণিক নাটক রচনার পথ প্রদর্শন করেন-রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষীরোদপ্রসাদে এসে তা পরিণতি লাভ করে। অন্তঃপ্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে মনোমোহন বসুর নাটক গীতাভিনয়ের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ তাঁর নাটক নূতন ধরনের দৃশ্য-কাব্য— বাইরের রূপটা নাটক, কিন্তু অভিনীত হয় যাত্রার ঢং-এ। এতে ভক্তিভাবের প্রাবল্য, করুণ রসের প্লাবন, কথকতার বাক্যবয়ন এবং সঙ্গীতবাহুল্য। যাত্রার সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এতে অশালীনতামুক্ত ভাষার পরিপাট্য রয়েছে। সুতরাং মনোমোহনের নাটককে পুরাতন যাত্রারই নবরূপ বলা যেতে পারে।[৫৩]

যাত্রা থেকে নাটকের (বিশেষভাবে পৌরাণিক নাটকের) দিকে অগ্রসর বাঙালি চিত্তকে কিছুটা প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল গীতাভিনয় রচনার এই কালপর্ব। যাত্রার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল পৌরাণিক নাটক। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে 'পৌরাণিক যাত্রা' ও 'পৌরাণিক গীতাভিনয়' যেন পৌরাণিক নাটক রচনার ভিত্তিস্তম্ভ দৃঢ়বদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল।

পৌরাণিক নাটক

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও শৈলীতে যখন আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তখন সেই সময়ের সাহিত্যিকেরা তাঁদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে ভারতীয় পুরাণের নানা আখ্যানকে বেছে নিয়েছিলেন। 'পুরাণ' কথার একটি অর্থ 'চিরন্তন' বা 'শাশ্বত'। কিন্তু একটি রচনা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কীভাবে কালজয়ী, চিরন্তন হতে পারে? সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পারিপার্শিক সমস্ত কিছুর সঙ্গে বদলে যায় মানুষের মনও। সেই মনকে তুষ্ট করে কালজয়ী হয়ে উঠতে গেলে, তার মধ্যে এমন উপাদান থাকা চাই, যা দেশ-কালের বেড়াজাল টপকে নব নব সমকালীনতার বোধ নিয়ে ব্যাখ্যাত হতে পারে। পুরাণের মধ্যে মিশে থাকা বিবিধ মোটিফ (Motif) বা অভিপ্রায়, নানা ধরনের আর্কেটাইপ (Archetype) বা প্রত্নবিষয় ইত্যাদি মানব মনের অচেতনে ও অর্ধচেতনে থাকা সেই অংশকে নাড়া দিতে পারে, যার সারল্য সকল মানব হৃদয়ের চিরন্তন সত্য হয়ে উদ্ভাসিত হয়। পুরাণ বর্ণিত কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত, জাতিগত ঐতিহ্যের অভিপ্রায়, কালাতিক্রমিক মানবমনকে যুক্ত করতে সক্ষম। সর্বকালে মানুষ পুরাণের কাহিনিতে আকৃষ্ট হয়েছে। সেই কারণে কয়েক হাজার বছর পূর্বে রচিত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* বা পৌরাণিক নানা কাহিনি আজও মানুষের মনকে মোহিত করতে সক্ষম। সেই কালের (*রামায়ণ* ও *মহাভারত* রচনার কাল) মানুষের সঙ্গে একরকম সাক্ষাৎ ঘটে। উনিশ শতকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যাত্রা, গীতাভিনয়, থিয়েটারের আদলে নাটক রচনায় পুরাণের প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো। মনে রাখতে হবে কলকাতার তখনও আধুনিক শহর হয়ে উঠতে অনেক দেরি। এর গ্রাম্যতা ব্যবহার করতে গেলে একটি বড় সহায় হতে পারে পৌরাণিক ধর্ম। যদিও ততদিনে মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণগতি ধারণ করেছে, তবে পুরাণের ব্যবহারে সাধিত হয়েছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। মঙ্গল পাঁচালি, গীতিকা অথবা কীর্তনের মধ্যে পুরাকাহিনির যে সহজ ও সরাসরি অভিঘাত তা অনেকাংশেই এর চরিত্রবদল করেছে।

উনিশ শতকে নবজাগরণের অনিবার্য শর্ত হিসেবে হিন্দু ধর্মকে নতুন ভাষ্য দেবার প্রবণতা তৈরি হচ্ছিল। নতুন সময়ের এই সাহিত্যিকেরা একাধারে ছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সংস্কারপন্থীও বটেন। এঁরা রচনাশৈলী নিচ্ছেন পাশ্চাত্য থেকে কিন্তু বিষয়ের নির্বাচনে দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এই সময় যাঁরা নাটক লিখছেন তাঁদের একটি বড় অংশ পুরাণনির্ভর সংস্কৃত

নাটকের অনুবাদে নিয়োজিত। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক রূপে পরিচিত তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন* (১৮৫২ খ্রি.) নাটকে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনেকেই ছিলেন যাঁরা পুরাণকে কালের উপযোগী করে ব্যবহার করছেন। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি ব্যক্তি এই শ্রেণির পৌরাণিক নাটক করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

ভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করলে, অবদমিতেরা দেবতার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এভাবেই প্রাগাধুনিক যুগে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে ভক্তি আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। উনিশ শতকে হিন্দু বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হবার পেছনে, ভিন্ন ধর্মী এবং একেবারে নতুন সংস্কৃতিমনস্ক রাষ্ট্রশক্তির অবদমন অনেক বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজদের দমননীতি, ইলবার্ট বিলের মতো একাধিক আইনের দ্বারা ভারতবাসী অপমানিত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ করার ক্ষমতাও সেযুগের মানুষের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। *নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন* (১৮৭৬ খ্রি.) সেই পথ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় দেশীয় গৌরব পুনরুদ্ধার এবং একই সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বাংলার নাট্যধারায় পালাবদল ঘটে। ব্যাপকভাবে রচিত হতে শুরু করে পৌরাণিক নাটক। এই সম্পর্কে নাট্যকার সৌমিত্র বসু তাঁর *বাংলা পৌরাণিক নাটকের পালাবদল* প্রবন্ধে বলেছেন—

> বাংলা নাট্যশালার পক্ষে সময়টি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে। প্রথম, এই ভক্তি আন্দোলন, যার মধ্যে বাঙালি তার আত্মপরিচয় খুঁজে পাচ্ছিল, তা বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছে, তাই থিয়েটার মালিকদের মনে হল, মানুষের মনের মধ্যে থাকা সেই ভক্তিকে যদি নাটকের সূত্রে উসকে দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হয়ে গেছে, এখন আর এমন নাটক করা যাবে না যা ব্রিটিশ প্রভুদের উষ্মার কারণ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ, সমকালীন যে কোনো সমস্যা, যার স্পষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকতে পারে, তাকে বিদায় দেওয়া হল বাংলার মঞ্চ থেকে। এই সময় লেখা এবং প্রযোজিত যে নাটকগুলির নাম উঠে আসে তাদের মধ্যে পড়বে সমাজ সংস্কারমূলক কিছু নাটক, রঙ্গ ব্যঙ্গ রগড় আর অবশ্যই পৌরাণিক কাহিনি।[৫৪]

ঠিক এই কারণে *নীলদর্পণ* (১৮৬০ খ্রি.) নাটকের পর ইংরেজদের শাসনব্যবস্থার সরাসরি বিরোধিতা করে নাটক রচনা করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে ও খুব সন্তর্পণে নাটকে স্বদেশভাবনা এসেছিল। অন্যদিকে নবগঠিত সমাজের অন্ধকার চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে সামাজিক নাটক।

কেবলমাত্র নাট্যকারদের দ্বারা এই পুরাণের প্রতি দর্শকদের মননিবিষ্ট করানো কখনোই সম্ভব ছিল না। দর্শকেরাও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পৌরাণিক নাটকের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। শৌখিন থিয়েটারের যুগ থেকে পেশাদার থিয়েটারের (১৮৭২ খ্রি.) কালে উত্তীর্ণ হয়ে, দর্শকদের পছন্দ-অপছন্দের দিকে খেয়াল রাখার দায় এড়িয়ে যাওয়া নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর *নীলদর্পণ* নাটকের টিকিটমূল্য ধার্য হয়েছিল প্রথম শ্রেণির ১ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির আট আনা। এই থেকেই সীমাবদ্ধ দর্শকের গণ্ডি ভেঙে গেল। নাট্যকার সৌমিত্র বসু তাঁর প্রবন্ধ *বাংলা থিয়েটার ও বাঙালি দর্শক*-এ বলেছেন—

> তখন ছিল শৌখিন থিয়েটারের যুগ, সেখানে কেবলমাত্র আমন্ত্রিত দর্শকদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ফলে, নাটক নির্বাচন এবং অভিনয়ে দর্শকদের রুচি পছন্দের প্রতি কোনো আলাদা দায় ছিল না। কিন্তু থিয়েটার যখন পেশা হয়ে উঠল, তখন থেকেই শুরু হল সমস্যা। যে মানুষ সেদিনের অভিনয়ানুষ্ঠানটি কিনছেন, বিক্রেতা হিসেবে তাঁকে সন্তুষ্ট করার একটা দায় থাকে শিল্পীর, আর যদি এমন হয় যে এটাই তাঁর রুজি রোজগারের উপায়, তাহলে সে দায় এমনকী মোসাহেবির পর্যায়েও চলে যেতে পারে।[৫৫]

যাত্রা ও নাটকের মধ্যে যত ফারাকই থাক না কেন দর্শক-শ্রোতা কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এক। অবশ্য শিক্ষা ও রুচির বিচারে গ্রহণযোগ্যতায় কিছু তারতম্য অবশ্যই ছিল। সেই সময় যাত্রা ও এই জাতীয় নাট্য ঐতিহ্যের 'শ্রোতা'রাই ছিলেন থিয়েটার ঘেষা নাটকের 'দর্শক'। তাঁরা (শ্রোতা) আসর থেকে সরে এসে মঞ্চ (stage) পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চাওয়া পাওয়াগুলোকে হঠাৎ করে পালটে ফেলতে পারেননি। তাঁরা স্টেজে গান শুনতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ গানের দ্বারা ভারাক্রান্ত যাত্রা শুনে তাঁদের মন গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

> বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল তা দেহের, আত্মার নয়। আসলে পৌরাণিক নাটকগুলি তাদের প্রাণসম্পদ সঞ্চয় করেছিল দেশীয় ভাণ্ডার থেকে। সেদিক থেকে যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটকের কাহিনী-উৎস প্রায়শঃ একই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সখের যাত্রার রচয়িতাদের পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যায় পৌরাণিক নাট্যকারদের মত যাত্রারচয়িতাদের অন্তরেও ধর্মবোধ এবং ভক্তিভাবের স্রোতটি উজ্জ্বল।[৫৬]

বিষয় রূপে যেমন পুরাণের কাহিনির প্রতি নাটক (পশ্চিমের নাট্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত) সংরূপটি ঝুঁকেছিল, তেমনি গান হয়ে উঠেছিল পৌরাণিক নাটকের আবশ্যক অঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনিতে যে ভক্তির আবহ তৈরি হত তাতে অবধারিতভাবে মধ্যযুগীয় ভক্তিকীর্তন প্রয়োজন ছিল। গীতিময় সংলাপ

ও গানের ক্ষেত্রে কীর্তনাঙ্গীয় যাত্রার প্রভাব অসামান্য। বিশেষভাবে কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবীয় ছায়া যেসব পৌরাণিক নাটকে পড়েছিল তাতে কীর্তনের প্রভাব প্রকট।

পৌরাণিক নাটকে যিনি সর্বপ্রথম অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি যখন নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাটক রচনা করছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যজীবনের সূচনাপর্বে একজন যাত্রাদলের অভিনেতা ছিলেন। যাত্রাদলে থাকাটা তাঁর উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তা প্রভাতকুমার গোস্বামীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে—

> এক অবৈতনিক যাত্রাদলে অভিনয় শুরু ক'রে গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে আসেন। সুতরাং যাত্রার প্রভাব তাঁর ওপর ছিলই। নিজে নাটক রচনার পূর্বেও তাঁকে গান লিখতে হয়েছে।[৫৭]

যাত্রা তাঁর জীবনের সঙ্গে সংগীতকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করতে সাহায্য করে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *শর্মিষ্ঠা* (১৮৬৭ খ্রি.) ও দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬৬ খ্রি.) নাটকের গান রচনা করেছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। থিয়েটারের জগতে ঢুকেই তিনি বুঝতে পারেন, তখনকার নাটকের প্রধান দুর্বলতা গান উপেক্ষা করে সংলাপকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় *বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব* প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বলেছেন—

> থিয়েটারী জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে 'ম্যাকবেথ' (নিজেরই অনুবাদ) অভিনয় করতে গিয়ে দর্শকসংখ্যা দেখে হতাশ হন; এবং তখনই স্থির করেন, নাটকাভিনয়কে যাত্রার ছাঁচে ঢালতে হবে নাহলে সাধারণ দর্শকমনে পৌঁছানো যাবে না। সুতরাং নিজের লেখা নাটকে বিষয় হিসেবে যেমন বেছে নিলেন; তেমনি উপাদান ও মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন প্রচুর সংগীত।[৫৮]

একজন অভিনেতা এবং গীতিকার হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যরচনায় ব্রতী হন। তিনি পৌরাণিক নাটকে 'গৈরিশ ছন্দ'-এর প্রবর্তন করেন। এমনিতেই পৌরাণিক নাটকে বহুল সংগীতের প্রচলন ছিল, উপরন্তু নাটকে দেবতা ও রাজা মহারাজাদের সংলাপে যাত্রা বা লীলাকীর্তনের 'আখর' ও 'কথা'-র মতো পদ্য জাতীয় গদ্য সংলাপ ব্যবহার করতেন তিনি। গৈরিশ ছন্দ অনেকটা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো ছিল। এক্ষেত্রে *নিমাই সন্ন্যাস* (১৮৯২ খ্রি.) নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে সংলাপ উল্লেখ্য—

নিদ্রা! কেন এস রে নয়নে
প্রাণধনে হেরি ভাল করে,
বাসনা কি পূরে,
যত দেখি তত বাড়ে সাধ;
বক্ষে ধরি অভয়চরণ
তবু ভয় না হয় বারণ,
কেন মন হও উচাটন?
আরে রে নয়ন! দেখ রূপ সাধ মিটাইয়া।[৫৯]

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই স্বগতোক্তিতে রাধার প্রেমব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই ছন্দেই গোটা নাটক রচিত হয়েছে। এমন পদ্যময় সংলাপেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১ খ্রি.) রচিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যরীতিতে এমন ছন্দময় রূপের পরিচয় দিলেন, যা প্রাগাধুনিক যুগের নাট্যবৈশিষ্ট্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে উপনীত হয়েও বাঙালি সেই ঐতিহ্যকে ভুলে যেতে পারেনি। বিষয়ের দাবিতে এবং জনপ্রিয়তার টানে বাংলা নাটক বারেবারে যেন প্রাগাধুনিক ঐতিহ্যবাহী নাটকের দিকে চলে যেতে চাইছে।

একজন নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে তিনি তখনকার নাটকে যাত্রা সংরূপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। *বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* (১৮৮৮ খ্রি.) নাটকের পাগলিনী চরিত্র অথবা *জনা* (১৮৯৪ খ্রি.) নাটকের বিদূষক চরিত্রে যাত্রার বিবেক, নারদ কিংবা ব্যাসদেবের আদল লক্ষণীয়। সখীগণের গান আছে *ধ্রুব চরিত্র* (১৮৯২ খ্রি.), *হরগৌরী* (১৯০৫ খ্রি.) *সীতার বনবাস* (১৮৮২ খ্রি), *নলদময়ন্তী* (১৮৮৭ খ্রি.) এবং *জনা* (১৮৯৪ খ্রি.) নাটকে। পৌরাণিক নাটকে প্রেম ও ভক্তিভাবের আবহ তৈরিতে তিনি বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় ভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর জীবনচরিতমূলক নাটকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও শাস্ত্রপাঠের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি চৈতন্যজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে তাঁর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ্য—

> গিরিশচন্দ্র ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ ভালো করে পড়েছিলেন। লোচনের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ও অপঠিত ছিল না। কবিকর্ণপুরের ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক’ও সম্ভবত দেখেছিলেন।[৬০]

এতে অবশই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বাস ও ভক্তিভাবে ছায়াপাত করেছিল। *বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* নাটকের প্রেম ও ভক্তি সম্পর্কে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তির আদর্শই রূপ গ্রহণ করেছে এই নাটকে। একটি ভক্তিগীতি দিয়েই নাটকটি শেষ করা হয়েছে। সোমগিরির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে—"জয় বৃন্দাবন...."। এর আগে নাটকের শেষাংশে কৃষ্ণলাভে উন্মুখ বিল্বমঙ্গল যে রাখাল বালকদের গান শুনছেন—"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব", সে গানটি বিল্বমঙ্গলের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।[৬১]

বৈষ্ণবীয় প্রভাব কেবলমাত্র ভাবে আবদ্ধ থাকেনি, গানেও তা সংক্রমিত হয়েছে। রাখাল বালকদের গানে প্রকারান্তরে গোষ্ঠ লীলার অভিনয় হয়েছে। *নিমাই সন্ন্যাস* নাটকে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত হয় যে গানে তা কীর্তনে তাল 'একতাল' এবং 'কামোদ-মিশ্র' রাগে গাওয়া। গানটি বৈষ্ণব পদাবলীর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের অনুরূপ। নট ও নটী এই গান পরিবেশন করছেন। উল্লেখ না থাকলেও বাদ্য বাজিয়েই যে নট-নটীর নৃত্য উপস্থাপিত হত তা আন্দাজ করা যায়। লীলাকীর্তনের আসরে পালা উপস্থাপনের পূর্বে যেমন গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয় তেমনি নাটকের শুরুতে এমন গৌরবিষয়ক পদ গাওয়া হয়েছে। কার্তনাঙ্গিক গানটি উল্লেখ্য—

ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিতপাবন পূরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর, কোথায় গৌরচাঁদ।।
নামের গুণে এস গুণধাম,
হৃদয় ভরি হেরি হরি, ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নাম ভরসা করি আশা, পূর্‌বে মনস্কাম,
আমার মন রসে না প্রেম জানে না,
বাঁধো পেতে প্রেমের ফাঁদ।
রাঙ্গাচরণ দুটি চাই,
মধুর গৌর নামটি যেন পাই,
রাই-কিশোরীর দোহাই, হরি তোমারই দোহাই,
আমার সংশয় প্রাণ সদাই দোলে,
দাও হে প্রেমসুধার স্বাদ।[৬২]

এরূপ গানের প্রাচুর্য রয়েছে তাঁর নাটকে। তাঁর নাটকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য কীর্তনাঙ্গীয়। প্রায়শই সংগীতের মাধ্যমে নাটকের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের ভাবাবেগ-প্রাধান নাটকে যে ভক্তির সন্ধন দিয়েছেন তার স্বরূপ নিরূপণ করে অধ্যাপক সৌমিত্র বসু বলেছেন—

লক্ষ করলে দেখা যাবে, গিরিশচন্দ্রদের মত নাট্যকারেরা পৌরাণিক নাটক লিখতে গিয়ে মূল প্রাচীন পুরাণের আশ্রয় নিচ্ছেন না, তাঁরা বেছে নিচ্ছেন আর্যগৌরবের সেই পর্বে রচিত কাহিনির বদলে মধ্যযুগের ভক্তি

আন্দোলনের সময়ে রচিত পুরাণগুলিকে। মূল পুরাণের চরিত্রদের দার্ঢ্য বা ওজস্বীতা নয়, তাঁদের কাছে এবং নিশ্চিতভাবে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে ভক্তির আবেগে সমর্পিত মানুষজনেরাই।[৬৩]

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব থেকে তখনও মুক্ত হতে পারেনি বাঙালি সমাজ। বিনোদনের ধারা মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনায় তখনও অবগাহন করে চলেছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি এর প্রমাণ।

মধ্যযুগীয় ভক্তিভাব দ্বারা গিরিশচন্দ্র কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬ খ্রি.) ও *নিমাই সন্ন্যাস* (১৮৯২ খ্রি.) নাটকে যে ভক্তির কথা পাওয়া যায় তাতে তাঁর চৈতন্যচরিত গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ প্রতিফলিত হয়। *চৈতন্যলীলা* নাটকে নিতাইয়ের হারে রে রে রে ওঠরে কানাই[৬৪] এবং কৃষ্ণলীলাছলে রাই কাল ভালোবাসে না।[৬৫] গানগুলি অথবা, নিমাইয়ের কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই[৬৬] —ইত্যাদি গানে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে চৈতন্যদেবকে দেখানো হয়েছে এবং এতে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। কীর্তনের মাধ্যমেও ঠিক একই উদ্দেশ্য (বিশেষত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে) পূরণ হতে দেখা যায়। *রূপ-সনাতন* (১৮৮৮ খ্রি.) নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত হয় একটি বৈষ্ণবদের সমবেত সংকীর্তন আমি আপনি চিকন-কালো।[৬৭] দিয়ে। সেখানে গানের শেষে ঘটনাক্রমের উল্লেখ রয়েছে— সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান[৬৮] যা পদাবলী কীর্তনের ঐতিহ্যবাহী রূপ। গিরিশচন্দ্র যে কীর্তনের পদ্ধতি অবলম্বন করছেন তা স্পষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে খোদ নাট্যকারের ভাষ্যে। এই নাটকের বেশিরভাগ অঙ্ক সমাপ্তিতে এবং নাটকের যবনিকা পতনের আগে গানের ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। তাঁর নাট্য উপস্থাপনের একটি বিশেষ রীতি হল গান দিয়ে নাটক সমাপন করা। ঠিক লীলাকীর্তনের মিলনান্তক গীতের অনুরূপ মিলন না হলেও, গানের সাহায্যে সমাপ্তি ঘোষণা করা বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপেরই বৈশিষ্ট্য।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তিভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। পৌরাণিক নাটককে তিনি যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সমকালের নাট্যকারদের অনেকেই। রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি আরও অনেকেই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই যেমন রাজকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক নাটকে ভক্তিভাবের মাত্রাজ্ঞান আয়ত্ত্বে রাখতে না পেরে পৌরাণিক যাত্রায় পরিণত করেছিলেন তাঁর অনেক নাটককে। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক

নাটকে পশ্চিমের ট্র্যাজিক ছোঁয়া দিয়েছিলেন *জনা* নাটকে। সেই সময়ে ভক্তির কলরোলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পৌরাণিক নাটকের আবহকে বিচলিত করেছিল এর আবেদন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তিনটি বিশেষ পুরাণনির্ভর নাটক যথা— *পাষাণী* (১৯০০ খ্রি.), *সীতা* (১৯০৮ খ্রি.) ও *ভীষ্ম* (১৯১৪ খ্রি.) লিখেছিলেন। তাঁর নাটকে যুক্তিনিষ্ঠ মনের প্রতিফলন হওয়ায়, তিনি গিরিশচন্দ্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন। যদিও নাটকে তিনি গতানুগতিক ধারায় সংগীতের ব্যবহার করেছিলেন, তবু দেশি ও বিদেশী সংগীতরীতির সংমিশ্রণে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল তাঁর হাত ধরে। তাঁর নাটকে ভক্তিভাব থেকেও মানব মনের চাওয়াপাওয়া বড় হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক নাটকে এই যুক্তিপূর্ণ মনের অস্তিত্ব থাকায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন সেই নিরিখে তৎকালীন দর্শকদের মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটক সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। কারণ ভক্তিভাবের জোয়ার বইয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে দর্শক নাটক দেখতে উপস্থিত হলেও তাঁরা আশাহত হয়েছেন। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টা নতুনভাবে বাংলা নাটকের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছিল। সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন পুরাণের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হচ্ছেন তখন পুরাণকে বাহ্যিক নয় বরং তার ভেতরের যুগোপযোগী সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে শম্ভু মিত্র নাটকে পৌরাণিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করলেও যুগের প্রচ্ছায়া তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যাই হোক এই আলোচনায় পৌরাণিক নাটক রচনায় কীর্তনাঙ্গিয় যাত্রা এবং কীর্তনের প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তা হয়তো পরিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

কীর্তন সংস্কৃতি ও মণিপুরি নাট্য

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মণিপুর। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরের অবস্থানগত দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একসময় মণিপুর এবং বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখনকার মতো কাঁটাতারের বাধা ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক আরও গভীর হয়। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলা, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও মথুরার বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারকেরা বারে বারে মণিপুরে যেতেন। এখানকার মানুষেরা অধিকাংশ 'মৈতৈ' সমাজের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বৈষ্ণব ভক্তি ধর্মান্দোলনের জোয়ার মণিপুর অঞ্চলকেও প্রভাবিত করেছিল। রাজা কিয়াম্বার

রাজত্বকালে (১৪৬৭ খ্রি.) মণিপুরে কীর্তন সংগীতের প্রচলন হয়। অষ্টাদশ শতকে রাজা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৬৪ খ্রি. রাজ্যভার গ্রহণ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্বে রাজানুকূল্যে বৈষ্ণব ধর্ম গৃহিত হলেও তা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনেও জায়গা করে নেয়। এখানকার সংস্কৃতি তথা ধর্মপালনের সঙ্গে নৃত্য ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। জীবনযাপনের প্রতিটি পর্ব অভিনয় করা হত প্রাচীন সংস্কৃতি 'লাইহারুবা' নৃত্যানুষ্ঠানে। এই নৃত্যানুষ্ঠানকে নাট্যানুষ্ঠান বলাই সঙ্গত। কারণ এতে অলংকৃত সৃজনশীল দেহভাষার মাধ্যমে ভাবের প্রকাশ করা হত। মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে যোগস্থাপন হল কীর্তনের। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক তপা সেনগুপ্ত তাঁর *মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রবহমানতা* প্রবন্ধে বলেছেন—

> শ্রীকৃষ্ণ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্য, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের আঙ্গিকে নানা লীলা (রাস, নটপালা, সংকীর্ত্তন ইত্যাদি) মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সনৃত্য কীর্ত্তন আঙ্গিকে পরিবেশিত হইতে থাকে। সুতরাং মণিপুরী নৃত্যের বিবর্তন যেমন সহজবোধ্য নয় ঠিক তেমনই পরম্পরাবিহীনও নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অধুনা মণিপুরী নৃত্যশৈলীরূপে পরিচিত শৈলীটি মূলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ ভিত্তিক একটি সম্প্রসারিত রূপ যাহাতে রহিয়াছে বিশিষ্ট মুদ্রারীতি, ছন্দ, তাল এবং বিশিষ্ট পদচালনার একটি অবিশ্বাস্য মিলন।[৬৯]

বাংলায় অষ্টাদশ শতক ও এর পূর্বে যে কীর্তনরীতি প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে মণিপুরি কীর্তনপদ্ধতির একটি বড় তফাৎ ছিল। এখানকার ঐতিহ্যবাহী নৃত্যাঙ্গ যুক্ত হওয়ায় কীর্তনের স্বরূপ অনেকাংশেই পরিবর্তীত হয়। মণিপুরি কীর্তনের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি উল্লেখ্য—

> আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সমাজ তথা নৃত্য, গীত ও নাট্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি, কিন্তু মণীপুরের মতো এমন 'unique manifestation' আর কোথাও দেখা যায়নি। নৃত্যের আঙ্গিক গঠনে এই ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য ভক্তির প্রকাশ যেন শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে ছড়িয়ে গেছে। অর্ধনিমীলিত চক্ষু, বক্ষের ও গ্রীবার সদা নতভাব, হাতের ভঙ্গির প্রকাশে যে সাবলীলতার আভাস, পদচালনায় নম্র, হালকা চলন-এ সবই ভক্তিভাব অক্ষুন্ন রাখার অভিপ্রায়ে গঠিত হয়।[৭০]

বাংলায় কীর্তন গীতপ্রধান। কিন্তু মণিপুরের কীর্তনপ্রণালী নৃত্যনির্ভর নাট্যসংরূপ হয়ে উঠেছে। গান এতে আছে ঠিকই কিন্তু শরীরের ভাষা নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নাট্যসংরূপ বাংলার কীর্তন দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজস্ব নৃত্যের মহিমায় উজ্জ্বল।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মণিপুরি নৃত্যে দু'টি ধারা যথা— 'নটসংকীর্তন' এবং 'রাসলীলা' নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নটসংকীর্তনে পুরুষ এবং রাসলীলা মন্দির প্রাঙ্গণে নারীদের অংশগ্রহণের রীতি চালু হয়েছিল। নটসংকীর্তনের আদিগুরু বলা হয় রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে মণিপুরে

এই ধরনের নাট্যরীতির প্রচলন হয়েছিল। কাষ্ঠনির্মিত খোল, করতাল ও মন্দিরা নিয়ে নৃত্যময় নটসংকীর্তন মোটেই বাংলার সংকীর্তন প্রণালীর অনুরূপ নয়। বাংলার কীর্তনের মতো বসে বা স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে নয়, দেহসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্য শরীরের সঙ্গে একাত্বতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই নটসংকীর্তনের গায়কী কিছুটা স্বতন্ত্র। চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের গায়কীর সঙ্গে এর সাযুজ্য রয়েছে। 'মৈতৈ' জীবনযাত্রার অঙ্গ ভক্তিভাবপুষ্ট নটসংকীর্তন। জন্ম থেকে মৃত্যু— সব ঘটনাতেই অবশ্যপালনীয় এই সংকীর্তন। রাধাকৃষ্ণ ও নিতাই-গৌরাঙ্গের যুগলমূর্তি পূজা নটসংকীর্তনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। অনুষ্ঠানে অধিবাস এবং গৌরচন্দ্রিকার প্রচলন আছে। এর পর *শ্রীমদ্ভাগবত* –এর রাসপঞ্চাধ্যায়ী, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলী গীত হয়। গানের রাগ ও তালে বঙ্গদেশের অনুসরণ থাকলেও নৃত্য করার সময় স্থানীয় 'লাইহারউবা', 'থাং তা' ইত্যাদি নৃত্য এর আঙ্গিক গঠনে সাহায্য করেছে। এই বিশেষ নৃত্যাঙ্গ 'চোলম তাণ্ডব' নামে পরিচিত। মঞ্চে উপস্থাপনার সময় এতে বিবিধ কসরত যুক্ত করা হয়। নটসংকীর্তনে শিল্পীদের পরনে থাকে সাদা ধুতি, চাদর ও মাথায় সাদা পাগড়ি। করতাল বাজানোর জন্য যাঁরা নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা এমন তাণ্ডব নৃত্য করেন না। কারণ, তাঁদের করতালের তালে তালে সৌন্দর্যমণ্ডিত নৃত্য ও গান করতে হয়। তাণ্ডব নৃত্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামায় তা করা সম্ভব নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই মণিপুরের মন্দিরে রাসলীলার প্রচলন হয়েছিল। এখানকার বিখ্যাত শ্রীশ্রীগোবিন্দজী মন্দিরে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ পেয়ে মহারাসের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। মহারাস, কুঞ্জরাস, বসন্তরাস এবং নিত্যরাস হল প্রধান রাস উৎসব। প্রধানত লাস্য নৃত্যের মাধ্যমে এতে রাধাকৃষ্ণের গভীরতম প্রেমভাব অঙ্কিত হয়। কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে মহারাস অনুষ্ঠিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর রাসপঞ্চাধ্যায়ী থেকে মহারাসের কাহিনি নেওয়া হয়েছে। আশ্বিন মাসের পূর্নিমা তিথিতে *গোবিন্দলীলামৃত* গ্রন্থ অনুসারে কুঞ্জরাস অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি রাসমণ্ডপের মাঝামাঝি স্থাপন করা হয় এবং তা কেন্দ্র করে নারীরা মঞ্জরীভাবে ভাবিত হয়ে রসলীলায় অংশগ্রহণ করেন। তবে কেউই রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন না। মঞ্জরীভাবের সাধনা গৌড়ীয় মতাদর্শেরই পরিণাম।

মণিপুরের আরেকটি জনপ্রিয় উৎসব বসন্তরাস। বসন্ত পূর্ণিমায় এই রাস উজ্জাপিত হয়। এতে *গীতগোবিন্দ*-এর অষ্টাপদীর প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পদসংকলন গ্রন্থ যেমন— *পদকল্পতরু, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ* ইত্যাদি থেকে পদাবলী কীর্তন নৃত্যসহকারে উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজা চন্দ্রকীর্তির রাজত্বকালে নিত্যরাসের প্রচলন হয়। অন্যান্য রাস অনুষ্ঠানের দিন ব্যতীত যে কোনো শুভদিনে নিত্যরাস আয়োজন করা যায়। নৃত্যের আধিক্য থাকায় একে 'নর্তনরাস'ও বলা হয়। পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা এতে প্রাধান্য পেয়েছে। উক্ত চার ধরনের রাসলীলা ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের কাহিনি নিয়ে 'উলুখরাস' এবং গোষ্ঠলীলা সম্বলিত 'গোপরাস' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের মাধ্যমে লীলা উপস্থাপিত হয়। বাংলায় প্রচলিত রাসলীলয় নৃত্যের আধিক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনির মধ্যে রাসলীলার প্রতি বিশেষ আদর থাকার পেছনে একটি বড় কারণ সেই অঞ্চলের মানুষের নৃত্যপিয়তা। রাসের কাহিনি একটি নৃত্যপ্রেমী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় নৃত্যের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মণিপুরের রাসলীলা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় উপস্থাপিত হয়। এই রাসলীলার দলটি ছিল স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত ও পরিচালিত। নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত এই নাট্যপদ্ধতি তখনকার দর্শকদের কাছে সমাদর পায়নি। 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্রে কটাক্ষের সঙ্গে এই উপস্থাপনের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে তা উল্লেখ্য—

আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।।
ললিতা বিশাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।।
ইন্দুরেখা সাজি সনে রাসলীলা করে।
পুরবে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।।
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
রসিকার রূপ গুণ নাহিক নাসিকা।।
গুণবতী-দিগের গুণ অতিউচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।।
বাদ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।।[৭১]

জয়দেবের গান থাকার দরুণ, সম্ভবত এই নাট্যানুষ্ঠানে বসন্তরাসের উপস্থাপন হয়েছিল। তখনকার মানুষ এই নৃত্যকে যাত্রার 'খ্যামটা নাচ' ভেবেছিলেন। এই ধরনের নৃত্য বা গীত দেখা বা শোনার অভ্যাস ছিল না বলেই তাণ্ডব নৃত্য 'লম্ফঝম্প' মনে করা হয়েছিল। 'রসিকার রূপ গুণ নাহিক নাসিকা' –এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, মণিপুরের মেয়েদের মুখের গড়ন এবং তাদের রূপসজ্জাও তৎকালীন মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি। বাহ্যিক সৌন্দর্যই বড় হয়ে উঠেছিল। অন্তরের সৌন্দর্য দেখার মতো মন পেতে এই শিল্পীদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যদিও দীনবন্ধু মিত্র ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে *কমলে কামিনী* নাটকের মণিপুরের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য কাছাড়ে রাজার 'পটমণ্ডপ' এর সম্মুখে রাসমণ্ডপ তৈরি করেছেন। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাসলীলা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি গানের ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে পদাবলী কীর্তনের ধরন পাওয়া যায়।

মণিপুরি নৃত্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গুরুত্বসহকারে দেখেছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এই নৃত্যের অভ্যাস শুরু করেন। তাঁর নাট্যপরিকল্পনায় এই নৃত্যপদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক চৈতালী ঘোষের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে এই নৃত্যের প্রসার ও প্রচার কল্পে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রচুর সংখ্যক সৃজনশীল নৃত্যনাট্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য ঐতিহ্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৭২]

তাঁর নাটকে এই নৃত্যপদ্ধতি ব্যবহারের ধরন সম্পর্কে নৃত্যশিল্পী শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> তবে রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যের আঙ্গিকটুকু নিয়েছেন, এই নৃত্যের সঙ্গে জড়িত ধর্মাবরণকে পরিত্যাগ করেছেন। মণিপুরি নৃত্যের আঙ্গিকের মধ্যেই যে অপূর্ব ভক্তি ও প্রেম নিবেদনের চিত্র অঙ্কিত হয়, তাকেই তিনি ব্যবহার করেছিলেন নটীর পূজার নটীর শেষ নৃত্য— "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো"।[৭৩]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই দেশীয় সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়েছেন। সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে দেশি-বিদেশী-লোকায়ত এসব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাঁর মন আটকে থাকেনি। যাত্রা নাট্যসংরূপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে। তিনি সর্বদা ভারতীয় সংগীতের এবং বিশেষভাবে লোকায়ত সংগীতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থেকেছেন। তবে ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংরূপকে সরাসরি গ্রহণ করেননি তিনি। অন্ততপক্ষে ধর্মের গোড়ামি বা ভক্তিভাবের প্রাবল্য থেকে তিনি দূরে থেকেছেন। মণিপুরের নাট্যসংরূপের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে মাধুর্য মণিপুরি নৃত্যে এসেছিল তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনুরক্ত হয়েছিলেন। এই অনুরাগ একান্ত আঙ্গিকগত হলেও নৃত্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবাঞ্ছা প্রথিত ছিল, তা কখনোই নর্তন থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। চিরন্তনের প্রতি উন্মুক্ত মন ছিল তাঁর। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কখনোই তাঁর কাছে পুরাতন হয়নি। এই দিক থেকে বিচার করলে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার কীর্তন প্রবাহ মণিপুরি নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের চিন্তন তথা নাট্য উপস্থাপনকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে বাদল সরকার তাঁর থার্ড থিয়েটারে মণিপুরি নৃত্য এবং নাটকে শরীরী ভাষার ব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত 'গৌড়ীয় নৃত্য' মণিপুরি নৃত্যের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত একটি নৃত্য সংরূপে পরিণত হয়েছে। ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় নৃত্যকে প্রাচীন বাংলার নাট্যরূপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর গবেষণাধর্মী একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে রাবীন্দ্রিক প্রভাবও খানিকটা যুক্ত করেছেন। সব মিলিয়ে মণিপুরের কীর্তনসংস্কৃতি বাংলা থেকে উৎপন্ন হলেও এক অনন্য নাট্যমাধ্যম রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এই ধারার নাট্য পুনরায় বাংলায় ফিরে আসে এক নতুন রূপে। ফলে বাংলার নাটকে ও নৃত্যে মণিপুরি কীর্তনের অভিঘাত অসামান্য।

কীর্তন ও অঙ্কীয়া নাট

প্রাচীন বঙ্গ ও বাংলাভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল অসমের। সর্বভারতীয় স্তরে যখন বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রসার চলছিল তখন বাংলার মতই অসমের মানুষও ভক্তিভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। প্রাচীন অসমে শৈব, শাক্ত ও বৌদ্ধ তন্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এরূপ ধর্মীয় আবহে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটানো সহজ ছিল না। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রি.) আবির্ভাব বৈষ্ণব ধর্মের অবস্থান্তর ঘটাতে সাহায্য করেছিল। তাঁর প্রবর্তীত 'নববৈষ্ণবধর্ম' বা 'নামধর্ম' অসমের মানুষকে আকৃষ্ট করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের থেকে অসমে প্রসারিত নববৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ ছিল ভিন্ন। বিষ্ণুর দুই অবতার অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ উভয়ই ছিলেন নামধর্মের উপাস্য দেবতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে কৃষ্ণভক্তির একাধিপত্য লক্ষ করা যায়। রাম বিষ্ণুর অবতার হলেও বাংলার মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই অন্তরের ভক্তিভাব অর্পণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

প্রাচীন অসমে শঙ্করদেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অঙ্কীয়া নাটের উৎপত্তি হয়েছিল। শঙ্করদেব নিজে একজন কবি, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর ও সুদক্ষ নর্তক ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি অসমের নানা স্থানে 'সত্র' (বৈষ্ণবীয় মঠ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্রগুলিতে নিয়মিত নামগুণগান, শ্রবণ-কীর্তন ও ঈশ্বরীয় বিষয়ের আলোচনা চলত। নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে সংগীত উপস্থাপনের আখড়া ছিল সত্রগুলি। শঙ্করদেব এবং তাঁর শিষ্য মাধবদেব বেশ কয়েকটি নৃত্য-নাট্য রচনা করেছিলেন যা অঙ্কীয়া নাট নামে পরিচিত। শঙ্করদেব ব্রজাবলী (অসমীয় ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণ) ভাষায় রচিত মোট ছয়টি নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলি হল— *কালিদমন, পত্নীপ্রসাদ, কেলিগোপাল, রুক্মীণীহরণ, পারিজাতহরণ* ও *রামবিজয়*। *রামবিজয়* (শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত) নাটক ব্যতীত পাঁচটি নাটকের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেব গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। এগুলি হল— *দধিমথন, চোরধরা, পিপরাগুচোয়া, ভূমি লোটোয়া, ভোজন ব্যবহার, রাস ঝুমুর* ইত্যাদি।

অঙ্কিয়া নাটের আঙ্গিক গঠনে শঙ্করদেব ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের পূর্বরঙ্গ, নান্দীশ্লোক, প্ররোচনা, প্রস্তাবনা, শ্লোক ইত্যাদি অঙ্কীয়া নাটে দেখা যায়। তবে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নাটক রচনার সময় সম্পূর্ণরূপে *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারী থাকেননি। এতে সংলাপের তুলনায় গীত-নৃত্য-বাদ্য ও অভিনয়ের ভূমিকা অধিক। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁদের নাটকগুলিতে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের প্রভাব প্রখর। সংরূপের বিচারে তা নাটগীত দ্বারা প্রভাবিত। নৃত্যের মাধ্যমে শরীরীভাষা সংলাপকে ছাপিয়ে যায়। শঙ্করদেবের আবির্ভাবের পূর্বে অসমে দেবদাসী ও ওজাপালি ('ওঝা' হল পাঁচালির অধিকারী এবং 'পালি' ছিল দোহারের নামান্তর) নৃত্যের প্রচলন ছিল। উক্ত দুই নৃত্যকলার সমন্বিত রূপ দেখা যায় অঙ্কিয়া নাটে। এছাড়া অঙ্কিয়া নাটে পয়ার, লয়যুক্ত গদ্য, ব্রজবুলি বা ব্রজাবুলি ভাষার ব্যবহার এবং সমস্ত উপস্থাপনায় সূত্রধরের একাধিপত্য *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারী নয়। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দর্শকদের কথা ভেবে অঙ্কিয়া নাটের আঙ্গিক গঠিত হয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* এবং সংস্কৃত ভাষা সাধারণ দর্শকমনকে কখনোই তুষ্ট করতে পারত না। এক্ষেত্রে দেশজ নাট্য আঙ্গিকের সংমিশ্রণ আবশ্যক ছিল।

অঙ্কিয়া নাটে চরিত্রেরা মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আগে রঙ্গমঞ্চের সামনের দুই ধারে দু'জন ব্যক্তি নতুন কাপড় পর্দার মতো লম্বাভাবে ধরে রাখেন। এছাড়া প্রবেশের মুখে দু'দিকে মশাল প্রজ্বলিত থাকে। একে অগ্নিগিড় বলা হয়। এর মধ্য দিয়ে সূত্রধর ও নাটকের চরিত্রেরা মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং সেই সঙ্গে আড়াল করা কাপড়টিও সরিয়ে নেওয়া হয়। সূত্রধর মঞ্চে প্রবেশ করে নৃত্য-গীত সহযোগে বাদ্যের তালে তালে সমস্ত রীতি-নীতি পালন করেন। সূত্রধরের কাজ শেষ হলে তিনি সংগীতকার ও বাদ্যকরদের সঙ্গে যুক্ত হন। নাটকের প্রয়োজনে পুনরায় নিজ অবস্থান বদল করে মঞ্চে সূত্রধরের ভূমিকায় নিযুক্ত হন। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অঙ্কীয়া নাট পরিবেশনায় তিনি মঞ্চ ছেড়ে যান না বা নেপথ্যে থাকেন না। চরিত্রানুগ পোশাক পরিধান করে নাটকের চরিত্রেরা মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং নৃত্য-নাট্যে আসর মাতিয়ে রাখেন। সাধারণত খোল এবং বড় করতাল বাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাষ্ঠ নির্মিত খোলগুলি বঙ্গে প্রচলিত মৃদঙ্গের তুলনায় কিছুটা আলাদা হয়।

বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব অঙ্কিয়া নাটের অনুরূপ লীলাভিনয় করেছিলেন। তাঁর *রুক্মীণীহরণ* নাটক অভিনয়ের কথা পূর্বেই (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আলোচিত হয়েছে। এখানে অসম সম্পর্কিত দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক, শ্রীচৈতন্যদেবের অসমে ভ্রমণ। দুই, পুরীতে শঙ্করদেব এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ। ভক্তিভাব বিনিময়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন স্থাপনে এই দুই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলায় যেমন লীলাজাতীয় নাট্য প্রচলিত ছিল ঠিক অনুরূপ নাট্যপদ্ধতি অসমে প্রচলন করেন। যদিও একথা ঠিক যে তিনি নাটকগুলি অসমে বসে লেখেননি। অসম থেকে বিতাড়িত হলে তিনি কোচবিহার অঞ্চলে কামতা রাজভ্রাতৃদ্বয় নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের আশ্রয়ে অঙ্কিয়া নাটগুলি লিখেছিলেন। বাংলায় প্রচলিত নাটগীত এবং লীলানাটক সংরূপের আশ্রয় ছিল কৃষ্ণকথা। এদিক দিয়ে সংরূপগুলির প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। পদাবলী কীর্তনের জনপ্রিয়তার কথাও মনে রাখতে হবে। বিশেষত গীত-নৃত্য-বাদ্য সহকারে অভিনয় উপস্থাপন উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে বাংলার নাট্য-উপস্থাপনায় সংগীতের প্রাধান্য অসমের তুলনায় অধিক। লীলাকীর্তনে পদাবলী কীর্তনের গুরুত্ব বেশি থাকে। অর্থাৎ গান মুখ্য, নৃত্য ও বাদ্য গৌণ। অন্যদিকে মণিপুরি নাট্যের মতই অসমের অঙ্কীয়া নাটেও বাদ্য ও নৃত্য যেন সংগীতকে ছাপিয়ে যায়। সব মিলিয়ে বলা

যায় পূর্বভারতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের উপস্থাপনভঙ্গি হিসেবে নাটক সংরূপের অস্তিত্ব স্থান-কালের বৈশিষ্ট্যানুসারে বৈচিত্র্যে ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

৫.২ বাংলা নাটকের বিবর্তন ও প্রতিনিধিস্থানীয় তিন জন আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্বের অবস্থান

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন নাট্যসংরূপের জন্ম এবং বিকাশে কীর্তনের গুরুত্ব ছিল অসামান্য। কীর্তন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাটকের ধারা নিয়ন্ত্রনে অংশগ্রহণ করেছিল। নাটকের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক জোরালো হওয়ায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংগীতপ্রধান নাট্যসংরূপ কীর্তনের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়া থেকেই নাটকের কলাকৌশলে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যকলার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কম হয়নি। এই কর্মে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নিজস্বতা বজায় রেখে করেছিলেন ঐতিহ্যের মৌলিক অনুসরণ। এঁদের মধ্যে দু'জন নাট্যকারের নাট্যকর্ম ও তার স্বরূপ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে উত্থাপিত হবে। এই পর্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাদল সরকারের নাট্যভাবনার স্বরূপ নির্ধারণ করা হবে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার আলোকে। তাঁদের চিন্তন ও নাট্যপদ্ধতিতে দেশীয় ও বিদেশী নাট্যকলায় পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও, বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতির প্রতি বাড়তি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় হয়তো এখানে কীর্তনের প্রসঙ্গ সরাসরি আসবে না। কিন্তু কীর্তনের মধ্যে প্রথিত ঐতিহ্যবাহী নাটকের গুণপনা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে (এমনকি এখনও) দেশীয় নাটক বলতে যাত্রাকেই বোঝানো হত। যাত্রার আঙ্গিক বিকাশে কীর্তন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাত্রা সংরূপের অনুসরণ প্রকারান্তরে লীলানাটক ও কীর্তনের সংরূপ সন্ধানেরই সামিল।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) সর্বদা ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে তাঁর ঐতিহ্যের অনুসরণ কখনোই ধর্ম ও কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকেনি। তবে একথা ঠিক যে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা অনেক সময়েই হয়তো বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যকে স্পর্শ করেছিল। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও বিশ্বসংসারের আশ্চর্য সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে

তাঁর সাহিত্যে। কিন্তু ধর্মের অন্ধ অনুসরণ তিনি করেননি। সম্পূর্ণ নির্মোহ মন নিয়ে সাহিত্যসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য হয়েছে কালজয়ী, চিরন্তন। বাংলার হাজার বছরের নাট্যসংস্কৃতি তাঁর লেখনীর স্পর্শে নতুন মাত্রা পায়। সংলাপের একাধিপত্য, দৃশ্যবিভাজন, গীতহীনতা, পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বের গঠন ইত্যাদি দ্বারা তাঁর নাটক গণ্ডিবদ্ধ হয়নি। তাঁর নাটকে অপ্রতুল গানের ব্যবহার লীলাকীর্তন ও কীর্তনাঙ্গীয় যাত্রার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র নাটকের গানগুলিই নয়, স্বতন্ত্র গানের ক্ষেত্রেও আছে কীর্তনের প্রভাব। প্রখ্যাত কীর্তনীয়া সুমন ভট্টাচার্য্য *রবীন্দ্রসঙ্গীত; রাগসুর নির্দেশিকা* গ্রন্থে কীর্তনের আঙ্গিকে গাওয়া ১৫১ টি রবীন্দ্রসংগীতের তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা ছাড়াও তিনি অনেক জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করে এর সঙ্গে কীর্তনের যোগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও কীর্তনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ গুরু ধরে কীর্তন না শিখলেও কীর্তনশেখা-কীর্তনীয়ার গুরু অবশ্যই হতে পারেন কারণ বিভিন্ন রাগের মধ্যে কীর্তনাঙ্গ সুরমাধুর্য কেমন করে আনতে হবে রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করে (সে পরিশ্রম সুর ভাবনা স্তরের অবশ্যই) তার কীর্তনাঙ্গ গানগুলির সুর যোজনা করেছেন।[৭৪]

কথাগুলো অত্যুক্তির মতো শোনালেও সত্যতা যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। তবে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় ভাবিত হয়ে এই সুরারোপ যে ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীর্তনকে কেবলমাত্র ধর্মের বিষয় রূপে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> বৈষ্ণব-পদাবলীর রস গ্রহণ করতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই, কৃষ্ণকে অবতার অথবা অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এমনকি নাস্তিক হইলেও দোষ নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালো-লাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ইপ্সা বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেরণার উৎস। বৈষ্ণব-কবিতার এই ধর্মাতিশায়ী উৎকর্ষের দিকে রবীন্দ্রনাথই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতা বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণব-পদাবলী তাহাও তিনিই নির্দেশ করিয়াছিলেন।[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব সাহিত্যে কতটা বিভোর ছিলেন তা *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* (১৮৮৪ খ্রি.) থেকে অনুমান করা যায়। *জীবনস্মৃতি*-তে তিনি লিখেছেন—

> গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচের যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল।... একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন আকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড়

> হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।[৭৬]

রবীন্দ্রনাথ এই পদাবলী এক বন্ধুকে দেখালে তিনি প্রাচীন পদকর্তার বৈষ্ণব পদ বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। সত্যিই তো, এই গানের মধ্যে এমন বিশুদ্ধ প্রেমের আভাস রয়েছে যা পদাবলী কীর্তন করারই যোগ্য। এই গ্রন্থেরই গান শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা[৭৭], সতিমির রজনী[৭৮], বাজাও রে মোহন বাঁশি[৭৯] যেন বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাভিসারের কল্পনায় রচিত হয়েছে। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* গ্রন্থে এমন অনেক গান রয়েছে যা রাগরাগিণী সহ গীত হলে পদাবলী কীর্তনের মতই মনে হয়। তাছাড়া তিনি বিশিষ্ট পদকর্তাদের পদে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের জনপ্রিয় পদ 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় লিখেছেন—

> শ্যামনাম রূপ নিল শব্দের ধ্বনিতে।
> বাহ্যেন্দ্রিয় ভেদ করি অন্তর-ইন্দ্রিয়ে মরি
> স্মৃতির বেদনা হয়ে লাগিল রণিতে।[৮০]

বৈষ্ণব পদাবলীকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই পাঠ্যরূপে দেখেননি। তাঁর কাছে সংগীত ও গীতিকাব্যের আকারে তা গৃহীত হয়েছে। তিনি বাংলা সংগীতের প্রাচীন রূপগুলির মধ্যে কীর্তনকে সর্বদা বিশেষ স্থান দিয়েছেন। কাব্য ও গানের মিলিত রূপ হিসেবে দেখেছেন। এসম্পর্কিত তাঁর মতটি উল্লেখ্য—

> বাংলা সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।[৮১]

বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গীতের আধিপত্য প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। সংগীতপ্রধান ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংরূপের ধারা আপন করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান রূপে কীর্তনের অস্তিত্বের বাইরেও এর নাট্যরস নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে (১৯৩৬ খ্রি.) তিনি বলেছেন—

> কীর্তনসঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহমা অধিকার করেছে। কীর্তনসঙ্গীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।[৮২]

গীতিধর্মী নাটকের সংরূপ কীর্তনে বিদ্যমান আছে বলে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। নাট্য রচনার সময় তাঁর অন্তরে যে কীর্তনের অনুরণন ঘটেনি তা কে বলতে পারে? অন্যত্র হিন্দুস্থানী সংগীতের সঙ্গে তুলনা করে কীর্তনের নাট্যরসের স্ফীতি নির্দেশ করেছে। দিলীপকুমার রায়কে তিনি লিখছেন—

> বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে দিলে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান। স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই।[৮৩]

তিনি যে পালাকীর্তনের নাট্যবৈশিষ্ট্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন তা এই বক্তব্যে স্পষ্ট। নাটক রচনায় তাঁর সংগীত আধিক্য বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকেই সমর্থন করে।

রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনা শুরু করছেন তখন গান হয়ে উঠছে তাঁর নাটকের ভরকেন্দ্র। কেবলমাত্র তাঁর গীতিনাট্যগুলিই নয়, গানের আধিক্য অন্যান্য নাটকগুলিতেও রয়েছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় এসম্পর্কে *বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব* প্রবন্ধে বলেছেন—

> বাঙালীর নিজস্ব স্বভাবের মধ্যেই যে সঙ্গীত কাজ করেছে দীর্ঘকাল ধরে, যা কীর্তন ও বাউল গানের মধ্য দিয়ে নাটকীয় রূপ পেয়েছে, তার ঐতিহ্য যেন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন তাঁর নাট্যভাবনায়।[৮৪]

অনেক সাহিত্য সমালোচক, গীতিনির্ভরতার জন্য তাঁর নাটকের সঙ্গে যাত্রা গানের তুলনাও করেছেন। তবে সংগীতের কথাবস্তু, রাগ, তাল এবং বিশেষ করে ভাবের গভীরতায় বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের ছোঁয়া যে সর্বদাই ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

> শৈশবেই এমন করিয়ে বৈষ্ণব পদাবলী যিনি পড়িয়াছিলেন, উত্তর জীবনের কাব্যে, ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদের স্পর্শ লাগিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ-পদগুলির মধ্যে কবি যে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, কল্পনার যে মুক্তি, যে বিচিত্র চিত্রসৃষ্টি, যে নিবিড় ভাবোপলব্ধি লক্ষ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিশোর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল; বৈষ্ণব-কবিতার ভাষার সহজ ললিতগতি এবং গীতিমাধুর্যও তাঁহার কবিপ্রাণে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল—উত্তর-জীবনে কখনও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই, এবং লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে কবির সমগ্র কবিজীবনে এই বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাব তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।[৮৫]

তবে তিনি কখনোই তাঁর নাট্যে সরাসরি কীর্তন বা যাত্রার অনুকরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন— অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীকরণ নয়।[৮৬] তাই যাত্রা হোক বা বৈষ্ণব পদাবলীই হোক, অনুকরণ

তার ধাতে নেই। তবে তিনি প্রাচীন সংগীত ও নাট্যধারাকে অন্তর থেকে স্বীকার করেছিলেন। এই স্বীকৃতি চিরকাল তাঁর সমসাময়িক নাট্যব্যক্তিদের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত সাহিত্য সাধনায় দেশের ঋদ্ধ সংস্কৃতির কথা কমজনই ভেবেছিলেন ও ভালোবাসার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন। যাত্রা সংরূপটিকে কম সমালোচিত হতে হয়নি। বলাই বাহুল্য এই সমালোচনা অসুন্দরের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থেকেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাত্রাগানে সুন্দরকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সে নির্মোহ দৃষ্টি তাঁর ছিল বলেই, যাত্রার সাবলীল অভিনয়-উপযোগিতা তিনি দেখেছিলেন। কীর্তনের মতই যাত্রাকেও ভালোবেসেছেন। *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।[৮৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক নাট্যকারদের ভাবনায় অভিনেতা ও দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেকার সহজ সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। যাত্রার অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যেকার সম্পর্ক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রেই এসেছে। লীলাকীর্তনে মূলগায়েন এবং ভক্তদের সমন্বিত উপস্থাপনের কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রবীন্দ্রমানসে এই সম্পর্ক সাদরে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মঞ্চে দৃশ্যপটের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। *বাল্মীকিপ্রতিভা* (১৮৮১ খ্রি.) অভিনয়ের সময় নাট্যমঞ্চকে সমস্ত রকমের বাস্তবানুগ দৃশ্যবস্তু দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বনভূমির দৃশ্যপট সাজাতে গাছের ডালে জোনাকি পোকা আটকে দেওয়া হয়েছিল। দৃশ্যপটের ব্যবহারে নাটকের রস যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা তিনি পরবর্তীকালে বুঝতে পারেন। স্বল্প উপকরণের মাধ্যমে বস্তুসীমানা থেকে নাট্যশিল্প মুক্তির অনুপ্রেরণা তিনি দেশীয় নাট্যাঙ্গিক যাত্রা থেকে নিয়েছেন। নাটক সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বারম্বার এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এরূপ যে উপায়ে দর্শকদের

মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলা তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।[৮৮]

এই প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যত্র দৃশ্যপটের বিরোধিতা এবং কল্পনাশক্তির আরাধনা করতে দেখা গেছে তাঁকে। *তপতী* নাটকের ভূমিকায় (১৯ ভাদ্র ১৩৩৬) তিনি লিখছেন—

নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থানু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।[৮৯]

তিনি যে সময় নাটক লিখছেন ও মঞ্চায়িত করছেন, সেই সময় দৃশ্যপট ছাড়া নাটকের বাস্তবানুগ উপস্থাপনের কথা ভাবাই যায় না। পরবর্তীকালের যাত্রাকেও এই প্রথা আবিষ্ট করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাদৃত হয়েছে দৃশ্যপটহীন যাত্রার আসর, যা প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে প্রাপ্ত। তাঁর সমসাময়িক নাটকে দৃশ্যপটের জৌলুস এতটাই থাকত যে অভিনয় হয়ে উঠত গৌণ। দৃশ্যপটের ওঠানো নামামো তাঁর কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছে।

দৃশ্যপটের ব্যবহার তাঁর কাছে বরণীয় মনে হয়নি আরেকটি কারণে। দর্শকের স্মৃতিতে দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব স্থায়ীত্ব পেত। নাটকের ভাব তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা মঞ্চায়িত নাটকের বিবরণ পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের *ঘরোয়া* গ্রন্থে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু নাটকের দৃশ্যপট ও রূপসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। *শারদোৎসব* (১৯০৮ খ্রি.) নাটকে দৃশ্যপট ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

একবার 'শারদোৎসবে' তো ঐ রকম করে স্টেজ সাজানো হল, পিছনে দেওয়া হল নীল বনাতটি, তখন থেকে ঐ নীল বনাতই টানিয়ে দেওয়া হত স্টেজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। প্রকাণ্ড একটা শোলার ছত্র ছিল বেশ ঝিক্‌ঝিকে আসামের অভ্র দেওয়া। সেইটিই এক পাশে টানিয়া দেওয়ালুম। বেশ নীল রঙের আকাশের গায়ে ছত্রের রঙটি চমৎকার দেখাতে লাগল। রবিকাকার তেমন পছন্দ হল না; বললেন, রাজচ্ছত্র কেন আবার। বেশ পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে স্টেজ থাকবে। বলে সেটিকে খুলে দিলেন।[৯০]

পরে যদিও নীল বনাতের উপর রাঙতা কেটে রূপোলি চাঁদ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই বাস্তবানুগ চোখ ধাঁধানো দৃশ্যপট ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মুক্তধারা* নাটকে দৃশ্যের উল্লেখ না থাকায় যে নাট্যবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা পালাকীর্তনের সমগোত্রীয়। পালাকীর্তনেও সেভাবে দৃশ্যের বিভাজন দেখা যায় না। এক্ষেত্রে যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্যও মিলে যায়। তাই যাত্রার মঞ্চ তাঁর কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটক লীলাকীর্তনেও দৃশ্যপটের ব্যবহার দেখা যায় না। দর্শকদের কল্পনাশক্তি সেই আবহ নিজ মানসপটে চিত্রিত করতে সক্ষম। নাটক দেখতে আসা দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে তিনি কখনোই খর্ব করতে চাননি। তাঁর মতটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপোসের সম্বন্ধ।[৯১]

আসরে একজন কীর্তনীয়া যখন রাধাকৃষ্ণলীলার রস আস্বাদন করান, তখন কল্পনার উপর নির্ভর করেই ভক্তবৃন্দ স্থান-কালের পরিসীমা লঙ্ঘন করতে পারে। কীর্তনের আসরে থেকেই ভক্তবৃন্দ কখনো নদিয়ায় শচীমাতার প্রাঙ্গণ তো কখনো বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে রাধকৃষ্ণ, নিতাই-গৌড়াঙ্গ বিষয়ক লীলারস আস্বাদন করেন। কল্পনাশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে তা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাটকেও রয়েছে অসামান্য কল্পনাবিলাসের অবসর। দর্শকদের উপর সেই ভরসা রেখেছিলেন তিনি। কারণ তিনি মনে করেন—

> ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট পরিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।[৯২]

দর্শক ও অভিনেতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সমর্থন আদতে ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যেরই বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমের থিয়েটারে সে সুযোগ নেই। সেখানে দর্শকের অবস্থান অন্ধকারে। ভাবের আদান-প্রদান, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের পথ একেবারে বন্ধ। 'দর্শক বুঝে নেবে' —এই বিশ্বাস নিয়ে অভিনেতা মঞ্চে আসেন না। রবীন্দ্রনাথ মন থেকে এই প্রথা মেনে নিতে পারেননি। তাই মুখ ফিরিয়েছেন দেশীয়

ঐতিহ্যের দিকে। এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে। বাংলা নাটকের এক সুবর্ণ ইতিহাস যে আছে এবং তা ব্যবহার করে নাটক লেখা ও মঞ্চায়ন করা সম্ভব তা তিনি হাতে কলমে করে দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিতে রয়েছে যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয়। তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ খ্রি.) রচিত নাটকে তিনি সংগীতের সংযোজন যেমন করেছেন তেমনি তাঁর অভিনয়ে হাতেখড়িও দাদার নাটকে। *জীবনস্মৃতি*-তে তিনি লিখছেন—

> নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।[৯৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সরোজিনী* (১৮৭৫ খ্রি.) যাত্রাপালার ঢঙে রচিত। ঠাকুরবাড়িতে পেশাদার যাত্রাওয়ালারা তা অভিনয় করেন। ঠাকুরবাড়িতে মাঝে মাঝে গভীর রাত পর্যন্ত যে যাত্রাপালার আয়োজন হত, তাতে শিশুদের প্রবেশাধিকার থাকত না। তবে বড়দের অনুমতি পেয়ে একবার *মহাভারত*-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত সেই সময়ের জনপ্রিয় *নলদময়ন্তী* পালা দেখার সুযোগ হয়েছিল শিশু রবীন্দ্রনাথের। *ছেলেবেলা*-য় সেই স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেছেন—

> চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত।... তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।... সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোষ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।[৯৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রাপালা রচনা করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর নাটকে যাত্রার অনেক বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপক তপন বাগচী তাঁর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> যাত্রা তথা বাঙালির নিজস্ব অভিনয়-চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ লালন করেছেন নাটকের মাধ্যমে।[৯৫]

যাত্রার বিবেক বা নিয়তির অনুরূপ চরিত্র রবীন্দ্রনাটকেও রয়েছে। *চিরকুমারসভা* (১৯০৭ খ্রি.) নাটকের 'অক্ষয়', *শারদোৎসব*-এর (১৯০৮ খ্রি.) 'ঠাকুরদাদা', *রাজা*-র (১৯১০ খ্রি.) 'বাউল' ও 'পাগল', *অচলায়তন*-এর (১৯১২ খ্রি.) 'পঞ্চক', *ডাকঘর*-এর (১৯১২ খ্রি.) 'দাদাঠাকুর', *ফাল্গুনী*-র (১৯১৬ খ্রি.)

অন্ধবাউল, *মুক্তধারা*-র (১৯২৩ খ্রি.) ‘ধনঞ্জয়’, *রক্তকরবী*-র (১৯২৬ খ্রি.) ‘বিশুপাগল’, *তপতী*-র (১৯৩০ খ্রি.) ‘বিপাশা’, *বিসর্জন*-এর (১৮৯০ খ্রি.) ‘অপর্ণা’, *রথের রশি*-র (১৯৩২ খ্রি.) কবি ও সন্ন্যাসী ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে যাত্রার বিবেকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যাত্রাগানের (আধুনিক আঙ্গিকে) একটি জরুরি উপাদান ‘বিবেকের গান’। কেন্দ্রীয় নাট্যঘটনার বহির্ভূত, কিছুটা রূপক ধাঁচের চরিত্র হল ‘বিবেক’। মুখ্য চরিত্রদের সমালোচনা, ভবিষ্যদ্বাণী অথবা নৈতিক উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি কারণে বিবেক চরিত্রের প্রবর্তন করা হয়। রবীন্দ্রনাটকের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই বিবেক চরিত্র। তবে যাত্রার বিবেক এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বিবেকজাতীয় চরিত্র পুরোপুরি এক নয়। তিনি নিজের মতো করে চরিত্রগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যত্নভরে সাজিয়েছেন। *শারদোৎসব*-এর ঠাকুরদাকে বালকদের খেলার সঙ্গী রূপে পাওয়া যায়। নাটকের অপরিহার্য চরিত্র হয়ে ওঠেন ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর, অন্ধ বাউল, বিশুপাগলের মতো অনেক বিবেক জাতীয় চরিত্র।

যাত্রাপালার ‘উক্তি-গীত’-এর অনুপম ব্যবহার রবীন্দ্রনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা যায়। যাত্রাগানে অভিনেয় সংলাপ যখন আবেগের চরম পর্যায়ে ওঠে অথবা সংলাপের ভাবরসকে যখন কথ্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন চরিত্রেরা সংলাপ বলতে বলতে গান গেয়ে ওঠে। এই গান ‘উক্তি-গীত’ নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাটকে এরূপ গানের বিপুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাটকে বালক দলের গান যাত্রার ‘গণের গান’-কেই মনে করিয়ে দেয়। বালক দলের ধারণায় যাত্রার গোষ্ঠীবদ্ধ চরিত্রের আভাস রয়েছে।

রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে রূপকথার প্রচ্ছন্ন আদল লক্ষ করা যায়। *শারদোৎসব* নাটকে রাজার ছদ্মবেশ ধারণ, নিরীহ উপানন্দের রাজ আনুকূল্য, লক্ষেশ্বরের বেতসিনী নদীর ধারে গজমতির কৌটো লুকিয়ে রাখা ইত্যাদির মধ্যে যে সারল্য তা রূপকথাধর্মী। এর মধ্যে যে সাদা-কালোর, শুভ-অশুভের বিভাজন তা বাংলার মৌখিক সাহিত্য ও উপস্থাপিত নাট্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এতে তীব্র বিরোধীতা প্রাধান্য পায়নি। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলময় ভাবনা দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ভারতীয় মিলনান্তক নাট্যকলার বৈশিষ্ট্যকেই মনে করিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, লীলাকীর্তনেও পালা সমাপন করা হয় মিলনান্তক গীত দিয়ে। মঙ্গলময় চিন্তার আধার কীর্তন।

রবীন্দ্রনাটকে একধরনের শিথিলতা ও হেঁয়ালিভাব রয়েছে। বিপদাপন্ন চরিত্রেরা যখন কোনো বোদ্ধা ব্যক্তির (রাজা, বিবেক জাতীয় চরিত্র ইত্যাদি) কাছে আসে তখন তাঁকে হেঁয়ালির মাধ্যমে উত্তর দিতে দেখা যায়। *রাজা* নাটকে বেশিরভাগ সময়েই রাজাকে দেখা যায় না। রাজার সন্ধান করা হলে ঠাকুরদা হেঁয়ালি করে বলেন— সে যে আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে![৯৬] এরপরেই ঠাকুরদা গান করেন— আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।[৯৭] ভাবকে প্রকাশ করতে সংগীতের আয়োজন এর (ভাবের) গভীরতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই পদ্ধতি বাংলা নাট্য ঐতিহ্যেরই লক্ষণ। লীলাকীর্তন কিংবা মনসার ভাসানগান, এই পদ্ধতিতে গানের ব্যবহার দুর্লখ্য নয়। প্রণয়মূলক গাঁথা এবং অন্যান্য সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন কারণে বিপদে পড়ে চরিত্রেরা গান করে। বাঘের মুখে পড়ে (রূপবান) অথবা সতীন ভেবে চণ্ডীর কাছে দুঃখের বারোমাস্যা গানের মাধ্যমে শোনানোর চল বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের মধ্যেই পড়ে। এই ঐতিহ্যকেই যেন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাটকে রয়েছে এক সত্যের অনুসন্ধান। যেমন, *শারদোৎসব*-এ কর্মের মধ্য দিয়ে আনন্দের, *রাজা* নাটকে সুন্দরের, ফাল্গুনী-তে যৌবনের, *অচলায়তন*-এ কুসংস্কারের থেকে মুক্তিসাধনের, *রক্তকরবী*-তে স্বাধীনতার উপলব্ধি ও অনুসন্ধান রয়েছে। লীলাকীর্তনের আসরে বসে একজন ভক্ত কেবল ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন না, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধি এবং মানুষের জয়গানে জীবনের সত্যকে খুঁজে পান।

রবীন্দ্রনাটকে 'প্রকৃতি' এক অনন্য ভূমিকায় এসে উপস্থিত হয়। তাঁর ঋতুনাট্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে ঋতু ও প্রকৃতি। তাঁর *ফাল্গুনী* নাটকে বেণুবনের গান, পাখির নীড়ের গান, ফুলন্ত গাছের গান, শীতের বিদায় গান, উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান ইত্যাদি গানের মাধ্যমে জীবন্ত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কীর্তনে সুক ও সারীর দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে তেমনি রাধার পায়ের নূপুর, হাতের বালা, গলার মালা, গাছের ফুল, বাঁশি, কলসী ইত্যাদির কথা বলে ওঠা প্রসঙ্গ রয়েছে। কীর্তনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের এই ভাব এক সূত্রে মেলানো যায়।

'পথ' রবীন্দ্রনাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। *মুক্তধারা* সূচিত হয় 'পথ' নাম দিয়েই। *রাজা* নাটকে অবশ্যই ঘর আছে, তবে এক অন্ধকার ঘর। এই ঘরে রাজা ও রাণীর

কথোপকথন অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্যহীন বেষ্টনমুক্ত বাইরের জগতটাকে তুলে ধরা হয়েছে। রাণী সুদর্শনার অন্তরের সৌন্দর্যের উপলব্ধি হলে তিনি রাজাকে খুঁজতে পথে বের হন। কাঞ্চীরাজ রাজত্ব ফিরিয়ে দিতে সেই একই পথে নামেন। সুদর্শনার পাগলিনী হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে বেড়িয়ে আসার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল কুল-মান বিসর্জিতা রাধিকার অস্তিত্বই লুকিয়ে আছে। *শারদোৎসব* নাটকে রাজা তাঁর রাজ্যপাট ছেড়ে পথে বালকদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন। সমস্ত কাহিনি পরিবেশিত হয় খোলা আকাশের নীচে। *ডাকঘর*-এ পথের প্রতি অমলের আকর্ষণ নাটকের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের পথের ধারণা সম্পর্কিত মতামত প্রকাশে কীর্তনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

> কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টিতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তাঘাটে। বাংলা কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রসস্ত জায়গা হল। এটা বাংলাদেশের ভূমিপ্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু নদী এক সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার জল তৈরি করে দিয়েছে।[৯৮]

শুধুমাত্র কীর্তনই নয় বাংলার মাঠঘাটের গন্ধ রয়েছে যাত্রাগানেও। অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রাগানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের তুলনা করে এই দিকগুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *ফাল্গুনী* নাটক সম্পর্কিত তাঁর মতটি উল্লেখ্য—

> প্রকৃতির মধ্যে যে নিত্যপ্রবাহ, মানুষের জীবনেও তারই অন্তহীন যাত্রা, আর তাই এই নাটকে পথই প্রধান পটভূমি, ঘাট ও মাঠ তার বিভিন্ন রূপ মাত্র। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রায় ঘটনাস্থলের এই জাতীয় নির্বিশেষ রূপ ছিল যার ফলে সহজেই অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ ছাড়াই পালার একটি ঘটনাপর্যায় আর একটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কারণ সেই ক্ষেত্রে পালার বা মঞ্চের যে কোনো স্থানেই কৃষ্ণের লীলাভূমি, স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই।[৯৯]

কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে কীর্তনের সম্পর্ক পূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়া নৃত্যনাট্যে নৃত্যের সঙ্গে কীর্তনের যোগ ছিল। মণিপুরি কীর্তনে নৃত্যের যে রূপ ছিল তা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে অনেক কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে কীর্তন ও যাত্রাগান পছন্দ করতেন তা বলাই বাহুল্য। নাটকের ক্ষেত্রেও প্রচ্ছন্নভাবে যে সেই দেশীয় ধারার অনুসরণ তিনি করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

দেশীয় নাট্য-আঙ্গিক ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯ খ্রি.) বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাট্যজগতে একজন দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন অপেশাদার নাটকে আধুনিক নাট্যকার রূপে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তেমনি পেশাদারি থিয়েটারে নাট্য-নির্দেশক ও শক্তিশালী অভিনেতা রূপে তিনি আধুনিকতার বার্তা বহন করে এনেছিলেন। বত্রিশ বছর বয়সে অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর *আলমগীর* নাটকে আলমগীর সেজে সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি পদার্পণ করেন। তিনি যে সময় অভিনয়ের জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা গঙ্গাপদ বসুর মতে, গিরিশোত্তর একটি বন্ধ্যাযুগ[১০০]। প্রথম বিশযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) আবহে একে একে চলে যান অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৯০৮ খ্রি.), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৯১২ খ্রি.), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯১৩ খ্রি.) ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১৬ খ্রি.)। যাঁরা (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশ-পুত্র সুরেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল, অভিনেত্রী সুশীলা বালা প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব) রয়েছেন তাঁরা নতুন উদ্যম, ভাবনা অথবা নাট্যপ্রচেষ্টায় সেভাবে নিযুক্ত হতে পারেননি। ড. মন্দিরা রায় এই সময়কাল ও তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> সেই সময়ে পেশাদার রঙ্গালয়ের গতানুগতিকতায় যখন সূক্ষ্মরুচির দর্শক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যনির্দেশনা, মঞ্চসজ্জা, নাট্যনির্বাচন এবং বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক অভিনয়রীতির উপস্থাপনায় এক যুগান্তর এনেছিলেন।[১০১]

এই ‘বন্ধ্যাযুগে’ নতুন নাট্যস্পৃহার সঞ্চার করেছিলেন শিশিরকুমার। তিনি নিজে নাটক রচনা করেননি। তবে অন্যের লেখা নাটক পরিমার্জিত করে উপস্থাপনযোগ্য নিপুণ নাট্যশিল্প তৈরিতে তাঁর মতো নাট্যব্যক্তিত্ব বিরল। রবীন্দ্রনাথ ‘নটরাজ’ (এই উপাধি রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন) শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুন্যের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে স্নেহও করতেন যথেষ্ট। তাঁর কয়েকটি নাটক (*বিসর্জন, শেষরক্ষা, যোগাযোগ* উপন্যাসের নাট্যরূপ ইত্যাদি) অভিনয়ের ভার তিনি শিশিরকুমারের হাতে দিয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় দু’জনের নাট্যচিন্তার মিল যথেষ্ট পরিমানে ছিল।

মঞ্চপরকল্পনা, অভিনয়, দৃশ্যসৌন্দর্য, সাজসজ্জা, আলোক সম্পাত, সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য ইত্যাদির সামগ্রিক সম্মিলনের মাধ্যমে এবং প্রয়োগনৈপুন্যে শিশিরকুমার নাট্য প্রযোজনার সকল দিকেই অভিনবত্ব এনেছিলেন। তবে এসব করতে গিয়ে তিনি কী পাশ্চাত্যের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন?

নাকি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ধারাতেই থিয়েটারের উৎকর্ষবিধানের পথ খুঁজেছিলেন? মনে রাখতে হবে সেই সময় ইউরোপের চলছে 'ন্যাচারালিস্টিক' যুগ। এক সময় বাস্তবানুগ থিয়েটার দিয়ে আকর্ষিত করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরও অনেকে। তাতে দর্শক হয়তো চমকে যেতেন। দর্শকমনে স্থায়িত্ব পেত এই (বাস্তবানুগ দৃশ্যপট, পোশাক, পরিবেশ) চমৎকারিত্ব। এতে নাটকের ভাব ও রস হয়ে উঠত গৌণ। কিন্তু সেই পথে হাঁটলেন না শিশিরকুমার। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা মিলে যায়। নাট্যকার সৌমিত্র বসু এই সাদৃশ্য সম্পর্কে *বাংলা থিয়েটার ও বাঙালি দর্শক* প্রবন্ধে বলেছেন—

> অন্যদিকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের সেই ভাষা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলেন যা বাস্তবকে অনুকরণ করার পথে যাবে না, সংলাপ এবং মঞ্চবর্ণনার মধ্যে যে সব সংকেত নিহিত আছে, তাদের নাট্যের ভাষায় বার করে আনতে চাইবে। নাট্যের সেই ভাষায় দর্শক অভ্যস্ত নন, ফলে প্রযোজনার যে সুক্ষ্ম কারুকাজগুলির সন্ধান তাঁদের অনুগামী মননশীল নাটককারের লেখায় পাওয়া যাবে, সেই সময়ের সাধারণ বাঙালি দর্শক তার তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন এমটা মনে হয় না।[১০২]

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো রবীন্দ্রনাথ পেশাজীবী থিয়েটারের মানুষ ছিলেন না ঠিকই তবে নাটকের উৎকর্ষ বিধানে দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য যে ছিল এমন আভাস পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে দেশীয় নাট্য-ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছিলেন। সেদিক থেকে শিশিরকুমার যে পৃথক পথ অবলম্বন করেননি তা বোঝাই যায়।

গিরিশচন্দ্র, অমরদত্ত, অমৃত বসু, দীনবন্ধু প্রমুখদের অভিনয় দেখে বড় হয়েছেন শিশিরকুমার। স্কুলে পড়ার বয়স থেকেই লুকিয়ে থিয়েটার দেখতেন। নাটক প্রযোজনার মানসিকতা প্রস্তুতিতে তা কার্যকর হয়েছিল। তাহলে কী তিনি দেশীয় ঐতিহ্যকেই নিজ বুদ্ধিবৃত্তি ও যৌক্তিকতায় নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন? এক দিক দিয়ে তাঁর নাট্য প্রচেষ্টা হয়তো ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতিকেই সমর্থন করে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা থেকে যেমন গীত-নৃত্য-বাদ্যকে আলাদা হতে দেখা যায় না তেমনি তাঁর নাটকেও অন্যতম প্রধান উপাদান রূপে কাজ করেছে সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য। নাটকের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আবহ সংগীতের ব্যবহার পেশাদারি থিয়েটারে এমনভাব তাঁর আগে খুব কম জনই করতে পেরেছিলেন। তবে একথা অবশ্যই ঠিক যে মধ্যযুগীয় ধর্ম ও কুসংস্কার তাঁর নাটকে প্রাধান্য পায়নি।

শিশিরকুমার যখন রঙ্গমঞ্চে এলেন তখন থিয়েটারে কারণে অকারণে গানের ব্যবহার হত। গানে তেমনভাবে কথার মর্যাদা ছিল না। তবে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে গান লিখতেন ও সুর দিতেন বলে তাঁর গানে কথার গুরুত্ব ছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। তাঁর গানের সুর কখনোই কথার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। সংগীতে রবীন্দ্রনাথের গানের রীতি গ্রহণ করলেন শিশিরকুমার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। *বসন্ত-লীলা* গীতিনাট্যের মধ্য দিয়ে তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার কেমন ছিল তা ব্যাখ্যা করলে হয়তো বিষয়টি বুঝতে সুবিধে হবে। এই নাটকে গান গাইবার জন্য অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মণিলাল ও হেমেন্দ্রকুমার রায় ছ'টি করে মোট বারোটি গান লিখেছিলেন। এর সঙ্গে পুরোনো কয়েকটি গান (বৈষ্ণব পদাবলী জাতীয় গান) এবং রবীন্দ্রনাথের গান জোড়া দিয়ে একটি গানের মালা গাঁথা হয়। এতে সুর সংযোগ করেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং নৃত্য-পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন নৃত্য গুরু নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

বসন্ত-লীলা দিয়েই শিশিরকুমারের নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় আয়োজিত বসন্ত-লীলা যেন লীলাকীর্তনকেই মনে করিয়ে দেয়। সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখে বলেছেন—

> দোলের দিন চিরকাল বাংলা রঙ্গমঞ্চে 'দোললীলা' গীতি-নাটকটির অভিনয় হত; মণিলাল দোললীলার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রচনাটিকে আবদ্ধ রাখলেন না—তিনি ধরলেন বসন্ত-লীলা কীর্তন। একাধিক পর্যায়ে তিনি বসন্তলীলা রচনা করলেন...তিনটি পর্যায়ে অর্থাৎ তিনটি অঙ্কে হল বসন্ত-লীলার সৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে বসন্তের প্রকাশ...দ্বিতীয় পর্যায়ে বসন্তের বিকাশ এবং তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে বসন্তের লীলা।[১০৩]

উক্ত বর্ণনায় 'বসন্ত-লীলা কীর্তন' কথাটির ব্যবহারে বোঝা যায় নাটকে কীর্তন সংরূপের ব্যবহার করা হয়েছিল। লীলাকীর্তনের *দোললীলা* ও *রাসলীলা*-য় অনুরূপ পরিবেশ তৈরিতে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার হতে দেখা যায়। *বসন্ত-লীলা* গীতিনাট্যেও কী তাই করা হচ্ছে? কৃষ্ণচন্দ্র চারটি গান গেয়েছিলেন। এর মধ্যে 'হোলি খেলত নন্দদুলাল' গানটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী। এই ধরনের একাধিক বৈষ্ণব পদাবলী গানের ব্যবহারে ছায়াপাত করেছে মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা। নাটক শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের 'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে' কোরাস গান দিয়ে। সংগীতের মাধ্যমে নাটকের

সূচনা ভারতীয় নাট্যধারার অনুরূপ কৌশল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ভক্তিভাবের তারতম্য হয়েছে কিন্তু গানের ব্যবহার বন্ধ হয়নি। ভক্তিমূলক গানের জায়গায় ভাবপ্রধান সংগীত যুক্ত হয়েছে। পদাবলীর স্থানে জায়গা করে নিয়েছে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের গান।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীই প্রথম নাটকে দু'টি দৃশ্যের মাঝে সুনিয়ন্ত্রিত সুর ব্যবহার করে অভিনয়ের রস ঘনীভূত করার জন্য যন্ত্র-সংগীতের সাহায্য নিয়েছিলেন। নাটকে তাঁর সংগীতের প্রয়োগনৈপুন্যে ভরসা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা নাটকে গান সংযোজন বা বর্জন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তিনি গতানুগতিক নৃত্য ব্যবহারের ধরনেও পরিবর্তন আনেন। সেই সময় 'সখার দল' সব থিয়েটারেই থাকত। কারণে অকারণে নৃত্য পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় তাতে নাটকের রস ব্যহত হত। এমন অসঙ্গতিপূর্ণ নৃত্যভাবনার বদলে ভাবানুযায়ী, চরিত্রানুযায়ী ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার তিনি চালু করেন। কীর্তনের উপস্থাপনেও ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এদিক দিয়েও তিনি ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে যেন নতুন রূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাট্য উপস্থাপনায়।

বাংলার প্রচলিত নাট্যধারা ও বাদল সরকার

ষাটের দশকে প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকারের (১৯২৫-২০১১ খ্রি.) থিয়েটার নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জন্ম নিয়েছিল থার্ড থিয়েটার। তিনি এক নতুন রীতির নাটক রচনা ও অভিনয় করে বাংলা তথা ভারত এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশেও বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। বাংলার বাইরে হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, মণিপুর ইত্যাদি নানা প্রান্তে তিনি তাঁর নতুন নাট্যরীতি বিষয়ে বক্তৃতা ও কর্মশালার জন্য আমন্ত্রিত হন। তাঁর উৎসাহে বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য দল তাঁর নাট্যকর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন রীতিতে অভিনয় শুরু করে। কেমন ছিল এই নাট্যরীতি যা সমগ্র ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নাট্যকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছিল? এই রীতি 'থার্ড' হলে প্রথম ও দ্বিতীয় রীতি কোনগুলি? এর উত্তর তাঁর বক্তব্য থেকেই দিতে হয়। এক্ষেত্রে *তৃতীয় ধারার নাটক* প্রবন্ধ থেকে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ্য—

সুতরাং একমাত্র উপায় একটি বিকল্প থিয়েটারের কথা ভাবা, যা প্রথম থিয়েটার অর্থাৎ লোকনাট্য নয়, দ্বিতীয় থিয়েটার অর্থাৎ নগরনাট্যও নয়, তা তৃতীয় ধারার থিয়েটার।[১০৪]

দুইয়ের শক্তি এবং দুর্বলতা উভইয় আছে। কিন্তু বাদল সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার মধ্যে একধরনের অপূর্ণতা লক্ষ করেছিলেন বলেই তৃতীয় ধারার প্রবর্তন করেন। দুইয়ের সংমিশ্রণে থার্ড থিয়েটারকে 'Theatre of Synthesis' করে তোলার কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর *The Third Theatre* (১৯৭৮ খ্রি.) গ্রন্থে। সে সম্পর্কে আলোচনার আগে থিয়েটারের অর্থ তাঁর কাছে কী ছিল তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। 'থিয়েটার' পশ্চিমের শব্দ হলেও তাঁর কাছে নাটকের প্রতিশব্দ রূপেই গৃহীত হয়েছে। *পাখিরা উড়ে যায়* প্রবন্ধ থেকে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ্য—

থিয়েটার বললে যে বস্তুর ছবিটা মনে আসে সে বস্তুটি বর্তমানে অনেকখানি দেশি হয়ে গেছে হয়তো, কিন্তু সেটি দেশজ নয়, অর্থাৎ এ দেশে জন্ম নয় তার। দেশজ থিয়েটার অর্থাৎ যাত্রা তামাশা নৌটঙ্কি ভাওয়াই যক্ষগান থেরুকুটু গম্ভীরা আলকাপ বোঝাতে চাইলে 'থিয়েটার' কথাটার আগে একটা বিশেষণ জুড়তে হয়, জুড়ে বলতে হয়— ফোক থিয়েটার বা ট্রাডিশনাল থিয়েটার।[১০৫]

দেশীয় নাট্যাঙ্গিক তাঁর কাছে ফোক থিয়েটার বা ট্রাডিশনাল থিয়েটার (একেই আবার লোকনাট্য বলছেন)। গ্রামীণ থিয়েটারের দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি *The Third Theatre* গ্রন্থে বলেছেন—

In spite of the popularity of the traditional and folk theatres in the villages, the ideas and the themes treated remain mostly stagnant and sterile, unconnected with their own problems of emancipation— social, economic and cultural; ...[১০৬]

অন্যত্র *তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

অর্থাৎ পরিবর্তন সম্ভব নয়, যা আছে যা হচ্ছে তা দেবতার বিধান, মেনে নাও। অথবা— রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ, তাঁর বিরোধিতা করা পাপ; রাজা যদি বদ হয় তবে তার বিকল্প হল ভালো রাজা, জনগন কদাপি নয়।[১০৭]

অর্থাৎ প্রথাগত থিয়েটারে বিষয়ের গতানুগতিকতা, দেবতার আধিপত্য এবং তাদের সমস্যার কথা বলার সুযোগ না থাকায় এই থিয়েটার তাঁর নাটকের ফর্ম হতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন।

এক্ষেত্রে বলে রাখা উচিত প্রতিবাদের হাতিয়ার (সমকালের ধারণায়) রূপে ঐতিহ্যবাহী নাটকের উত্তরণ হতে দেখা যায় না। যদিও বিদ্রোহের হাতিয়ার রূপে কীর্তনের ব্যবহার করেছিলেন চৈতন্যদেব। কাজীদলনে সেই রূপ দেখা গেছে। তবে তাতে নাটকের ছিটেফোঁটা ছিল না বললেই চলে। তা লীলাকীর্তন নয়, নামকীর্তন। প্রাচীনকাল থেকেই নাটকের অবতারণা যে অবসর বিনোদন

এবং দেবতা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতরকার ভক্তিভাব ক্ষীণকায় হয়। পাশাপাশি অবসরও অনেকটাই কমে আসে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠেছে ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ নগরসংস্কৃতি। নগরসভ্যতা শিখিয়েছে নাটককে প্রতিবাদের অস্ত্র করে তুলতে। সেক্ষত্রে বাদল সরকার যে আশাহত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে তিনি এর উপস্থাপনকৌশলে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরূপ নাট্যসংরূপ গৃহীত হয়েছিল তাঁর নাট্যফর্মে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় থিয়েটারের সমালোচনায় সর্বদা মুখর থেকেছেন বাদল সরকার। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মঞ্চ-ভাঙার ডাক দিয়েছেন তিনি। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে মঞ্চের উচ্চতা, দর্শকদের অন্ধকারে অবস্থান জনিত দূরত্ব তাঁর ভালো লাগত না। তিনি থার্ড থিয়েটারে এই দু'য়ের (দর্শক ও অভিনয়শিল্প) নৈকট্য স্থাপন করার দু'টি উপায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতটি উল্লেখ্য—

> তাহলে দাঁড়াল এই যে, সত্যিকারের থিয়েটারি থিয়েটার করতে গেলে দর্শক এবং অভিনয়শিল্পকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ 'ঘনিষ্ট' করতে হবে। ঘনিষ্ঠ করা যায় দুটি উপায়ে। এক— প্রেক্ষাগৃহ ছোট করে, যাতে কোনও দর্শকই শিল্পীর থেকে বেশি দূরে না থাকেন; এবং দুই— শিল্পীকে দর্শকের মধ্যে নামিয়ে এনে, যেটা করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল দর্শকদের চারিপাশে বসিয়ে মাঝখানে অভিনয় করা। অর্থাৎ theatre-in-the-round— যার বাংলা আমি করেছি 'অঙ্গনমঞ্চ'। যাত্রা সার্কাস এই পদ্ধতিতেই করা হয়, থিয়েটারেও করা সম্ভব।[১০৮]

দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যেকার দূরত্ব ঘোচাতে তিনি যে অঙ্গনমঞ্চের কথা বলছেন তাতে প্রসেনিয়াম মঞ্চের একমুখীনতাও দূর করা সম্ভব। দ্বিতীয় থিয়েটারে দর্শকেরা এক দিকেই তাকিয়ে থাকে এবং অভিনেতারাও সেই দিকে তাকিয়ে অভিনয় করতে বাধ্য হয়। এই দ্বিমাত্রিকতা থেকে ত্রিমাত্রিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে থার্ড থিয়েটার। পালাকীর্তনের আসরেও রয়েছে এই ত্রিমাত্রিকতা। সেখানে কীর্তনীয়া ও ভক্তবৃন্দ কীভাবে এক হয়ে পালা উপস্থাপন করেন তা আগেই বলা হয়েছে। সূর্যপূজা পালায় কীর্তনীয়া এবং সেখানে উপস্থিত নারীভক্তদের মিলিতভাবে পূজা করা পালা উপস্থাপনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাদল সরকার ঐতিহ্যবাহী নাটকের এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন।

বাদল সরকার দেশ বিদেশে বিচিত্র নাটকের উপস্থাপন কৌশল দেখেছেন। এখান থেকেই তিনি নতুন আঙ্গিক সন্ধানের তাগিদ অনুভব করেন। এই সম্পর্কে বাদল সরকার *অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়* প্রবন্ধে বলেছেন—

অঙ্গনমঞ্চে বিশ্বাস আমার রাতারাতি আসেনি। ১৯৫৮ সালে যখন প্রথম theatre in the round দেখি বিদেশে, তখন থেকেই চিন্তার সূত্রপাত।[১০৯]

চিন্তা এলেও তিনি যে এজাতীয় নাটকের অনুকরণ করেননি তা স্পষ্ট জানিয়েছেন। অন্যদিকে Performance Studies এর প্রবক্তা রিচার্ড সেস্‌নারের (Richard Schechner) সঙ্গে ১৯৭১ সালের সাক্ষাৎ একটি বড় ঘটনা। রিচার্ড সেস্‌নারের রিচুয়াল থেকে থিয়েটারের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই সাক্ষাতে বাদল সরকারের দেশীয় আঙ্গিকের প্রতি আকর্ষণ যেন আরও যৌক্তিক সমর্থন পায়। তাঁর মত এক্ষেত্রে উল্লেখ্য—

Richard Schechner has never used the conventional proscenium stage. He is developing what he calls an 'environmental space theatre'. As I was thinking in the same lines in my own way, we had many useful exchange of ideas in Calcutta and Madras in the last two months of 1971.[১১০]

রিচুয়াল অর্থাৎ কৃত্যানুষ্ঠান থেকে লীলাকীর্তনের উদ্ভব। তা ক্রমেই হয়ে উঠছে 'ritual like theatre'। জাঁকজমকপূর্ণ জনপ্রিয় আঙ্গিক হয়ে উঠতে গিয়ে অনেকসময় যাত্রা, থিয়েটার, ছোটপর্দার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে অনুকরণ করা হয়েছে। এ শুধুমাত্র কীর্তনের ক্ষেত্রেই ঘটছে না, অন্যান্য দেশীয় সংরূপগুলিও পাল্টাচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, দর্শকদের আবেদনে তা করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। অনেকেই পেশার তাগিদে সস্তা চটকের এমন মিশেল তৈরি করছেন যাতে ক্রমবিবর্তনের ধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এর জন্য যে নগরসভ্যতা দায়ী তা বলাই বাহুল্য। একারণে বাদল সরকার সেই রূপটিকে নিচ্ছেন যা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। নাটক করতে বারেবারে ফিরে গেছেন গ্রামে। 'শতাব্দী' নাট্যদলকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলা সেখান থেকেই। শহুরে ধনী ও মধ্যবিত্তদের জন্য কলম ধরা বা নাটক করার ইচ্ছে তাঁর অনেকটাই কমে গিয়েছিল *সাগিনা মাহাতো* নাটকটির মঞ্চসাফল্য পেয়ে। এখান থেকেই তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চ ত্যাগের তাগিদ অনুভব করেন। পেলেন অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চের ধারণা। এক্ষেত্রে ড. পবিত্র সরকারের মত উল্লেখ্য—

প্রথম বড়ো পরিবর্তন ঘটল ১৯৭২-এ। বাদলবাবু গৌরকিশোর ঘোষের বড়ো গল্প 'সাগিনা মাহাতো'র নাট্যরূপ দিলেন প্রসেনিয়াম মঞ্চের বাইরে অভিনয়ের জন্য। তাঁর আগের নাটকাবলি থেকে *সাগিনা মাহাতোর* তফাত এইখানে যে, এতে অঙ্ক আর দৃশ্যের ভাগ রইল না, সময়ক্রম ভেঙে দেওয়া হল, স্থানমাত্রও সীমাবদ্ধ রাখলেন না তিনি। একইসঙ্গে একই অভিনয়ক্ষেত্রে নানা জায়গা বোঝানো হল। এতে জোর দেয়া হল দলগত অভিনয়,

মূকাভিনয়, ছন্দবদ্ধ গতিভঙ্গি, গান আর নাচের উপর, তাতে উচ্চারিত ভাষার গুরুত্ব অনেক কমিয়ে আনা গেল। সেটা বলতে বোঝাল কতকগুলি সহজে তৈরি আর বহন করার মতো দু তিন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা নিচু বাক্স জাতীয় প্ল্যাটফর্ম।[১১১]

দর্শকদের মাঝে অঙ্গনমঞ্চ হওয়ায় দৃশ্য বিভাজন দেখানোর সুযোগ নেই। গান ও নাচে ভরে উঠল অভিনয়। এতে দর্শকদের মনযোগ ব্যাহত হবার উপায় নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, বাদল সরকার তাঁর The Third Theatre গ্রন্থে *সাগিনা মাহাতো*-র উপস্থাপনকাল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ নির্দেশ করেছেন। নাটকের উপস্থাপনে চমৎকার একটি বর্ণনা উল্লেখ্য—

The first experimental production of the play outside of the proscenium theatre took place on the 24th October, 1971 at All Bengal Teachers' Association Hall in Calcutta. It is a small hall with a tiny stage on one side, seating about 200 people when used as a conventional auditorium. We arranged the chairs in the hall and also on the stage in such a manner that a central arena is obtained for acting.[১১২]

বাদল সরকার চিত্রের মাধ্যমে এই অভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। নাটকটি যখন চলছে তখন নাটকীয় ভাবে বৈদ্যুতিন ফিউস উড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য মঞ্চে কোনো আলো (স্পটলাইট) ছিল না। কিন্তু অভিনয় বন্ধ হয়নি। দর্শকেরা এই সময়টাতে কোনো ধরনের গুঞ্জন বা নড়াচড়া করেনি। এরপর সিলিঙের সাধারণ আলো জ্বলে। এই আলোতেই বাকি নাটকটা করা হয়। নাটক শেষ হলে বাদল সরকার দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল—

This incident confirmed my idea more than anything else that the involvement achieved by this form is much more than the conventional stage production. It also gave me the courage to simplify lighting to a great extend in subsequent productions.[১১৩]

গ্রামাঞ্চলের এমন অনেক আসর রয়েছে যেখানে এখনও হ্যাজাক জ্বেলে বা জেনারেটারের আলোয় রাত্রিব্যাপী লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আলোর কারসাজি না থাকা যে নাটকের পথের কাঁটা নয় তা বাদল সরকার এই অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট বুঝেছিলেন।

বাদল সরকারের নাট্যভাবনায় কীর্তন সরাসরি প্রভাব না ফেললেও তাঁর নাটকে শরীরের ভাষা তৈরিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। এক্ষেত্রে মণিপুরের নৃত্যাঙ্গীয় কীর্তনের সূত্র উঠে আসবে। নাটকে যখন আড়ম্বর প্রাধান্য পায় না তখন অভিনেতার শরীর অনেক বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। অঙ্গাভিনয় এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। শরীরকে কীভাবে নাটকের উপযোগী করে তুলতে হয়

তার প্রশিক্ষণ বাদল সরকার নিয়েছিলেন মণিপুরে কর্মশালায় গিয়ে। *The Third Theatre* গ্রন্থের *Manipur Workshop* অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য উল্লেখ্য—

> The opportunity I had in Manipur of discussing with the participants in the workshop and with some theatre personalities and of watching Manipuri 'Jatra', 'Basanta Ras' and the folk dances of the 'Lahroba' festival, gave me a rich experience which certainly influenced my subsequent work.[১১৪]

মণিপুরের সংস্কৃতির সঙ্গে বৈষ্ণবীর সংস্কৃতি কতটা ওতপ্রোত যুক্ত ছিল তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মণিপুরি বসন্ত রাস, যাত্রা এবং লোকনৃত্য সর্বত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা উপস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত। লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্য কীর্তনের এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পর বাদল সরকার এইজাতীয় উপস্থাপনকে নাটকের অঙ্গ করে তুলেছিলেন। তা করতে গিয়ে কীর্তনের সংরূপকেই পরোক্ষভাবে গ্রহণ করছেন।

শুধু আলো বা মঞ্চ নয় তিনি থিয়েটারের ব্যয়বহুলতা কমানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নাটককে সিনেমার মতো বাস্তবধর্মী করে তুলতে চাননি। প্রতীকী বস্তুর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শম্ভু মিত্র নাটককে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐতিহ্যবাহী নাটক, বিশেষভাবে কীর্তনাঙ্গীয় যাত্রাগানের অনুসরণ যে তাঁদের নাটক মঞ্চায়নে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। বাদল সরকার অল্প খরচে যে নাট্যপদ্ধতির প্রচার করেন তা যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শম্ভু মিত্রের প্রচেষ্টাকে নতুন মাত্রা দেয়। প্রসেনিয়াম বিরোধী হলেও তাঁকে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রশংসা করতে দেখা যায়। *বিভাব* নাটকে যে ফাঁকা মঞ্চ, আড়ম্বরহীন নাট্যপদ্ধতি দেখা যায়, তারই বিকশিত রূপ যেন এই থার্ড থিয়েটার। *তৃতীয় ধারার নাটক* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> তৃতীয় ধারার থিয়েটার তাই চায় নিরাভরণ মঞ্চ ও সাজসজ্জা। ত্রিপল খাটিয়ে, শাড়ি টানিয়ে মঞ্চ তৈরি হয়, ব্যবহার করা হয় আটপৌরে জিনিস। দিনের আলোয় অভিনয় করার ফলে আলোর খরচ বাঁচে। রাত্রে অভিনয় করতে হলে গ্যাসলাইট, হ্যাজাক বা পেট্রোম্যাক্স জ্বালানো হয়। বাধ্যতামূলক কোন টিকিটের ব্যবস্থা নেই, দর্শক যা পারে তাই দেয়। অল্প খরচ তাতেই উঠে যায়।[১১৫]

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনয় করতে গেলে যে প্রচুর অর্থের যোগান দিতে হয় তা তিনি বুঝেছিলেন। তিনি তাঁর নাটক শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইতেন। অর্থাভাব সেখানে প্রধান অন্তরায়। প্রসেনিয়াম ত্যাগ করার পেছনে সেই ভাবনাই কাজ করেছে।

দর্শক তাঁর থিয়েটার দেখতে আসতে না পারলে তিনিই থিয়েটারকে দর্শকের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি খোলা আকাশের নীচে নাটক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মুক্তমঞ্চ খুঁজে পেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পার্কে *স্পার্টাকুস* (১৯৭৩ খ্রি.) নাটক উপস্থাপন করেছিলেন খোলা আকাশের নীচে। এই মুক্তমঞ্চে নাটক উপস্থাপনের অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে *The Third Theatre* গ্রন্থে। এক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ্য—

> The performers found a new kind of involvement. The grass covered earth, the sun in the sky, the people sitting on the ground— all these gave a new meaning to the play, particularly those who had the role of slaves. The bits of dry grass and patches of dirt on the bare bodies of the slaves covered with sweat, accentuated by spots of blood from the scratches caused by pebbles on the ground, made it a play of blood and sweat as it was supposed to be.[১১৬]

দর্শক এক নতুন উপস্থাপন দেখে চমকিত হচ্ছে না। কারণ এমন উপস্থাপনের স্মৃতি কমবেশি সকলের রয়েছে। নাটক বলে উপস্থাপনের অঙ্গ হয়ে উঠতে অসুবিধা হচ্ছে না। যে পদ্ধতিতে তা উপস্থাপিত হচ্ছে তাতে একে ঠিক পথনাটক বলা যায় না। অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চের ধারণায় যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্য উপস্থাপন কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে নাট্যাঙ্গিককে একসময় শহুরে মানুষ দূরে সরিয়েছে তা পুনরায় নতুনভাবে গৃহীত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করার স্পর্ধা বাদল সরকারকে একজন ব্যতিক্রমী নাট্যব্যক্তিত্ব রূপে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

৫:৩ উপসংহার

আড়ম্বরের পেছনে একদিন শহরবাসী ছুটেছে, সেই পথ ধরে চটুল জনপ্রিয়তার পেছনে ছুটেছিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার কয়েকটি সংরূপ। যাত্রাগান এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই আড়ম্বরের পেছনে ছুটতে ছুটতে যে একসময় একঘেয়েমি আসবে, তা কে ভেবেছিল? দর্শক যা চায় তার উপর একসময় প্রবল মনঃসংযোগ আরোপিত হয়েছিল। কল্পনা, সাবলীল নাট্যপদ্ধতি (গীত, বাদ্য ও নৃত্য যুক্ত), অনাড়ম্বর উপস্থাপন ত্যাগ করে একেবারে বিজাতীয় উপস্থাপন কৌশল বেছে নেওয়া হইয়েছিল। তা করতে গিয়ে যে ভুল পথের নির্ধারণ (পাশ্চাত্যের অনুসরণ) করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করার জন্য মাসুল দিতে হয়েছে বাংলা নাটককে। বারে বারে নাকোচ করা সত্ত্বেও বাংলা নাটক ঐতিহ্যের অনুসরণেই মুক্তির পথ খুঁজেছে। সেই সময় বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটক আপন ভাণ্ড উজার করে সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এমনটাই সর্বকালে ঘটেছে, এখনও যে ঘটছে না এমন নয়। নাট্যকার গৌতম হালদার যখন ফাঁকা মঞ্চে *মেঘনাদবধ কাব্য* নাটকের অভিনয় করেন তখন দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে ও শোনে। তাঁর মতো আরও আনেকেই নাটকে সংগীতময় সংলাপ, বাদ্য এবং অঙ্গাভিনয়ের ব্যবহার করে মঞ্চসাফল্য পাচ্ছেন। এই রীতি কী নতুন? অবশই নয়। বাংলার নিজস্ব নাট্যপদ্ধতিতে তা আজও জীবন্ত। অভিনীত হয়ে চলেছে অহরহ। পালাকীর্তনের আসর কিংবা যে কোনো ঐতিহ্যবাহী নাটকের মঞ্চে বসে এই সত্য প্রতিনিয়ত নিজ ইতিহাস ব্যক্ত করে চলেছে। উত্তেজনা ও আগ্রহে আপাতত ভাটা পড়েনি। তাহলে কী বাংলা নাটকের নতুন ফর্ম খুঁজতে গিয়ে আধুনিক নাট্যকারেরা পশ্চিমের অন্ধ আনুগত্যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন? সেজন্যই হয়তো নিজস্ব নাট্য ঐতিহ্যের যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হচ্ছে একাধিক নাট্যদল। এই সূত্রেই হয়তো লীলাকীর্তনের নাট্যগুণ পুনরায় নতুনভাবে ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুন নতুন সমকালিনতায় অনুসরণীয় নাট্যাঙ্গিক হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র

[১] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* । কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১০-১১। পৃ. ২৩৬

[২] ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭। পৃ. ১৭৫-৭৬

[৩] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ২৩

[৪] চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬। পৃ. ২৬

[৫]সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১৫

[৬] Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934. P. 145

[৭] জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৮। পৃ. ৪৬৩

[৮] চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬। পৃ. ২৭

[৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬। পৃ. ২৭৭

[১০] তদেব। পৃ. ২৭৭

[১১] সরকার, প্রণব (সম্পা.)। *গ্রামীণ বিনোদন একাল ও সেকাল*। কলকাতা: লোক। ২০০৮। পৃ. ২৬

[১২] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১৫

[১৩] জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৮। পৃ. ৪৬৪

[১৪] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১০

[১৫] মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১। পৃ. ৯৪

[১৬] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১০

[১৭] চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬। পৃ. ৪১

[১৮] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ৩১৪

[১৯] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ৬৮

[২০] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১৭

[২১] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৬১। পৃ. ৭২

[২২] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১১

[২৩] তদেব। পৃ. ৫১১

[২৪] সরকার, প্রণব (সম্পা.)। *গ্রামীণ বিনোদন একাল ও সেকাল*। কলকাতা: লোক। ২০০৮। পৃ. ৩৯

[২৫] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ৩০৭

[২৬] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮। পৃ. ১৭২

[২৭] সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৩। পৃ. ২৫৩

[২৮] বিদ্যাভূষণ, অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: গৌড়ীয় মঠ। ৪৪২ গৌরাব্দ। পৃ. ১০৮৯-৯০

[২৯] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ৩০৮

[৩০] সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫। পৃ. ৫১১

[৩১] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ১৬০

[৩২] তদেব। পৃ. ৩০৯

[৩৩] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮। পৃ. ১৭৪

[৩৪] ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭। পৃ. ১৭৫

[৩৫] আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ২০১৮। পৃ. ৩১৩

[৩৬] দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮। পৃ. ১৭৩-৭৪

[৩৭] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ৬২

[৩৮] Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934. P. 123

[৩৯] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ৬২

[৪০] Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934. P. 118-19

[৪১] বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১১। পৃ. ৪৮

[৪২] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ৬৩

[৪৩] তদেব। পৃ. ৬৩

[৪৪] Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934. P. 127

[৪৫] বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সম্পা.)। *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৮। পৃ. ২৫

[৪৬] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ৬৮

[৪৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সম্পা.)। *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৮। পৃ. ৩৮

[৪৮] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৬১। পৃ. ৮৬

[৪৯] ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭। পৃ. ১৯৯

[৫০] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ১৫২

[৫১] বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। পৃ. ৬২

[৫২] ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ. মুখার্জী ২০১১। অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৬১। পৃ. ৮৮

[৫৩] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ১৫৩

[৫৪] চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পা.)। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা। ২০১৪। পৃ. ২১

[৫৫] মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.)। *সাহিত্যতক্কো: লেখক পাঠক যোগাযোগ*। কলকাতা: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩। পৃ. ২৫-২৬

[৫৬] বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১১। পৃ. ৬৩

[৫৭] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ১৮৫

[৫৮] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ৭৫

[৫৯] ভট্টাচার্চ, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৬৯। পৃ. ৩২৩

[৬০] তদেব। পৃ. পঞ্চাশ

[৬১] গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১। পৃ. ১৯৬

[৬২] ভট্টাচার্চ, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৬৯। পৃ. ৩২১

[৬৩] চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পা.)। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা। ২০১৪। পৃ. ২২

[৬৪] ভট্টাচার্চ, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৪৫। পৃ. ৪০০

[৬৫] তদেব। পৃ. ৩৮১

[৬৬] তদেব। পৃ. ৪০৩

[৬৭] ভট্টাচার্চ, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৪৫। পৃ. ২০০

[৬৮] তদেব। পৃ. ২০০

[৬৯] রায়, অভিজিৎ (সম্পা.)। *নৃত্যরসমঞ্জরী নৃত্যবিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮। পৃ. ৩৪

[৭০] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি। *নৃত্য: অন্তরে বাহিরে*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬। পৃ. ৫৩

[৭১] বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১১। পৃ. ৫৬

[৭২] রায়, অভিজিৎ (সম্পা.)। *নৃত্যরসমঞ্জরী নৃত্যবিভাগের বাৎসরিক পত্রিকা*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫। পৃ. ২৪

[৭৩] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি। *নৃত্য: অন্তরে বাহিরে*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬। পৃ. ৫৮

[৭৪] ভট্টাচার্য্য, সুমন। *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: রংবেরং পাবলিকেশন। ১৪২৩। পৃ. ২১

[৭৫] সেন, সুকুমার। *প্রবন্ধ সংকলন*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৪। পৃ. ৫৬৮

[৭৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। একাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ৪৮

[৭৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১২৯১। পৃ. ৩১

[৭৮] তদেব। পৃ. ২০

[৭৯] তদেব। পৃ. ২২

[৮০] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬। পৃ. ১১৩

[৮১] তদেব। পৃ. ৯৪

[৮২] তদেব। পৃ. ২৩৮

[৮৩] তদেব। পৃ. ২৩৮

[৮৪] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ৭৬

[৮৫] রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড। ১৩৫৩। পৃ. ১০৮

[৮৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬। পৃ. ১২৩

[৮৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ১৬৪

[৮৮] তদেব। পৃ. ১৬৪

[৮৯] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ৭৪৭

[৯০] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। *ঘরোয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৯৮। পৃ. ১৩৩

[৯১] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ১৬৪

[৯২] তদেব। পৃ. ১৬৪

[৯৩] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। একাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ৬৬

[৯৪] তদেব। পৃ. ১০৩

[৯৫] চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*। ঢাকা: অম্বেষা। ২০১৪। পৃ. ১৭৮

[৯৬] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯। পৃ. ৬৭৪

[৯৭] তদেব। পৃ. ৬৭৪

[৯৮] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬। পৃ. ১১১

[৯৯] বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী। *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র নাটক*। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯৪। পৃ. ৩০

[১০০] বসু, গঙ্গাপদ। *নাটক ও নাট্যকথা*। কলকাতা: আনন্দ। ২০১০। পৃ. ৪৮

[১০১] রায়, মন্দিরা। *প্রসঙ্গ: বাংলা রঙ্গালয়*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। ১৪১৭। পৃ. ১৪৮

[১০২] মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.)। *ছড়ানো-ছেটানো বাংলা সাহিত্যের নানা দিক*। দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: সাহিত্য তক্কো। ২০১৩। পৃ. ২৮

[১০৩] ভট্টাচার্য, শঙ্কর। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। কলকাতা: ডি.এম.লাইব্রেরী। ১৩৬৫। পৃ. ৯৪

[১০৪] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ১৭২

[১০৫] ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পা.)। *বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: নাট্যচিন্তা। ২০১৪। পৃ. ৭৪

[১০৬] তদেব। পৃ. ১২৬

[১০৭] তদেব। পৃ. ৬৯

[১০৮] তদেব। পৃ. ৪৮-৪৯

[১০৯] তদেব। পৃ. ৪৩

[১১০] তদেব। পৃ. ১৫৮

[১১১] সরকার, পবিত্র। *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৬। পৃ. ৩১৯

[১১২] ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পা.)। *বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: নাট্যচিন্তা। ২০১৪। পৃ. ১৪৭

[১১৩] তদেব। পৃ. ১৪৮

[১১৪] তদেব। পৃ. ১৮৩

[১১৫] রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬। পৃ. ১৭৩

[১১৬] ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পা.)। *বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: নাট্যচিন্তা। ২০১৪। পৃ. ১৭৬

উপসংহার

পদাবলী কীর্তন এক ধর্মীয় পরিমণ্ডলে উদ্ভূত হয়েছিল। কীর্তনের সংক্ষীপ্ত ইতিহাস আলোচনাপর্বে এর ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ভক্তিধর্মের আলোকে পরিস্ফুট হয়। ভক্তিধর্মের আরাধ্য দেবতা রূপে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরণ এবং কালক্রমে রাধাকৃষ্ণের যুগল সত্ত্বার বিকাশ ভীষণ কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা। কৃষ্ণ একজন শক্তিশালী দেবতা রূপে আর্য-অনার্য-বৌদ্ধ-জৈন দ্বিধাদ্বন্দ্বের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের ভক্তিভাব জয় করেছেন। বিষ্ণুর অবতার হয়েও কৃষ্ণ তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়তায় তাঁকে ছাপিয়ে যান। রাধাকৃষ্ণ সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন এবং কালক্রমে শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। পদাবলী কীর্তন সংরূপটির ক্ষেত্রে কৃষ্ণের আধিপত্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রেমিক, বীর, কূটনীতিজ্ঞ, নেতৃত্ব প্রদানকারী ইত্যাদি বহু বিচিত্র সত্ত্বায় প্রকাশিত। তবে কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবভক্তিধর্ম বাংলার কোমল মাটি ও আর্দ্র জলবায়ুর স্পর্শে প্রখর রূপ হারিয়েছেন। তাঁর প্রেমিক ও গোপবালক মোহনীয় রূপের মোহে মেতে উঠেছিল বাঙালি মন।

ভারতবর্ষে দেবতার নাম-গুণ-লীলা ইত্যাদি কীর্তন ও শ্রবণ করার চল আদি কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে নির্দিষ্ট নিয়মিত পদ্ধতিতে কীর্তনের বিকাশ ঘটেছিল ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। চৈতন্যদেব বঙ্গে আবির্ভূত হলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তিধর্মের প্রচারে পদাবলী কীর্তনকে জনপ্রিয় উপস্থাপনমাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে একথা ঠিক যে, সারা জীবনব্যাপী তিনি নামকীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তাঁকে সংকীর্তনের জনক বলা হয়। নামকীর্তন সম্প্রচারের পাশাপাশি তিনি একজন রসগ্রাহী পদাবলী কীর্তনের শ্রোতা ছিলেন। তিনি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে এবং তাঁর সমসাময়িক সময়ে কীর্তন করাটা উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। স্মার্ত পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের কীর্তন অপরাধের কাজ বলেই মনে করতেন। অন্যদিকে মুসলমান কাজী পরিচালিত শাহী শাসনব্যবস্থা ছিল চূড়ান্ত কৃষ্ণবিদ্বেষী। এমতবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহবন্দী কীর্তনের প্রচলন ছিল বৈষ্ণব সমাজে। বাংলায় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হলে এই পরিস্থিতির অবস্থান্তর ঘটে। তিনি কৃষ্ণকীর্তনকে সামাজিক মর্যাদা প্রদানে সহায়তা করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে কীর্তন। গৃহবন্দী দশা ঘুচিয়ে

নগরকীর্তনের মাধ্যমে কীর্তনকে তিনি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের হাতিয়ার করে তোলেন। নামকীর্তন এবং পদাবলী কীর্তন করার স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ আরাধ্য দেবতার কাছে প্রাণের কথা বলার সুযোগ পায়। ভগবানের কাছে যাওয়ার বা মনের আকুতি শোনানোর জন্য যে ব্রাহ্মণ-নির্ভর সামাজিক বিধি প্রচলিত ছিল, তা চৈতন্যদেব ভেঙে দিলেন। কীর্তনকে বহু শাখায়িত পরিপুষ্ট ফলবতী বৃক্ষে পরিণত করার কারিগর ছিলেন তিনি। মহাপ্রভু একাধারে ছিলেন সমাজসংস্কারক ও বলিষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে পরিস্থিতি অনুসারে একজন প্রতিভাবান সুগায়ক ও নৃত্যপটু নটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে কখনোই পিছুপা হননি। তাঁর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে বাংলার একটি বিশিষ্ট নাট্যসংরূপ লীলাকীর্তন শক্তিশালী ঐতিহ্যবাহী নাট্যমাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিসর পায়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও পদাবলীর উপস্থাপন কীর্তনগানের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গান বাঁধত কবিতা ও পদ বা পদাবলীর আকারে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী আসরকেন্দ্রিক নাট্য উপস্থাপন ছিল কাব্য-সংগীত-নৃত্য-বাদ্য মিশ্রিত সংরূপ। তাই বর্তমানে প্রচলিত নাটকের ধারণা দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিচার করলে চলবে না। সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যসহকারে সেই সময়ের সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য, পদাবলী ইত্যাদি আসরে আসরে উপস্থাপিত হত। মনে রাখতে হবে, সেই সময় ছাপাখানা ছিল না। পুথির লিপিকরদের সংখ্যাও নির্ভর করত পৃষ্ঠপোষকতার উপর। আসরে উপস্থাপনের উপর সম্প্রচার এবং কবির সুনাম অনেকাংশে নির্ভর করত। মানুষের মুখে মুখে স্মৃতিতে ভর করে সম্প্রচার চলত। পদাবলী মনে রাখার ক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তন গান বিশেষ সহায়ক। এইভাবে বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলায় প্রবেশ করে এবং গানে গানে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। মিথিলায় পড়তে যাওয়া ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিতে ধারণ করে অথবা লিখে আনা পদাবলীর মাধ্যমে বিদ্যাপতি বাংলায় প্রচার পান।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত লিখিত সাহিত্যই গীত হত। পুথিগুলিতে যে কবি-ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে গান করে গাইবার উল্লেখ প্রায় প্রতিটি কাব্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া ধ্রুবপদের ব্যবহার আসরে গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়াকেই সমর্থন করে। সেই আসর হতে পারে মন্দিরপ্রাঙ্গণ, রাজসভা অথবা সর্বসাধারণের জন্য তৈরি মাটির আসর। পদাবলী গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে নৃত্য ও বাদ্য ছিল সহচর। একটি আসরে একজন অধিকারী তাঁর দল নিয়ে সংগীত-নৃত্য-বাদ্য সহ

কাহিনি উপস্থাপন করছেন। এই উপস্থাপন দেখছেন ও শুনছেন কিছু মানুষ। এমন উপস্থাপনের নাটক হতে বাধা কোথায়? দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে হয়তো এমন সহজতা যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না।

প্রতিটি সংগীত-নৃত্যময় উপস্থাপনের সঙ্গে ধর্মীয় যোগ অবশ্যই থাকত। কারণ কবিদের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কাব্যের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। কাব্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি এবং পৃষ্ঠপোষকের মনকে তুষ্ট করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্ততপক্ষে প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় অনুশাসন তা থেকে মুক্ত হতে পারা কখনোই সহজ ছিল না। পদাবলী ও লীলাকীর্তন তার ব্যতিক্রম নয়। এতে কৃষ্ণ এবং তাঁর কলিযুগের অবতার গৌরাঙ্গের আধিপত্য সর্বত্র বিরাজমান। লীলাকীর্তনের নাট্যবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা এবং গৌরলীলা অর্থাৎ এক ধর্মীয় পরিমণ্ডলে লীলাকীর্তন লালিত হয়েছে। তবে এর নাটকীয় বিকাশ সংগীত-নৃত্য-বাদ্য ব্যতীত সম্ভব হয়নি। বর্তমানে যে লীলাকীর্তন প্রচলিত রয়েছে তাতে আখর, কথা (কীর্তনের অঙ্গ) এবং সর্বোপরি সংলাপ অংশ প্রাধান্য পেয়েছে ঠিকই তবে লীলাকীর্তনের থেকে সংগীত-নৃত্য-বাদ্যকে বাদ দেওয়া যায়নি।

পদাবলীতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকতা সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি তবে ধর্মীয় অনুষঙ্গের বাইরে গিয়ে এর অস্তিত্ব সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সাধারণ মানব মানবীর প্রেমবাঞ্ছা প্রকাশিত হলেও তার একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ রয়েছে। চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৈষ্ণব পদাবলী লেখার ধরন অনেকটাই পালটে যায়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত হওয়ায় মঞ্জরীভাবের সাধনা প্রচলিত হয়। সাধারণের বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনায় তাঁকে আর ধরা যায় না। রক্তমাংসের মানব মানবীর সাধারণ প্রেমবাঞ্ছা দিয়ে এর (রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার) ব্যাখ্যা চলে না। পদাবলীর লেখক আগের মতো তাঁর নিজস্ব ভাবাবেগ ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার স্বাধীনতা পান না। অন্যদিকে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ এবং চৈতন্যপার্ষদেরা পদাবলী সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। তবে সেখানেও যুক্ত ছিল দৈব অনুষঙ্গ। চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত রাধাকৃষ্ণের মিলিত সত্ত্বায় (অন্তরে কৃষ্ণ বহিরাঙ্গে রাধা) প্রকাশিত দেবতা হিসেবে বৈষ্ণব সমাজে পূজিত হন। নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার কল্পনা করা হয়। যশোদা, কৃষ্ণ, বলরাম ও সখাদের সমতুল্য হয়ে ওঠেন যথাক্রমে শচীমাতা, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য পার্ষদবৃন্দ।

যে কোনো বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠান তাঁকে স্মরণ না করে সম্পন্ন হয় না। তাঁকে ভগবানের সমতুল্য করে রচিত হয়েছে গৌরপদাবলী বা গৌরচন্দ্রিকার পদ। বন্দনা ও গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী আসরে কীর্তনগানের মাধ্যমে পরিবেশন করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে কীর্তনের কথা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বাংলা ভাষার লিখিত রূপ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষায় রচিত *গাথাসপ্তসতী* ও *প্রাকৃত পৈঙ্গল* এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত *সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত* ও *গীতগোবিন্দ* ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা বা পদাবলীর আকারে কৃষ্ণলীলা রচিত হলেও তা গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। পদাবলী কীর্তনের প্রাচীন রূপ উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন *চর্যাপদ* -এ যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ (তিব্বতী অনুবাদে মোট পঞ্চাশটি পদ পাওয়া যায়) পাওয়া গিয়েছে তা গানের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হত। *চর্যাপদ* সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ হলেও পদ বা পদাবলী গানের মাধ্যমে প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী কীর্তনের উপস্থাপনকে সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে।

চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী অসংখ্য পদকর্তা পদাবলী কীর্তন সংরূপের বিকাশসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পদাবলী কীর্তন জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পদাবলীর চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে, সেই যুগে সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে শিক্ষার অধিকার বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। মানুষ গানের আসরে বসে পদাবলীর রসসমুদ্রে অবগাহন করতেন। প্রত্যক্ষভাবে লিপি পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষ পদাবলী কীর্তনের মাধ্যমেই মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। শুধুমাত্র শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমেই যে ধর্মপালন করা যায়, তা চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হলে হয়তো জানতে পারত না ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর অনুশাসনে ভীত সাধারণ মানুষ। প্রেমধর্মের সহজতায় যে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সেই বিশ্বাস জোগানোর কঠিন সাধনা শ্রীচৈতন্যের জীবনব্যাপী ব্রত হয়ে উঠেছিল। সমাজের বৈষম্য দূর করে আরাধ্যের নিকটে প্রাণের ভক্তি উজার করে দেওয়ার মন্ত্র হয়ে উঠেছিল কীর্তন। সাধারণ মানুষ ভক্তিমার্গের এক সহজ সাধন-মাধ্যম কীর্তনকে নিত্যপালনীয় কর্মের অন্তর্গত করে তুলেছিল। অন্যদিকে কীর্তনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুধুমাত্র একজন

ভালো পদকর্তা হয়েই তৃপ্ত থাকেননি সেযুগের গুণী কবিসমাজ। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষ কীর্তনীয়া। এ থেকে অনুমান করাই সঙ্গত, বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত বৈষ্ণব পদকর্তারা ছিলেন সেই সময়ের প্রখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনীয়া। প্রথম অধ্যায়ে এই বিষগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। নবদ্বীপে কাজীদলন, পুরীর রথাগ্রে পদাবলী কীর্তন ও খেতুরী মহোৎসবে কীর্তনকালে যে সংগঠিত কীর্তন প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে সেই সময়ের পদাবলী কীর্তন যে ক্রমেই বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে একটি সহজবোধ্য জনপ্রিয় রূপ পরিগ্রহ করছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে এসে খেতুরী মহোৎসব থেকে পদাবলী কীর্তনের যে রূপ তৈরি হয়েছিল তা আজও আসরে আসরে অনুসরণ করা হয়। প্রাচীনকালে লীলা কথাটি নাটকীয় উপস্থাপন অর্থে ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাম এবং কৃষ্ণের জীবনব্যাপী বিশেষ বিশেষ কাহিনি উপস্থাপিত হত লীলার মাধ্যমে। রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা সংঘটিত হত লীলা জাতীয় নাটকের আকারে। কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালীয়দমন লীলা অন্যতম লীলানাটক রূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কালীয়দমন লীলা থেকেই পরবর্তীকালে যাত্রা নাট্যরূপ বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রয়াসে কীর্তনের মাধ্যমে যে মানবধর্মের বাণী প্রচারিত হয় তা পাঁচালি সংরূপকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের রচনার বহুক্ষেত্রেই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরনিতাই অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। কীর্তনের সুর যে তাঁদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল তার অকপট স্বীকৃতি রয়েছে তাঁদের কাব্যে। পাঁচালি ও মঙ্গলকাব্যের কবিরা কৃষ্ণ ও চৈতন্যের প্রতি তাঁদের ভক্তিভাব প্রদর্শনে কার্পণ্য করেননি।

পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। তবে দু'টি শব্দবন্ধ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। পদাবলী কীর্তন লীলাকীর্তনের তুলনার প্রাচীনতর। খুব সম্ভবত খেতুরী মহোৎসবে লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন বৈষ্ণব সমাজে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করেছিল। তবে লীলাকীর্তন নাট্যসংরূপটি হঠাৎ করে এই মহোৎসবে উদ্ভূত হয়নি। পদাবলীর মাধ্যমে লীলারস আস্বদন করার প্রচলন সমাজে ছিল। কৃষ্ণের মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকা লীলা অবলম্বনে পদাবলী কীর্তন সহযোগে লীলাকীর্তন জনপ্রিয় নাট্যমাধ্যম রূপে প্রকাশ পায়। লীলাকীর্তনের আঙ্গিক বিকাশে সেই সময় প্রচলিত নাটগীত ও লীলানাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ এই জনপ্রিয়

নাট্যমাধ্যমটি (লীলানাটক) কৃষ্ণভক্তি সম্প্রচারের অংশ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। লীলাকীর্তনের মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরূপ একটি সাবলীল পরিবেশন রীতি লাভ করেছিল।

নাটগীত সংরূপটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গানের মাধ্যমে নাট্য-উপস্থাপন বাংলার একটি প্রাচীন রীতি। *চর্যাপদ* -এ যে বুদ্ধ নাটকের কথা পাওয়া যায় তাতে বাঙালির নাট্য-আকাঙ্ক্ষার প্রাচীন রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। গীত-নৃত্য-বাদ্যময় অভিনয় ছিল এর মূল কাঠামো। পরবর্তীকালে নাটগীতের মাধ্যমে *গীতগোবিন্দ* এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এই অভিনয় উপস্থাপন প্রণালী আরও বেশি সংহত রূপ লাভ করে। দলগত উপস্থাপন ছিল এর মূল বৈশিষ্ট্য। কবি জয়দেবের একটি ঘরোয়া দল ছিল এবং তিনি নিজে ছিলেন অধিকারী। জয়দেব গাইতেন এবং পদ্মাবতী নাচতেন। তাঁর আত্মীয় পরাশর ছিলেন দোহার। অর্থাৎ মূলগায়েন এবং দোহার মিলে সংগীত উপস্থাপন করতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ধ্রুবপদের ব্যবহার নাট্য-উপস্থাপনে দোহারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গানের বিষয়বস্তু এবং ভাব অনুসারে চলত নৃত্য। নৃত্য পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। বাদ্য বাজানোর জন্য নিশ্চই দলে পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকতেন। সাহিত্যে রয়েছে এর অজস্র প্রমাণ। এমত দলগত উপস্থাপনের রূপটি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই ধারায় পদাবলী কীর্তন এবং লীলাকীর্তন প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অধিষ্ঠান করেছে। আখ্যানধর্মী পাঁচালি জাতীয় রচনার উপস্থাপনেও এই রীতির অনুসরণ ঘটেছে। অভিনয় উপযোগিতা পদাবলীর তুলনায় আখ্যানধর্মী পাঁচালীতে বেশি থাকায় এতে নাট্য-উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। পদাবলী এবং পাঁচালির বাহ্যিক রূপের তফাৎ থাকলেও উপস্থাপনগত সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বাংলার ক্রমবিবর্তিত নাট্যধারা এই বৈচিত্র্যের সমাবেশে ততোধিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

পদাবলী কীর্তনে গানের ভূমিকা অত্যধিক থাকায় নাট্যরস প্রবল হয়ে উঠতে পারছিল না। লীলাজাতীয় নাট্য অর্থাৎ লীলানাটক এবং নাটগীত ও পদাবলী কীর্তনের সামঞ্জস্যবিধানে লীলাকীর্তন নামক নাট্যরূপের জন্ম হয়। লীলাকীর্তনে থাকত একটি নির্দিষ্ট কাহিনি যার অনুকরণে নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে পালার মাধ্যমে নাট্যরূপ প্রকাশিত হত। এই নতুন নাট্যমাধমে আগের অর্থাৎ পদাবলী কীর্তনের মতই গান ও নাচের প্রাধান্য বজায় থাকল, উপরন্তু যুক্ত হল নিটোল কাহিনির নাট্যরস। অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় একদিনের সময়ক্রম অনুযায়ী লীলাকীর্তন প্রহর অনুসারে পরিবেশিত হয়। কীর্তনীয়ারা পালা

উপস্থাপনকালে দিন বা রাতের উপযোগী পালা পরিবেশন করেন। বৈষ্ণব সমাজে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে 'রাতে গোষ্ঠ দিনে রাস তার হয় সর্বনাশ'। পদাবলী কীর্তন গাইবার ক্ষেত্রে সে বিধান কিন্তু নেই। কারণ তাতে কাহিনি ও সময়কাল অনুসারে কাহিনি শোনানোর দায় থাকে না। অনুষ্ঠান অনুযায়ী এক বা একাধিক পদাবলী গাওয়া যায়। এক বা একাধিক পদাবলী গান করার ক্ষেত্রে সুকণ্ঠ আবশ্যক। অভিনয়দক্ষতা সেখানে অপ্রধান। তবে লীলাকীর্তনে সময়ের বাধাধরা ছক কাজ করে। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া লীলাকীর্তন সচরাচর উপস্থাপিত হতে দেখা যায় না। নাট্যরস অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেজন্য পদাবলী কীর্তনের তুলনায় লীলাকীর্তনে অভিনয় উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কীর্তন পরিবেশনকারী কীর্তনীয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে অভিনয় দক্ষতা। একজন ভালো উপস্থাপক তাঁর উপস্থাপনের গুণপনায় সাজিয়ে তোলেন পালার বিভিন্ন ঘটনা। এই কারণবসত একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কীর্তনীয়া ছাড়া লীলাকীর্তন পরিবেশিত হতে পারে না।

পদাবলী কীর্তনকে অনেক সময় লোকসংগীত আখ্যায়িত করা হয়। তবে পদাবলী কীর্তন কখনোই নিছক লোকসংগীত হতে পারে না। শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী, তালপদ্ধতি, ঘরানা ইত্যাদির ব্যবহার করা হয় পদাবলী কীর্তনে। কীর্তনের একটি দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। কেবলমাত্র মৌখিক সংস্কৃতিতে পদাবলী কীর্তন আটকে নেই। পদাবলী কীর্তনের একটি মান্য সাহিত্যিক রূপ (বৈষ্ণব পদাবলী) রয়েছে। অন্যদিকে পদাবলী কীর্তন গোষ্ঠীবদ্ধ প্রান্তীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না। উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষ পদাবলী কীর্তনের পৃষ্ঠপোষকতায় নিযুক্ত। গ্রাম-শহরের সীমারেখায় পদাবলী কীর্তন আটকে নেই। তবে একথা ঠিক, স্থানভেদে জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপস্থাপন এতে যুক্ত হয়। লোকসংগীতের অনেক বৈশিষ্ট্য পদাবলী কীর্তনের গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের গতানুগতিক একঘেয়েমি এতে নেই। সময় ও পরিবেশ অনুসারে তা পরিবর্তনশীল। একারণে পদাবলী কীর্তনকে পুরোপুরি ধ্রুপদী আখ্যাও দেওয়া যায় না। ধ্রুপদী ও লোকায়ত উভয় বৈশিষ্ট্য পদাবলী কীর্তনে রয়েছে। বাঙালির নিজস্ব নাট্যমাধ্যম রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে পদাবলী কীর্তন।

লীলাকীর্তনে যুক্ত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা যাকে লোকনাটক বললে ভুল হবে। উপরন্তু নাট্যশাস্ত্রের উত্তরাধিকার রয়েছে লীলাকীর্তনে। *নাট্যশাস্ত্র* -এ বর্ণিত রসশাস্ত্রের ধারণা গ্রহণ করে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব তৈরি করেছেন। শুধু রসতত্ত্বই নয়; নায়ক-নায়িকা বিভাজনও সংস্কৃত

শাস্ত্রের অনুরূপ। তবে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের কৃচ্ছ্রসাধনে উভয় ক্ষেত্রে *নাট্যশাস্ত্র* -এর তুলনায় অধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তাছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যে দশরূপকের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় লীলাকীর্তনের। বিশেষত ভাণ, ব্যায়োগ, অঙ্ক, বীথি এবং প্রহসন নামক একাঙ্ক রূপকের বৈশিষ্ট্য যেন সংক্রমিত করেছিল লীলাকীর্তনকে। এদের মধ্যে অঙ্ক রূপকের সঙ্গে সর্বাধিক মিল রয়েছে লীলাকীর্তনের। বৈষ্ণবেরা মিলনের থেকে বিরহকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী তথা কীর্তনে করুণ রসের আধিক্য রয়েছে। অঙ্ক রূপকের অঙ্গীরস হল করুণ রস। বহু স্ত্রীলোকের আক্ষেপ এতে প্রাধান্য পায়। মা যশোদা, ষোলশত গোপী, সখী এবং সর্বোপরি রাধার বিরহ যন্ত্রণা পদাবলীর সর্বত্র বিরাজমান। অন্যদিকে বীথি রূপকের মধ্যে যে শৃঙ্গার রসের আধিক্য তা কীর্তনেও পাওয়া যায়। কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগে, বীথি রূপক লীলাকীর্তনের সমতুল্য হয়ে ওঠে।

নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত বৃত্তির সঙ্গে বাংলা কীর্তনের অসাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন সহ উচ্চণ্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের ঝঙ্কার কীর্তনে দেখা যায়। ভরত বর্ণিত নাটকের অভিনয় (আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক) লীলাকীর্তনেও রয়েছে। কীর্তনে আঙ্গিক অভিনয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত। কীর্তনীয়াকে কোটি, বক্ষ, পার্শ্ব ও পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে অভিনয় করতে দেখা যায়। লীলাকীর্তনে মৌখিক অভিব্যাক্তির প্রয়োজন হয়- যা একরকম সাত্ত্বিক অভিনয়ের অংশ। চোখ, ভ্রু, অধরের ভঙ্গিমা ইত্যাদি দেখা যায় কীর্তনে। লীলাকীর্তনে পদাবলী গান করার পাশাপাশি সংলাপের অংশ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত বাচিক অভিনয়ের সঙ্গে তা এক সূত্রে মেলানো চলে। সব শেষে আহার্য অর্থাৎ চরিত্রানুগ রূপসজ্জার ব্যবহার কীর্তনে খুব বেশি না করা হলেও স্বল্প প্রয়োগ এতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে পদাবলী ও লীলাকীর্তনে যে ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক ফুটে উঠেছে তা একপ্রকার সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা মার্জিত নাট্যসংরূপ।

সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত লীলাকীর্তনে নাটকীয় উপস্থাপনবৈশিষ্ট্য অভিনয় বিদ্যার (Performance Studies) তত্ত্বানুসারে এবং নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিচার করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পদাবলীকীর্তন এবং লীলাকীর্তন একধরনের Sacred Ritual Performance অর্থাৎ ধর্মীয় কৃত্যমূলক উপস্থাপন। জনসমষ্টিগত বিশ্বাস থাকে কীর্তনে। এতে যেমন কৃত্যের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার কীর্তনে রয়েছে। তবে কীর্তন যে বিশিষ্ট ভক্তিভাব

এবং বিশ্বাস নিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল তা আধুনিক ক্রমবিবর্তিত সমাজের অভিঘাতে অনেকটাই বদলে গেছে। অভিনয় বিদ্যার তত্ত্বানুসারে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন একটি Sacred Ritual Performance হিসেবে জন্ম নিয়েছে ঠিকই কিন্তু ক্রমেই তা Ritual like performance -এর দিকে এগিয়েছে। অর্থাৎ এখনকার কীর্তনানুষ্ঠানে ভক্তিভাব গৌণ, বিনোদন মুখ্য। স্থানভেদে কীর্তন নিছক বিনোদন হয়ে দাঁড়ায়। নৃত্যমূলক অনুষ্ঠান হিসেবে কীর্তন দেখতে যায় মানুষ। এই শ্রেণির দর্শক-শ্রোতাদের ভক্ত বলাটা যৌক্তিক নয়। এরা নিছক দর্শক।

এখনকার কীর্তন অনেক বেশি দৃশ্যনির্ভর উপস্থাপন হয়ে উঠেছে। কীর্তনীয়ার সুঠাম গৌরকান্তির উপর নির্ধারিত হয় তাঁর বায়না পাওয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন কীর্তনীয়ার সুকণ্ঠ থাকার পাশাপাশি সুদর্শন হওয়া জরুরি। একই কারণে কীর্তনে নাচের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে মানুষ কীর্তন শুনতে যেতেন। কিন্তু এখন কীর্তন দেখতে যান। কীর্তনে বিনোদন ভক্তিকে ছাপিয়ে গেছে। অনেকক্ষেত্রে কৃত্যানুষ্ঠানের পালন বন্ধ হওয়া অথবা অন্তঃসারশূন্য কৃত্যের আড়ম্বর চোখে পড়ে। কৃত্যের পালন হয় ঠিকই কিন্তু যে বা যাঁরা তা পালন করেন তাঁদের ভক্তিভাব এবং বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। পেশাজীবী কীর্তনীয়াদের ভীরে এক প্রতিযোগিতামূলক আবহে কীর্তনের চরিত্রবদল ঘটেছে। তবে একথা অবশ্য ঠিক যে ধর্মীয় ভক্তিভাব, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার প্রসার সকল স্থানভেদে এক থাকে না। এখনও মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কার কিছু মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাঁদের কীর্তনানুষ্ঠান এখনও ভক্তিতে অবিচল রয়েছে। এই বিশেষ উপস্থাপনগুলিকে এখনও ধর্মীয় কৃত্যমূলক উপস্থাপনের শ্রেণিভুক্ত করা যায়। উক্ত দুই শ্রেণির কীর্তনানুষ্ঠানের মিলিত রূপ এবং এদের উপস্থাপনবৈশিষ্ট্য আলোচনায় উঠে এসেছে এবং নাটক হিসেবে লীলাকীর্তনের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা গেছে।

নাটকের অভিনেতা এবং লীলাকীর্তনের মূলগায়েনের ভূমিকায় সাযুজ্য রয়েছে। তবে লীলাকীর্তনের মূলগায়েনকে অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয় নাট্যরস ফুটিয়ে তুলতে। তিনি গান ও নাচের সঙ্গে আসর পরিচালনা সবটাই একা হাতে সামলান। প্রথাগত থিয়েটারের দর্শক এবং কীর্তনের ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক এক নন। কীর্তনের শ্রোতা-দর্শক জীবন্ত এবং কীর্তনানুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষ বিশেষ পালাকীর্তনে (যেমন-সূর্যপূজা) অভিনেতা ও দর্শক একই আসরে ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হন। এই দিকগুলি ছাড়াও লীলাকীর্তনে নৃত্য, আসর পরিকল্পনা, আলো, বাদ্য, সাজসজ্জা, প্যারডি গান,

সংলাপের ব্যবহার, নাট্যদ্বন্দ্ব, হাস্যরসের সঞ্চার ও কাহিনির বিকাশ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এর নাট্যবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে। একজন কীর্তনীয়ার দ্বারা উপস্থাপিত লীলাকীর্তন (রাসলীলা) স্থান-কালের পরিবর্তনে কীভাবে দু'টি ভিন্ন পালাকীর্তনে পর্যবসিত হয় তা এই আলোচনাপর্বে উঠে এসেছে।

অন্তিম অধ্যায়ের আলোচনাপর্বে ইংরেজশাসিত বাংলার নব্যগঠিত সমাজব্যবস্থায় বিনোদনমূলক নাট্যসংরূপের বিকাশে পদাবলী ও লীলাকীর্তনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত বিভিন্ন নাট্যসংরূপ যেমন কবিগান, খেউড়, ঢপ-কীর্তন, আখড়াই ও টপ্পা গানের আঙ্গিক গঠনে পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তন বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বাংলা নাটকের ইতিহাসে যাত্রাগানকে প্রাচীন নাট্যসংরূপ বলার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল তা যে ভ্রান্ত পথের নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়, যুক্তি ও প্রমাণসহ তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। পাঁচালি নয় বরং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লীলানাট্য এবং লীলাকীর্তন ছিল যাত্রার উৎস। যাত্রা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত একটি নাট্যসংরূপ। লীলাকীর্তনের পালা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রাপালায় রূপান্তরিত হয়। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে সেই অনালোকিত দিক। যাত্রার আঙ্গিক বিকাশে কীর্তন বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার প্রবহমান গতি ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় শ্লথ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু থেমে যায়নি। ইংরেজদের থিয়েটারও তাল মিলিয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটকের গানের ঝঙ্কারে। গীতাভিনয়, পৌরাণিক নাটক সেই সত্যকে উজাগর করে রেখেছে। বাংলার বাইরে মণিপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় ধারা এবং মণিপুরি সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক বিশেষ নাট্যরূপ উদ্ভূত হয় যা মণিপুরি নাট্য নামে পরিচিত। তাঁদের রাস উৎসবে নৃত্যময় নাট্য উপস্থাপন কীর্তনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে। নৃত্যের আধিক্য থাকার দরুণ সেই সময় বাংলা নাটকে তা আদৃত না হলেও দেশের সর্বত্র এর গ্রহণযোগ্যতা আজ তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরের এই বিশেষ সংস্কৃতি এবং নৃত্যকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় একটি বিশেষ নৃত্য 'গৌড়ীয় নৃত্য' অনেকাংশে মণিপুরি নৃত্যনাট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বাংলায় থিয়েটারের রমরমা হলেও বিশেষ বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও প্রয়োগ নিজের মতো করে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই পথের দিশারী। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপটের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তাঁর হৃদয়ে বাংলার কীর্তন গানের বিশেষ স্থান ছিল। নাটক রূপে যাত্রার উপস্থাপন হৃদয় জুড়ে সমাহিত করেছিলেন। *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে রয়েছে তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাচ ও গানের ব্যবহার ঐতিহ্যবাহী নাটকের উপস্থিতিকেই সমর্থন করে। তাঁর বক্তব্যে ও নাটকের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে ঐতিহ্যের আন্তরিক অনুসরণ প্রক্রিয়া। সবশেষে আলোচিত হয়েছে নাট্যকার বাদল সরকার এবং তাঁর প্রসেনিয়াম ভাঙার তীব্র ইচ্ছায় জন্ম নেওয়া থার্ড থিয়েটারের প্রসঙ্গ। মণিপুরি নাট্যের দেহভাষার ব্যবহার সুচারু রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর থার্ড থিয়েটার আদতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকেই সমর্থন করে। হয়তো এই দু'জনের কেউই পদাবলী কীর্তন ও লীলাকীর্তনের প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেননি। কিন্তু যাত্রা তথা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অনুসরণ করতে কেউই কুণ্ঠাবোধ করেননি। এদিক থেকে বিচার করলে ঐতিহ্যের অনুসরণ লীলাকীর্তনের সূত্র সন্ধানের সামিল।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

ওঝা, সুনীলকুমার। (সম্পা.)। *মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল* । শিলিগুরি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৭।

করিম, মুন্‌শী আব্দুল (সম্পা.) *গোরক্ষ-বিজয়* । কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৯১৮।

কাইউম, মোহম্মদ আবদুল ও সুলতানা, রাজিয়া (সম্পা.)। *আলাওল রচনাবলী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৭।

গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর (সম্পা.)। *শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা : নিবিড় পাঠ*। কলকাতা: গ্রন্থ বিকাশ। ২০০৮।

গুহ, মণীন্দ্রনাথ। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৭।

গোস্বামী, প্রাণগোপাল। *শ্রীশ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্দার। ২০১৮।

গোস্বামী, রাধাবিনোদ। *শ্রীমদ্ভাগবতম্*। দশম স্কন্ধ। কলকাতা: গিরিজা। ২০০৫।

ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পা.)। *বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: নাট্যচিন্তা। ২০১৪।

ঘোষ, মুনীন্দ্রকুমার। *কবি সঞ্জয়-বিরচিত মহাভারত*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯।

চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা* । কলকাতা: ডি.এম, লাইব্রেরি। ২০০৫।

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *নরহরি চক্রবর্তী: জীবন ও রচনাবলী*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। *ঘরোয়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৩৯৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*। কলকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১২৯১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। একাদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৮৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঙ্গীত-চিন্তা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৯৬৬।

দত্ত, সত্যেন্দ্রানাথ। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেত লিমিটেড। ১৯৯৪।

দাশ, ড. নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০5।

দাস, যদুনন্দন। *গোবিন্দলীলামৃত*। কলকাতা: বানেশ্বর ঘোষ এণ্ড কোং—ধন্বন্তরা আশ্রম। ১৯১৩।

দাস, শ্রীকিশোর। *শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর*। কলকাতা: জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট। ২০০৭।

দাশগুপ্ত, জয়ন্তকুমার। *কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.)। *কবিকঙ্কন চণ্ডী* । কলকাতা: রত্নাবলী। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.)। *কাশীদাসী মহাভারত*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.)। *কাশীদাসী মহাভারত*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। *নাটক-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: সদেশ। ১৪১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র* । প্রথম খণ্ড। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন। ২০০৯।

বসাক, ড. রাধাগোবিন্দ (সম্পা.)। *সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অয়ান্ড পাব্লিশার্স। ১৯৫৬।

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *শূন্যপুরাণ রামাইপণ্ডিত প্রণীত*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। ১৩১৪।

বিদ্যাভূষণ, অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী। *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: গৌড়ীয় মঠ। ৪৪২ গৌরাব্দ।

বিদ্যাভূষণ, হরিমোহন (অনুদিত)। *গীতগোবিন্দ*। কলকাতা: টাউন প্রেস। ১২৯৩।

বিদ্যারত্ন, কালীকিশোর (সম্পা.)। *চৈতন্যমঙ্গল* । কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮।

বিদ্যারত্ন, রামনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী। ২০১৪।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.)। *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০১২।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকথা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১৪।

ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। *উদ্ধব-সন্দেশ*। কলকাতা: শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। ২০১৫।

ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ ও রায়, রথীন্দ্রনাথ (সম্পা)। *গিরিশ রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ১৯৬৯।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.)। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গুনরাজ খান মালাধর বসু বিরচিত*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৩।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্রের গান* । কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সম্পা.)। *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১১।

মজুমদার, অতীন্দ্র। *চর্যাপদ* । কলকাতা: নয়া প্রকাশ। ১৯৬১।

মজুমদার, বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.)। *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৬।

মজুমদার, সুবোধচন্দ্র। (সম্পা.)। *রামায়ণ* । কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর। ১৯৭৯।

মহারাজ, দেবগোস্বামী (সম্পা.)। *শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা*। নবদ্বীপ: শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। ২০০৭।

মিত্র, খগেন্দনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ণ)*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯০।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ ও মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা)। *বিদ্যাপতির পদাবলী*। কলকাতা: কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ১৯৫৩।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়* । কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, ড. হরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৫।

মুখোপাধ্যায়, দিলীপ। *বৃহৎ শ্রী শ্রী ভক্তমাল গ্রন্থ*। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী। ২০১৮।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *সংগীত দামোদর* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৯।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও মজুমদার সুবোধচন্দ্র (সম্পা.)। *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭।

রায়, বসন্তরঞ্জন (সম্পা.)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৪২।

রায়, সতীশচন্দ্র। *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৪১০।

শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য এবং দাস, দেবকুমার (সম্পা.)। *দশরূপকম্*। কলকাতা: সদেশ। ২০১২।

সান্যাল, অবন্তীকুমার ও চট্টপাধ্যায়, গীরীন্দ্রনাথ। *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ*। ২য় খণ্ড। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৩৬৯।

সামন্ত, ড. রবীন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *শ্রী গীতগোবিন্দ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৪।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৩।

সেন, সুকুমার (সঙ্কলিত)। *বৈষ্ণব-পদাবলী*। নিউ দিল্লী: সাহিত্য আকাদেমী। ১৯৫৭।

সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬।

সেন, সুকুমার (সম্পা.)। *চৈতন্যভাগবত*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *চর্যাগীতি-পদাবলী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৫।

সেন, হরিদাসদা। *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*। সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৭।

সহায়ক গ্রন্থ

অর্ক, ইউসুফ হাসান। *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পালাগান': আঙ্গিক বিচার ও 'বর্ণনাকারীর অবস্থান' অনুসন্ধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৮।

আল-আমান, আবদুল আজীজ। *পদক্ষেপ*। কলকাতা: এস, মল্লিক। ১৩৭১।

আল দীন, সেলিম। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* । ঢাকা: বাংলা একাদেমী ঢাকা। ১৯৯৬।

আলী, মোঃ ফজলুল এবং অন্যান্য। *গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান*। ঢাকা: চয়নিকা। ২০১৫।

ইসলাম, শেখ মকবুল। *চৈতন্যমহাপ্রভু ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১২।

কানুনগো, সুনীতিভূষণ। *বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন*। ঢাকা: বাতিঘর। ২০২১।

কুনডু, মণীন্দ্রলাল। *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ* । কলকাতা: সাহিত্যলোক। ২০০০।

খান, শামসুজ্জমান। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৮।

খান, শামসুজ্জমান। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০১৭।

গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৪।

গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার, ড. সমরেশ। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৯।

গিরি, সত্য। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০০৫।

গিরি, সত্যবতী। *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৪০৩।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ২০০২।

গুপ্ত, শোভন। *শম্ভু মিত্র অন্য সন্ধান*। কলকাতা: দীপ প্রকাশনী। ২০১২।

গোলদার, ড. তানিয়া। *লোকনাট্যের নারীশিল্পীরা*। বীরিভূম: রাঢ় প্রকাশন। ১৪২২।

গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *বাংলা নাটকে গান*। কলকাতা: ক্লাসিক প্রেস। ১৩৭১।

গোস্বামী, প্রভাতকুমার। *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*। কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স। ২০১৮।

গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: শম্পা বুক হোম। ২০০২।

ঘোষ, ড. অজিতকুমার। *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৭।

ঘোষ, ড. অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস* । কলকাতা: দেজ। ২০০৫।

ঘোষ, ড. ললিতা। *অসমের সত্রিয়া নৃত্যের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কলাবতী মুদ্রা। ২০২১।

ঘোষ, ড. সতী। *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী তুলনামূলক আলোচনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ১৯৮৪।

ঘোষ, দেবতোষ। *শম্ভুদা: পুনশ্চ*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬।

ঘোষ, পারুল। *বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম সাহিত্যে ও দর্শনে*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ১৪০৮।

ঘোষ, বারিদবরণ। *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রী পাবলিশিং হাউস। ২০১১।

ঘোষ, বারিদবরণ। *বিষয়: বৌদ্ধধর্ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী। ২০০২।

চক্রবর্তী জনার্দন। *শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, ড. মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, ড. সুপ্রভাত। *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ২০০০।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ* । কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ২০১২।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, রথীন। *কলকাতার নাট্যচর্চা।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৯১।

চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। চতুর্থ মুদ্রণ। কলকাতা: আনন্দ। ২০১১।

চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা। *মঙ্গলকাব্য : পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* । কলকাতা: বিদ্যা। ২০১১।

চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম। *বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্য উপাদান* । কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৯।

চন্দ্র, দীপক। *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৪।

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পা.)। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*। ঢাকা: অন্বেষা। ২০১৪।

চৌধুরী, দর্শন। *গণনাট্য আন্দোলন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী। ১৯৯৪।

চৌধুরী, দর্শন। *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণী। ১৯৯৫।

চৌধুরী, দুলাল। *বাংলার লোকউৎসব*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৮৫।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬।

চৌধুরী, ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*। প্রথম পর্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৫৪।

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বরী (সম্পা.)। *বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী*। নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ। ২০১৫।

জাকারিয়া, সাইমন ও মুর্তুজা, নাজমীন। (সম্পা.)। *বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস*। ঢাকা: অ্যাডার্ন পাবলিকেশন। ২০১০।

জাকারিয়া, সাইমন। *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা। ২০০৭।

জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ২০০৮।

জানা, ড. নরেশচন্দ্র। *গাথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৯৮৬।

জানা, নরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো। ২০১৫।

তর্কভূষণ, পণ্ডিত প্রমথনাথ। *বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম।* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৯।

দত্ত, কালীকুমার। *মধ্যযুগীয় ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭।

দত্ত, জয়িতা (সম্পা.)। *পুরোনো বাংলা সাহিত্য চিন্তা ও চর্চা*। কলকাতা: রত্নাবলী। ২০১৩।

দত্ত, ড. দিলীপকুমার। *বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের রসলোক।* উ. ২৪ পরগণা: প্রভা প্রকাশনী।

দত্ত, ড. ভূপেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভাট লিমিটেড। ২০১১।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ। *বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ২০০১।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩৩৮।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি। ১৩৯০।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৬।

দাস, কালিদাস। *পদাবলী-সাহিত্য*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি:। ১৩৬৮।

দাস, পরিতোষ। *সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম*। কলিকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৭৮।

দাস, প্রভাতকুমার (সম্পা.)। *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। ১৯৯৬।

দাস, মন্মথ (সংগ্রাহক)। *শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রত ও মাহাত্ম্য সংগ্রহ*। কলকাতা: সদেশ। ১৪১৩।

নাথ, মৃণাল। *চর্যাপদ ভাষা পাঠ পাঠান্তর*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১১।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি। ১৯৯৯।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: বর্ণজিৎকুমার দেব উচ্চারণ। ১৯৮১।

প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯৭০।

প্রধান, সুধী। *গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা*। কলকাতা: ক্রান্তিক প্রকাশনী। ১৯৯২।

বক্সী, কৃষ্ণা। *কীর্তন গানের ইতিহাস*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী। *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র নাটক*। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মর্ডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৬-১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সম্পা.)। *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ (সম্পা.)। *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্। *বাংলার মঞ্চগীতি (১৭৯৫-১৮৭২)*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা। ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: প্যাপিরাস। ২০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। *রাজসভার কবি ও কাব্য*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০০৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ। *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা* । কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ২০০৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি। *নৃত্য: অন্তরে বাহিরে*। কলকাতা: কারিগর। ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি। ২০১৬।

বসু, গঙ্গাপদ। *নাটক ও নাট্যকথা*। কলকাতা: আনন্দ। ২০১০।

বসু, তাপস (সম্পা.)। *ইতিহাস পুরুষ শ্রীচৈতন্য: গণআন্দোলনের পুরোধা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ১৯৮৬।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৬১।

বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পা.)। *বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*। কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন। ২০১১।

বেরা, মঞ্জুল (সম্পা.)। *বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী*। কলকাতা: সোনার তরী। ১৪০৬।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০২।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপতর্ষি প্রকাশন। ২০১৫।

ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন। *সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৭৮।

ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* । কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৪০৭।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.)। *চৈতন্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৪২১।

ভট্টাচার্য, ড. গৌরী। *বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ*। কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৯।

ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা*। কলকাতা: হাউস অব বুকস্। ১৯৫৭।

ভট্টাচার্য, ড. হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*। প্রথম পর্ব। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮২।

ভট্টাচার্য, তারাপদ। *বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস*। প্রাচীন পর্ব। কলকাতা: এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। ১৯৬২।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভাট লিমিটেড। ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরি। ২০১২।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তি-সাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া। ১৯৬১।

ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ। *বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি*। কলকাতা: পুনশ্চ। ২০০১।

ভট্টাচার্য্য, সুমন। *কীর্তন ও পদ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: রংবেরং পাবলিকেশন। ১৪২৩।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১২।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ। *দেবতার মানবায়ন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১০।

মজুমদার, ড. দিলীপ। *বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা প্রগতি চিন্তার সূত্রসন্ধান*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এডুকেশন ফোরাম। ২০০৩।

মজুমদার, বিমানবিহারী। *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা। ১৩৯৮।

মজুমদার, ভবেশ (সম্পা.)। *কৃত্তিবাস ও রামকথা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১৭।

মজুমদার, ভবেশ। *জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। *নীতি যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ১৪১৬।

মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্তন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫২।

মিত্র, শাঁওলী। *শম্ভু মিত্র জীবনপরিক্রমা*। নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া। ২০০৮।

মুখার্জী, উদয় রতন (সম্পা.)। *সাহিত্যতক্কো: লেখক পাঠক যোগাযোগ*। কলকাতা: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩।

মুখোপাধ্যায়, অশোক। *সংসদ বানান অভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ। ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, ড. শঙ্কর লাল। *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯৭।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নাট্যধারা* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০১৭।

মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেতথ্য ও কালক্রম*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৯৩।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা। ১৯৭০।

মুরশিদ, গোলাম। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর। ২০১৯।

মৈত্র, সুরেশচন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন* । কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস। ১৯৭৩।

রক্ষিত, মলয়। *বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস। ২০১৭।

রায়, জয়ন্ত (সম্পা.)। *কীর্তন কথা*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৯।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* । আদিপর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৪।

রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড। ১৩৫৩।

রায়, বিশ্বনাথ ও রায়, ছন্দা (সম্পা.)। *বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা। ২০১৬।

রায়, মন্দিরা। *প্রসঙ্গ: বাংলা রঙ্গালয়*। কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ। ১৪১৭

রায়চৌধুরী, সজল। *গণনাট্য কথা*। কলকাতা: গণমন প্রকাশন। ১৯৯০।

রায়চৌধুরী, সুবীর (সম্পা.)। *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ১৯৯৯।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: নিউ এজ। ২০১১।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: বর্ণমিছিল। ১৯৭১।

শরীফ, আহমদ। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা: সময় প্রকাশন। ২০০৪।

শাস্ত্রী, অশোকনাথ। *রস ও ভাব*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ১৪০৫।

শীল, বৈদ্যনাথ। *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা* । কলকাতা:এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং। ১৯৫৮।

সমাদ্দার, শেখর (সম্পা)। *থিয়েটারের কথা নাট্যজীবন নাট্যশিল্প নাট্যদর্শন*। কলকাতা: প্যাপিরাস। ২০০৪।

সরকার, পবিত্র। *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। ২০১৬।

সরকার, বাদল। *পুরোনো কাসুন্দি*। কলকাতা: লেখনী। ২০০৬

সরকার, শুভেন্দু। *বাদল সরকার: বিকল্প নাটক বিকল্প মঞ্চ*। কলকাত: ইন্দাস। ২০০৭।

সাঈদ, শামসুল আলম। *পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। ২০১২।

সান্যাল, অবন্তীকুমার। *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*। কলকাতা: রূপলেখা প্রকাশনী। ২০০৯-১০।

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলা কীর্তনের ইতিহাস*। কলকাতা: কে পি অ্যান্ড কোম্পানী। ২০১২।

সাহা, ড. ধীরেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী: পদ ও পদকার*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬।

সিংহ, ড. শুকদেব। *শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য*। কলকাতা: ভারতী বুক স্টল। ১৯৬৭।

সেন, অঞ্জন। *বঙ্গশিল্পে চৈতন্যদেব*। কলকাতা: পত্রলেখা। ২০১৩।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। কলকাতা: সান্যাল এণ্ড কোম্পানি। ১৩৬৭।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম*। কলকাতা: পাতাবাহার। ১৪২২।

সেন, নীলরতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়*। কলকাতা: সাহিত্যলোক। ১৪০২।

সেন, সুকুমার। *চৈতন্যাবদান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৬।

সেন, সুকুমার। *নট নাট্য নাটক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ। ১৯৭২।

সেন, সুকুমার। *প্রবন্ধ সংকলন*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৪।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: ভারবি। ১৯৯২।

সেন, সুকুমার। *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী* । কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৯৪৬।

সেনগুপ্ত, পল্লব এবং অন্যান্য। *গৌড়ীয় নৃত্য : নিবন্ধগুচ্ছ* । কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি। ২০০৫।

হালদার, গোপাল। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। ১৪১৯।

হালদার, গোপাল। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী। ১৪১৯।

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ

Acharyya, Deb Narayan. *THE LIFE AND TIMES OF SRIKRISHNA-CHAITANYA*. Calcutta: Firma KLM Private Limited. 1984.

Alexander, Jeffrey C. *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy*. vol-22. American Sociological Association. 2004.

Chakravarti, Janardan. *BENGAL VAISHNAVISM AND SRI CHAITANYA*. Kolkata: The Asiatic Society. 2016.

Chakravarti, Ramakanta.. *Vaisnavism on Bengal*. vol-II. kolkata: Sanskrit pustak bhandar. 1985.

Chatterjee, Chinmoy. *Studies in the Evolution of Bhakti Cult with Special Reference to Vallabha School*. Kolkata: Jadavpur University.

Coomarswamay, Ananda and Duggirala, Gopala Kristnayya. *The Mirror of Gesture*. London: Harvard University press. 1917.

Das, Sisirkumar. *THE MAD LOVER*. Calcutta: Papyrus. 1984.

Dasgupta, Hemendranath. *The Indian Stage*. Calcutta: Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 1934.

Dey, Sushil Kumar. *Early History of The Vaishnava Faith and Movement In Bengal*. Firma KLM Private Limited. 1986.

J. Mc Cutchion, David. *LATE MEDIAEVAL TEMPLES OF BENGAL*. Kolkata: The Asiatic Society. 2017.

Narasimhachary, M. *Makers of Indian Literature Sri Ramanuja*. Kolkata: Sahitya Akademy. 2018.

Novetzke, Christian Lee. *History, Bhakti, and Public Memory NAMDEV IN RELIGIOUS AND SECULAR TRADITIONS*. Raniket:` Permanent Black. 2009.

Schechner, Richard. *PERFORMANCE STUDIES: An Introduction*. New York: Routledge. 2013.

Sen, Rai Saheb Dinesh Chandra. *CHAITANYA AND HIS COMPANIONS*. Kolkata: University of Calcutta. 1917.

Sen, Rai Saheb Dinesh Chandra. *THE VAISNAVA LITERATURE OF MEDIAEVAL BENGAL*. Kolkata: University of Calcutta. 1917.

Turner, Victor. *From Ritual to Theatre*. New York: PAJ Publications. 2002.

পত্রিকা

আহমদ, আফসার। "বাংলা নাটকের হাজার বছর"। *নাট্যকলা-৮*। কলকাতা: নাট্যবিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

খান, অন্বেষা। "লোক ঐতিহ্যের আঙিনায় কৃষ্ণকীর্তন থেকে রামপাঁচালী"। *হান্ড্রেড মাইলস কবিতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক পত্রিকা*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: হান্ড্রেড মাইলস। ২০১৬।

গিরি, সত্য। "গৌড়ীয় ও অসমীয় বৈষ্ণব পদাবলী: তুলনার নিরিখে"। *তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯

গোস্বামী, কাননবিহারী। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজবুলি সাহিত্যে নৃত্যে নায়কের ভূমিকা"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

ঘোষ, চৈতালী। "মণিপুরী নৃত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও ক্রমবিকাশ"। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার। "প্রসঙ্গ: বাংলা কীর্তন"। *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। ষষ্ঠ সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার। "ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। সপ্তম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। "সঙ্গীত"। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। সপ্তম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৫।

চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পা.)। *যাত্রা নাটক প্রসঙ্গ*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৫।

দাস, প্রভাত কুমার। "নতুন নাট্যকারের সন্ধানে: শিশির কুমার"। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

দাস, ব্রজরাখাল। “পদাবলী কীর্ত্তন সঙ্গীতে মৃদঙ্গ করতাল ও সুরযন্ত্র ব্যবহার”। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

দাস, ব্রজরাখাল। “শ্রীখোলবাদ্যের ও পদাবলী কীর্ত্তনের তাল পদ্ধত”। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

দে, তরুণকুমার। “যাত্রা ও নাটক ১৯৬৬ থতকে ১৯৮৫”। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

নস্কর, সনৎকুমার। “গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: একটি আপেক্ষিক তৌলন”।*তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পত্রিকা*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯

প্রধান, ড. তরুণ। “বাংলা থিয়েটারে লোকনাট্যের প্রভাব”। *নাট্যকলা-৮*। কলকাতা: নাট্যবিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

বনু, রাজীব (সম্পা.)। *বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব*। তৃতীয় সংখ্যা। কলকাতা: বাংলার পুরাতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র। ২০১৩

বসু, সৌমিত্র। “বাংলা থিয়েটার ও বাঙালি দর্শক”। *সাহিত্যতক্কো*। দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: মিলেনিয়াম প্রিন্টার্স। ২০১৩।

বসু, সৌমিত্র। “বাংলা পৌরাণিক নাটকের পালাবদল”। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। “বাংলার লোকনাট্য: লক্ষ্মণ বিচার ও বৈশিষ্ট্য সন্ধান”। *লোক-সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া। ২০০৮।

মণ্ডল, সুজিত কুমার। “বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা: সংরূপের সন্ধানে পালাগান”। *বহুরূপী*। ১১৮ সংখ্যা। ২০১২

মিত্র রায়চৌধুরী, কঙ্কনা। “বাংলা কীর্তনের ক্রমবিকাশ”। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। নবম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, ড. মহুয়া। “ভারতীয় সংগীতে বিশেষত নৃত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব”। *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ১৯৯৮।

মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। “সংগীত ও বাংলার নাট্যশালা: (গিরিশ যুগ)”। *সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*। নবম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। “গৌড়ীয় নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্র”।*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি পত্রিকা*। ষষ্ঠ সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। “গৌড়ীয় নৃত্যকলা: স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের আন্তঃসম্পর্ক”। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৫

রক্ষিত, মলয়। “ঔপনিবেশিক থিয়েটার, বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ”। *পরিকথা*। চতুর্দশ বর্ষ। ২০১১

রায়চৌধুরী, মুরারি। “থিয়েটারে সংগীত”। *এবং নাট্যকথা*। কলকাতা: নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ। ২০১৪।

সরকার, প্রণব (সম্পা.)। *গ্রামীণ বিনোদন একাল ও সেকাল*। কলকাতা: লোক। ২০০৮

সেনগুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু। “সুর নিয়ে ভাবনার ভাঙাগড়া”। *পরিকথা*। চতুর্দশ বর্ষ। ২০১১

সেনগুপ্ত, তপা। “মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রবহমানতা”। *নৃত্যরসমঞ্জরী*। ষষ্ঠ বর্ষ। কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৮

হালদার, গৌতম। “নাটকের ভাষা আর সময়ের চলন”। *নাট্য আকাদেমি পত্রিকা*। দশম সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। ২০০৪।

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার

কীর্তনীয়ার নাম	সাক্ষাৎকারের স্থান	তারিখ
তুলিকা সেন বঙ্গাল	নিউ-আলিপুর, কলকাতা	৩০/০৪/২০১৪
সুপ্রিয়া রায়	বাণীবেড়িয়া গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১১/০২/২০১৫
সিদ্ধার্থ সেখর দাস	বাণীবেড়িয়া গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১১/০২/২০১৫
কৃষ্ণা বিশ্বাস	বাণীবেড়িয়া গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১২/০২/২০১৫
অশোক কুমার দাস	বাণীবেড়িয়া গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১২/০২/২০১৫
গৌরী রায় পণ্ডিত	ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন মন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৭/০২/২০১৫
মিতালী দাস	ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন মন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৭/০২/২০১৫
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী	ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন মন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৮/০২/২০১৫
অরুণ চট্টোপাধ্যায়	ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন মন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৮/০২/২০১৫
তাপসী দাসী	ধামুয়া স্টেশন সংলগ্ন মন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৮/০২/২০১৫
মানস দাস	ডানলপ, কলকাতা	০৩/০৬/২০১৬
বৃহস্পতি নস্কর	ডানলপ, কলকাতা	০৩/০৬/২০১৬
মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌশল গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৩/০৩/২০১৮
প্রবোধ সরকার	মৌশল গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৩/০৩/২০১৮
রূপশ্রী শী	ত্রিকোণ পার্ক, কলকাতা	২৪/১২/২০১৯

Signature of Researcher

Date: